বিজ্ঞান

দাখিল

সপ্তম শ্রেণি

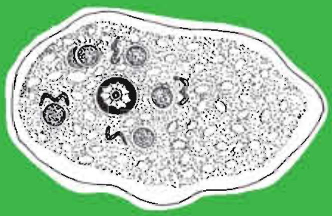

পৃ
চন্দ্র
সূর্য
অমাবস্যা
চন্দ্র
পৃ
পূর্ণিমা
সূর্য

স্ত্রীকেশর
পুংকেশর
পাপড়ি
বৃতি
পুষ্পাক্ষ

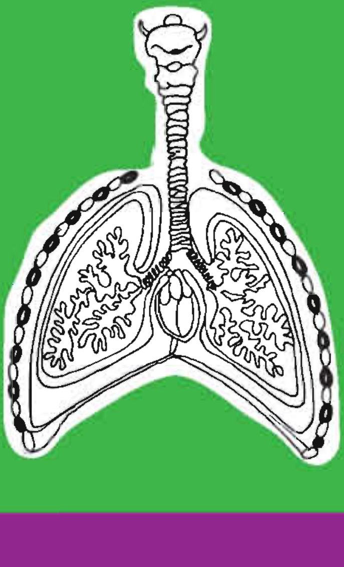

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে দাখিল সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

বিজ্ঞান

দাখিল

সপ্তম শ্রেণি

রচনা

প্রফেসর ড. শাহজাহান তপন
প্রফেসর ড. সফিউর রহমান
প্রফেসর এস এম হায়দার
প্রফেসর কাজী আফরোজ জাহানআরা
প্রফেসর ড. এস এম হাফিজুর রহমান
মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী
ড. মোঃ আব্দুল খালেক
গুল আনার আহমেদ

সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. আজিজুর রহমান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪
পুনর্মুদ্রণ : ২০১৮

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষায় যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক । পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপকল্প-২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাকৃতিক বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টির মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বিকাশ সাধন, সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন এবং পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলোর প্রতি শিক্ষার্থীকে আগ্রহী করে তোলা। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের নিকট সহজবোধ্য ও আনন্দদায়ক করার লক্ষ্যে বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দিকগুলোর পাশাপাশি হাতে কলমে কাজ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীলতা, কল্পনা ও অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজ দেওয়া হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটির সাহায্যে শিক্ষার্থী বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান এবং বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা থেকে উত্তরোত্তর প্রয়োজনীয় জীবনদক্ষতা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সক্ষম হবে।

২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে মাধ্যমিক স্তরে প্রবর্তিত পাঠ্যপুস্তক মাদ্রাসা শিক্ষার বৈশিষ্ট্য উপযোগী করে দাখিল স্তরের পাঠ্যপুস্তকরূপে প্রবর্তন করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	অধ্যায় শিরোনাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
প্রথম	নিম্নশ্রেণির জীব	১-১০
দ্বিতীয়	উদ্ভিদ ও প্রাণীর কোষীয় সংগঠন	১১-২৩
তৃতীয়	উদ্ভিদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য	২৪-৩৩
চতুর্থ	শ্বসন	৩৪-৪৩
পঞ্চম	পরিপাকতন্ত্র এবং রক্ত সংবহনতন্ত্র	৪৪-৫৮
ষষ্ঠ	পদার্থের গঠন	৫৯-৭০
সপ্তম	শক্তির ব্যবহার	৭১-৮৫
অষ্টম	শব্দের কথা	৮৬-৯৬
নবম	তাপ ও তাপমাত্রা	৯৭-১০৭
দশম	বিদ্যুৎ ও চুম্বকের ঘটনা	১০৮-১১৮
একাদশ	পারিপার্শ্বিক পরিবর্তন ও বিভিন্ন ঘটনা	১১৯-১৩১
দ্বাদশ	সৌরজগৎ ও আমাদের পৃথিবী	১৩২-১৪৪
ত্রয়োদশ	প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং দূষণ	১৪৫-১৫৭
চতুর্দশ	জলবায়ু পরিবর্তন	১৫৮-১৭২

প্রথম অধ্যায়

নিম্নশ্রেণির জীব

ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, শৈবাল, অ্যামিবা ইত্যাদিকে নিম্নশ্রেণির জীব বলা হয়। এদের মধ্যে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও অ্যামিবা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া দেখা যায় না। এরা অণুজীবের অন্তর্ভুক্ত। কিছু কিছু ছত্রাক ও শৈবাল খালি চোখে দেখা গেলেও অধিকাংশ ছত্রাক ও শৈবাল দেখতে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য লাগে। এসব অণুজীব বা আদিজীব মানুষ, গৃহপালিত পশুপাখি ও উদ্ভিদের রোগ সৃষ্টি করে। আবার পরিবেশে এদের অনেক উপকারী ভূমিকাও রয়েছে।

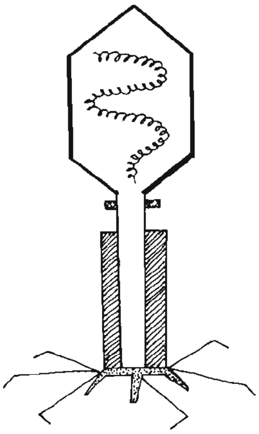

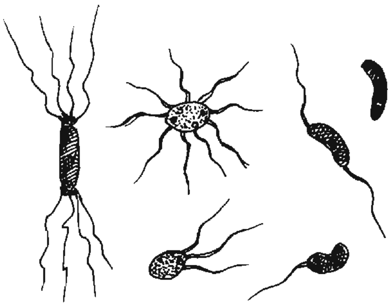

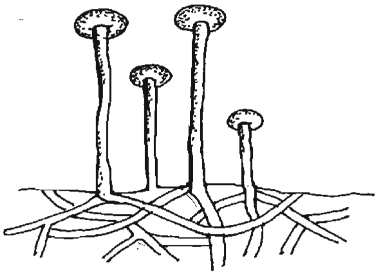

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- অণুজীবের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অণুজীবের শ্রেণিবিন্যাস করতে পারব।
- ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও অ্যামিবার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব।
- শৈবাল ও ছত্রাকের বৈশিষ্ট্য, উপকারিতা ও অপকারিতা ব্যাখা করতে পারব।
- কীভাবে ছত্রাক সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যায় তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ছত্রাকজনিত রোগ সংক্রমণের বিষয়ে নিজে সচেতন হব ও অন্যদের সচেতন করব।
- মানবদেহে স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টিতে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও এন্টামিবার ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মানবদেহে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও এন্টামিবার কারণে সৃষ্ট মানবদেহে স্বাস্থ্য ঝুকি প্রতিরোধ এবং প্রতিকার ব্যাখ্যা করতে পারব। এসব স্বাস্থ্যঝুঁকি প্রতিকারে নিজে সচেতন হব এবং অন্যদেরও সচেতন করব।

পাঠ– ১,২ : অণুজীব জগৎ

আমরা আমাদের চারপাশে অনেক জীব দেখতে পাই। এসব জীব ছাড়াও আমাদের পরিবেশে অনেক জীব রয়েছে যাদের খালি চোখে দেখাই যায় না। এদের নির্দিষ্ট কেন্দ্রিকাযুক্ত সুগঠিত কোষও নেই। এরা অণুজীব নামে পরিচিত। এসব অণুজীব থেকেই সৃষ্টির শুরুতে জীবনের সূত্রপাত হয়েছে। তাই অণুজীদেরকে আদিজীবও বলা হয়ে থাকে।

তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে মারগুলিস ও হুইটেকারের জীবজগতের পঞ্চরাজ্য প্রস্তাবনায় অনুজীবসমূহকে মনেরা, প্রোটিস্টা ও ফানজাই রাজ্যে দেখতে পেয়েছো। আবার অণুজীবসমুহের শ্রেণিবিভাগ করতে গিয়ে বর্তমান কালে অণুজীব বিজ্ঞানীগণ এ জগৎকে তিনটি রাজ্যে ভাগ করেছেন।

অণুজীব জগৎ

রাজ্য– ১) এক্যারিওটা
রাজ্য– ২) প্রোক্যারিওটা
রাজ্য– ৩) ইউক্যারিওটা

রাজ্য–১ : এক্যারিওটা বা অকোষীয় : এসব অণুজীব এতই ছোট যে তা সাধারণ আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচেও দেখা যায় না। এদের দেখতে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন হয়, যেমন– ভাইরাস।

রাজ্য–২ : প্রোক্যারিওটা বা আদিকোষী : যেসব অণুজীবের কোষের কেন্দ্রিকা সুগঠিত নয় তারাই এ রাজ্যের সদস্য। সুগঠিত কেন্দ্রিকা না থাকায় এদের কোষকে আদিকোষ বলা হয়, যথা– ব্যাকটেরিয়া।

রাজ্য–৩ : ইউক্যারিওটা বা প্রকৃতকোষী : যেসব অণুজীব কোষের কেন্দ্রিকা সুগঠিত তাদেরই প্রকৃত কোষ বলে। শৈবাল, ছত্রাক ও প্রোটোজোয়া এ ধরনের অণুজীব।

নতুন শব্দ : **এক্যারিওটা, প্রোক্যারিওটা, ইউক্যারিওটা, অণুজীব, ভাইরাস**

পাঠ– ৩, ৪ : ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া

ভাইরাস, রিকেটস, ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, শৈবাল, প্রোটোজোয়া ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের অণুজীব আমাদের পরিবেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এরা অধিকাংশই আমাদের উপকার করে। তবে কিছু কিছু অণুজীব আছে যারা

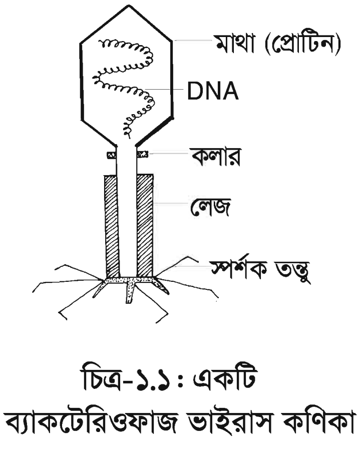

চিত্র-১.১ : একটি
ব্যাকটেরিওফাজ ভাইরাস কণিকা

আমাদের দেহে রোগ সৃষ্টি করে। এবার আমরা কয়েকটি অণুজীব সম্পর্কে জানব।

ভাইরাস : ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া ভাইরাসদেরকে দেখা যায় না। এরা সরলতম জীব। ভাইরাসের দেহে কোষপ্রাচীর, প্লাজমালেমা, সুসংগঠিত নিউক্লিয়াস, সাইটোপ্লাজম ইত্যাদি কিছুই নেই। তাই ভাইরাস দেহকে অকোষীয়ও বলা হয়। এরা শুধুমাত্র আমিষ আবরণ ও নিউক্লিক এসিড (ডিএনএ বা আরএনএ) নিয়ে গঠিত। এদের আমিষ আবরণ থেকে নিউক্লিক এসিড বের হয়ে গেলে এরা জীবনের সকল লক্ষণ হারিয়ে ফেলে। তবে অন্য জীবদেহে যেইমাত্র আমিষ আবরণ ও নিউক্লিক এসিডকে একত্র করা হয়, তখনি এরা জীবনের সব লক্ষণ ফিরে পায়। অর্থাৎ জীবিত জীবদেহ ছাড়া বা জীবদেহের বাইরে এরা জীবনের কোন লক্ষণ দেখায় না। এ কারণে ভাইরাস প্রকৃত পরজীবি।

ভাইরাসদের মধ্যে ব্যাকটেরিওফাজ ভাইরাস একটি পরিচিত ভাইরাস। চিত্র ১.১ এ এদের গঠন সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হলো।

ভাইরাস গোলাকার, দন্ডাকার, ব্যাঙাচির ন্যায় ও পাউরুটির ন্যায় হতে পারে। ভাইরাস মানবদেহে বসন্ত, হাম, সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি রোগ সৃষ্টি করে। ধানের টুংরো ও তামাকের মোজায়েক রোগ ভাইরাসের কারণে হয়। বসন্ত, হাম, সর্দি ইত্যাদি বায়ুবাহিত রোগ।

ব্যাকটেরিয়া : ব্যাকটেরিয়ার কিছু কথা আমরা পূর্বের শ্রেণিতে জেনেছি। এবার একটু বিস্তারিত জানবো। ব্যাকটেরিয়া হলো আদি নিউক্লিয়াসযুক্ত, অসবুজ, এককোষী অণুবীক্ষণিক জীব।

বিজ্ঞানী অ্যান্টনি ফন লিউয়েন হুক সর্ব প্রথম ব্যাকটেরিয়া দেখতে পান। ব্যাকটেরিয়া কোষ গোলাকার, দণ্ডাকার, কমা আকার, প্যাঁচানো ইত্যাদি নানা ধরণের হতে পারে। দেহের আকার আকৃতির ভিত্তিতে একে নিম্নরূপে শ্রেণিবদ্ধ করা হয় :

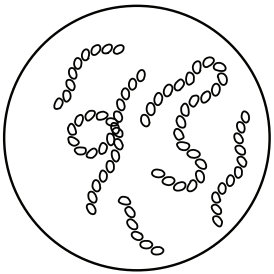

চিত্র- ১.২ : কক্কাস

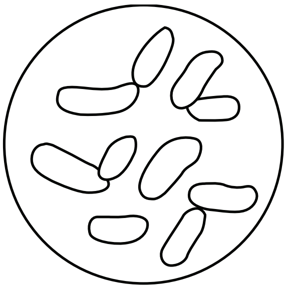

চিত্র- ১.৩ : ব্যাসিলাস

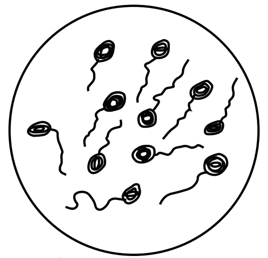

চিত্র -১.৪ : কমা

ক) কক্কাস (চিত্র ১.২) : কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়া কোষের আকৃতি গোলাকার। এরা কক্কাস ব্যাকটেরিয়া। এরা এককভাবে অথবা দলবেঁধে থাকতে পারে, যেমন– নিউমোনিয়া রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া।

খ) ব্যাসিলাস (চিত্র ১.৩) : এরা দেখতে লম্বা দণ্ডের ন্যায়। ধনুষ্টংকার, রক্তামাশয় ইত্যাদি রোগ এরা সৃষ্টি করে।

গ) কমা (চিত্র ১.৪) : এরা বাঁকা দণ্ডের ন্যায় আকৃতির ব্যাকটেরিয়া। মানুষের কলেরা রোগের ব্যাকটেরিয়া এ ধরনের।

ঘ) স্পাইরিলাম (চিত্র ১.৫) : এ ধরণের ব্যাকটোরিয়ার আকৃতি প্যাঁচানো।

ব্যাকটেরিয়ার উপকারিতা :

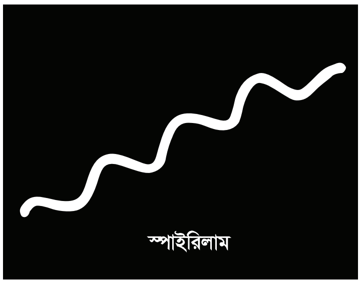

চিত্র- ১.৫ : স্পাইরিলাম

- মৃত জীবদেহ ও আর্বজনা পচাঁতে সাহায্য করে।
- একমাত্র ব্যাকটেরিয়াই প্রকৃতি থেকে মাটিতে নাইট্রোজেন সংবন্ধন করে।
- পাট থেকে আঁশ ছাড়াতে ব্যাকটেরিয়া সাহায্য করে।
- দই তৈরি করতে ও ব্যাকটেরিয়ার সাহায্য নিতে হয়।
- বিভিন্ন জীবন রক্ষাকারী এন্টিবায়োটিক ব্যাকটেরিয়া থেকে তৈরি হয়।
- ব্যাকটেরিয়া জীন প্রকৌশলের মূল ভিত্তি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে জীবের কাঙ্খিত বৈশিষ্ট্য পাওয়ার জন্য জীনগত পরিবর্তনের কাজে ব্যাকটেরিয়াকে ব্যবহার করা হয়।

পাঠ–৫–৬ : ছত্রাক, শৈবাল ও অ্যামিবা

ছত্রাক : ছত্রাক সমাঙ্গদেহী ক্লোরোফিলবিহীন অসবুজ উদ্ভিদ। ক্লোরোফিলের অভাবে এরা সালোকসংশ্লেষণ করতে পারে না । তাই এরা পরভোজী অথবা মৃতভোজী । পরভোজী ছত্রাক বাসি ও পচা খাদ্য দ্রব্য, ফলমূল, শাকসবজি, ভেজা রুটি বা চামড়া, গোবর ইত্যাদিতে জন্মায় । মৃতভোজী ছত্রাক মৃত জীবদেহে বা জৈব পদার্থেপূর্ণ মাটিতে জন্মায় ।

ছত্রাকের অর্থনৈতিক গুরুত্ব : পেনিসিলিনসহ বহু মূল্যবান ঔষধ ছত্রাক থেকে পাই। পাঁউরুটি তৈরিতে ঈস্ট নামক ছত্রাক ব্যবহার করা হয়। ঈস্ট ভিটামিন সমৃদ্ধ বলে ট্যাবলেট হিসেবেও ব্যবহার করা হচ্ছে। এগারিকাস নামক এক ধরনের মাশরুম সৌখিন খাদ্য বলে বিবেচিত। বর্তমানে আমাদের দেশসহ বহু দেশে এর চাষ করা হয়। আবর্জনা পচিয়ে মাটিতে মেশাতেও ছত্রাকের এদের ভূমিকা রয়েছে।

মানুষ, জীবজন্তু ও উদ্ভিদের বহু রোগের জন্য দায়ী এই ছত্রাক। দাদ, ছুলী (ছোলম) ও মানুষের শ্বাসনালির প্রদাহ ছত্রাকের সংক্রমণে হয়ে থাকে। ছত্রাক আলুর বিলম্বিত ধ্বসা রোগ, পাটের কালোপট্টি রোগ, আখের লাল পচা রোগ সৃষ্টি করে। এরা সহজেই কাঠ ও বেত বা বাঁশের আসবাবপত্র পচিয়ে আমাদের ক্ষতি করে।

ছত্রাক সংক্রমন প্রতিরোধকরণ : ছত্রাকজনিত রোগ খুবই ছোঁয়াচে । অর্থাৎ আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে এলে এ রোগ সংক্রমিত হতে পারে । এসব রোগ থেকে নিরাপদ থাকতে যা করা দরকার তা হলো:

- ছত্রাকজনিত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত জিনিসপত্র (কাপড়-চোপড়, চিরুনি, টুপি, স্যান্ডেল) ব্যবহার না করা ।
- ছত্রাকজনিত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে কম আসা ।
- ছত্রাক আক্রান্ত উদ্ভিদে ঔষধ ছিটানো বা উদ্ভিদ তুলে পুড়িয়ে ফেলা ।

শৈবাল : সমাঙ্গবর্গের ক্লোরোফিলযুক্ত ও স্ব-ভোজী উদ্ভিদরাই শৈবাল। এরা মাটি, পানি ও অন্য গাছের উপর জন্মায়। সবুজ ছাড়াও লাল, বাদামি ইত্যাদি রঙের শৈবাল দেখা যায়। 'স্পাইরোগাইরা' নামক শৈবাল বেশিরভাগ জলাশয়ে পাওয়া যায়।

শৈবাল উপকারিতা : আইসক্রিম তৈরিতে সামুদ্রিক শৈবালজাত অ্যালজিন ব্যবহৃত হয়। সামুদ্রিক শৈবাল আয়োডিন ও পটাশিয়ামের একটি ভালো উৎস। মৎস্য চাষে শৈবাল খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

শৈবাল অপকারিতা : মানুষ ও উদ্ভিদের নানা রোগ সৃষ্টিতে শৈবাল দায়ী। যেমন এক ধরনের শৈবাল চা-পাতার রেড রাস্ট রোগ সৃষ্টি করে। জলাশয়ে শৈবালের আধিক্য দেখা দিলে জলজ প্রাণী ও মাছ অক্সিজেনের অভাবে মারা যেতে পারে।

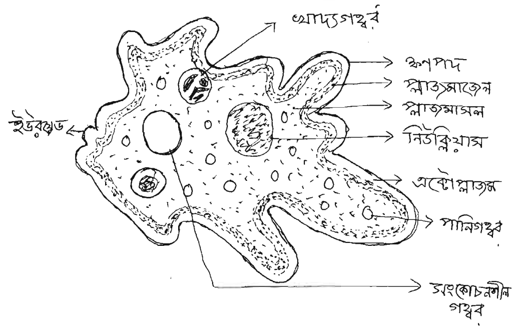

চিত্র-১.৬ : অ্যামিবার আণুবীক্ষনিক গঠন

অ্যামিবা : প্রোটিস্টা রাজ্যের সদস্য অ্যামিবা এককোষী প্রাণী। এদের দেহ ক্ষুদ্রাকার। অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এদের দেখা যায় না। এরা প্রয়োজনে দেহের আকার পরিবর্তন করে থাকে। এদের দেহ থেকে আঙুলের মতো তৈরি অভিক্ষেপকে ক্ষণপদ বলে। এর সাহায্যে অ্যামিবা খাদ্যগ্রহণ ও চলাচল করে। এদের দেহে পানিগহ্বর, খাদ্যগহ্বর ও সংকোচনগহ্বর থাকে। এদের সারা দেহ একটি পাতলা ও স্বচ্ছ পর্দা দ্বারা ঘেরা থাকে। একে প্লাজমালেমা বলা হয়। অ্যামিবা পানিতে, স্যাঁতস্যাঁতে মাটিতে, পুকুরের তলার পচা জৈব আবর্জনার মধ্যে জন্মে।

পাঠ–৭ : এন্টামিবা

আমাশয় রোগ সাধারণত দুই ধরনের, যথা– এমিবিক ও ব্যাসিলারি। ব্যাসিলারি আমাশয়ের কারণ এক ধরনের ব্যাসিলাস ব্যাক্টেরিয়া। এন্টামিবা নামক এক ধরনের এককোষী প্রাণীর আক্রমণে এমিবিক আমাশয় হয়ে থাকে।

এন্টামিবা: এন্টামিবা প্রোটিস্টা রাজ্যভুক্ত আরেক ধরনের এককোষী জীব। খালি চোখে এদের দেখা যায় না। এদের দেহের কোন নির্দিষ্ট আকৃতি নাই কারণ এরাও সর্বদাই অ্যামিবার মত আকার ও আকৃতি পরিবর্তন করতে থাকে। এদের দেহ স্বচ্ছ জেলির ন্যায়। তবে কখনো কখনো প্রতিকুল পরিবেশে এরা গোলাকার শক্ত আবরণে নিজেদের দেহ ঢেকে ফেলে। এ অবস্থায় একে সিস্ট বলে।

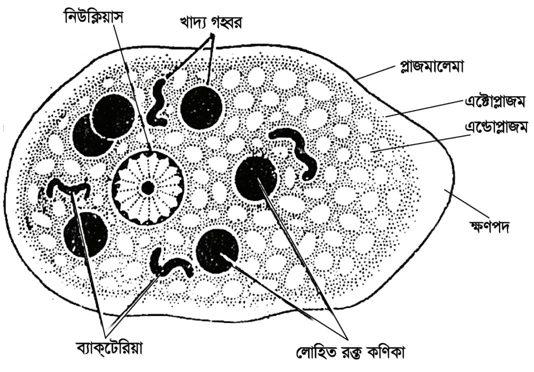

চিত্র- ১.৭ : এন্টামিবা

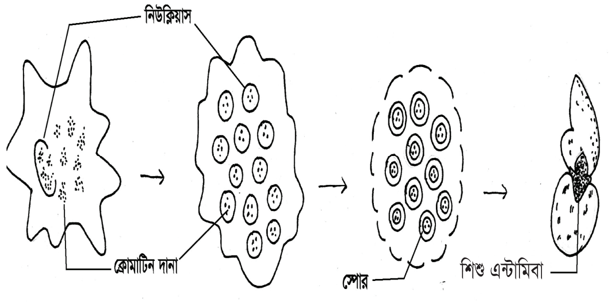

চিত্র- ১.৮ : এন্টামিবার বহুভাজন প্রক্রিয়া

এরা পরজীবী হিসাবে মানুষ, বানরজাতীয় প্রাণী, বিড়াল, কুকুর, শুকর ও ইদুঁরের বৃহদন্ত্রে বাস করে। এন্টামিবা এক ধরনের আমাশয় রোগের জন্য দায়ী।

এন্টামিবা কোষ বিভাজন ও অণুবীজ(স্পোর) সৃষ্টির মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে। স্পোরুলেশন পদ্ধতিতে একটি কোষের প্রোটোপ্লাজম বহুখন্ডে বিভক্ত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুবীজ বা স্পোর গঠন করে। অনুকূল পরিবেশে এরা প্রত্যেকে একটি নূতন অ্যামিবা হিসেবে বড় হয়।

রোগী রোগজীবাণুটি কোন লক্ষণ ছাড়াই বহন করে। এমিবিক আমাশয় সম্পূর্ণভাবে নিরাময় করা খুব কঠিন। উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ঔষধ খেলে এ রোগ সেরে যায়।

পাঠ –৮, ৯ : স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টিতে অণুজীবের ভূমিকা

ব্যাকটেরিয়া জীবাণু দেহাভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করতে পারে। অপরিষকার হাত জীবাণুর জন্য একটি সুবিধাজনক বাহন। যার মাধ্যমে সহজেই এরা মুখগহ্বরে ঢুকে যেতে পারে। আমরা যে জামা কাপড় ব্যবহার করি তাতে লেগে ব্যাকটেরিয়ার স্পোর স্থানান্তরিত হতে পারে।

বাতাসে যে ধুলাবালি উড়ে বেড়ায় তার সাথে অতি সহজেই ব্যাকটেরিয়া বা তার স্পোর এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে। হাত মেলানোর মাধ্যমেও ব্যাকটোরিয়া একজন থেকে অন্যজনে অতি সহজে স্থানান্তরিত হতে পারে। পচা ও বাসি খাদ্যের মাধ্যমে জীবাণু সহজেই ছড়ায়। কলেরা ও টাইফয়েব ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ। ভাইরাস, ব্যাকটোরিয়া ও এন্টামিবাজনিত রোগ এক সময় খুবই ভয়াবহভাবে ছড়িয়ে যেত। নিরাপদ পানির অভাবে এমন হত। যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগের কারণেও জনস্বাস্থ্যজনিত সমস্যা সৃষ্টি হয়। এসব মলমূত্রে যে জীবাণু থাকে তা ভক্ষণকারী অন্য জীব এগুলোকে ছড়িয়ে দেয়। এছাড়া বৃষ্টি বা জোয়ারের পানিতে এগুলো দূর দুরান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

কাজ : তোমারা তোমাদের এলাকায় ঘুরে দেখ কোন কোন বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা রয়েছে, তার একটি তালিকা কর এবং যাদের স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নেই তাদেরও এ ব্যাপারে সচেতন কর। তোমার কাজের বর্ণনা লিখে দেখাও।

আমাদের দেশের অনেক স্থানে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নেই এবং এসব অঞ্চলে মানুষ মাঠ বা কাঁচা পায়খানা ব্যবহার করে। এন্টামিবায় আক্রান্ত ব্যক্তির মল মাঠের মাটিতে মিশে যায়। এ মাটি হাতালে বা এ মাটিতে যে সবজি চাষ করা হয় তাতে এসব জীবাণু লেগে থাকে। সবজির ভিতরেও এরা প্রবেশ করে। রান্নার পরও দেখা যায় ঐ জীবাণু তখনও বেঁচে আছে। এভাবে এন্টামিবা সংক্রামিত হয়।

ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে অনেক সময় ২/৪ দিনে এমনি এমনি রোগ সেরে যায়। তবে কিছু মারাত্মক রোগ আছে যার জন্য দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। হাঁচি, কফ, থুতু ও কাশির মাধ্যমে সর্দি কাশির ভাইরাস ছড়ায়। সংস্পর্শ দ্বারা উদ্ভিদের মোজাইক রোগ ছড়ায়। আবার এইড্স রোগ একবার হলে আর নিরাময় হয় না। অসুস্থ লোকের রক্ত গ্রহণ, মাদক গ্রহণ, এক সুঁই-এ বহু লোকের ইনজেকশান গ্রহণ ও অসামাজিক কর্মকাণ্ডে এ রোগ ছড়ায়। মাম্পস,হাম,বসন্ত ইত্যাদি খুবই কষ্টকর রোগ। ভাইরাসজনিত এসব রোগ বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায় এবং আমাদের শ্বাসনালিতে প্রবেশ করে। এভাবে নানা মাধ্যমে ভাইরাস সুস্থ দেহে প্রবেশ করে।

পাঠ–১০ : মানবদেহে অণুজীব সৃষ্ট স্বাস্থ্যঝুঁকি প্রতিরোধ ও প্রতিকার

ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও এন্টামিবা যেসব রোগ সৃষ্টি করে তার প্রতিরোধ ও প্রতিকার করতে হলে সম্মিলিতভাবে স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মগুলো যত্ন সহকারে পালন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, দুর্বল স্বাস্থ্যের রোগাক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি বহন করে। তাই সকলের উচিত সুষম খাদ্য প্রয়োজন মতো নিয়মিত গ্রহণ করা।

কাজ : তোমার শ্রেণির যাদের নখ বড়, যারা আজ দাঁত ব্রাশ করেনি তাদের তালিকা বানাও এবং এ ব্যাপারে তাদের সচেতন কর।

শুধু গোশত আর মাছ খেলেই সুষম খাদ্যের ঘাটতি পূরণ হয় না। একইসাথে তাজা শাকসবজি ও ফলমূল খেলে তবেই সুষম খাদ্যের ঘাটতি পূরণ হয়। ভিটামিন ও খনিজ লবণ সুস্বাস্থ্য এবং রোগ প্রতিরোধের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এরপর আসে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার, স্বাস্থ্যবিধি মেনে হাত ও মুখ পরিষ্কার করা, নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করা, হাতের নখ কাটা ও সাবান ব্যবহার করে গোসল করা। রাস্তাঘাটে যত্রতত্র থুতু বা কফ না ফেলা। পথ চলতে বিশেষ করে ধুলাবালি উড়ছে এমন স্থানে চলাচলের সময় অবশ্যই মাস্ক বা রুমাল ব্যবহার করতে হবে। হাঁচি বা কাশি দেওয়ার সময় অবশ্যই মুখে ও নাকে রুমাল চাপা দিতে হবে। রুমালে সর্দি মুছলে অবশ্যই বাসায় ফিরে তা ধুয়ে ফেলতে হবে। তোমরা সম্ভব হলে নাক ঝাড়ার জন্য টিস্যু পেপার ব্যবহার করতে পার। আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহার্য কোনো কিছু ব্যবহার বা স্পর্শ এড়িয়ে চলা উচিত। খাবার পানি নিরাপদ হওয়া খুবই জরুরি। কলেরা, টাইফয়েড ইত্যাদি ব্যাকটেরিয়া সৃষ্ট রোগ থেকে বাঁচতে অবশ্যই নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে হবে। পান করা, গোসল ও কাপড় কাচা, বাসন ধোওয়া ইত্যাদির জন্য নিরাপদ পানি ব্যবহার করা উচিত। আর্সেনিকমুক্ত টিউবওয়েলের পানি নিরাপদ। পুকুর ও নদীর পরিষ্কার পানিও ব্যবহারের পূর্বে ভালোভাবে ফুটিয়ে নিতে হবে। মানুষ ও পশুপাখি আক্রান্ত হলে তাদের চিকিৎসা করাতে হবে। তবে ভাইরাস, যেমন বার্ডফ্লুতে আক্রান্ত পাখি মেরে মাটিতে পুঁতে রাখতে হয়। ম্যাডকাউ ও অ্যানথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত গরু–মহিষও মেরে ফেলা উচিত কারণ এর চিকিৎসা চলাকালীন অন্যান্য পশু আক্রান্ত হতে পারে।

কাজ : তোমাদের এলাকায় ঘুরে দেখ কোন কোন বাড়িতে নিরাপদ পানির ব্যবস্থা রয়েছে। না থাকলে প্রয়োজনীয় করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

এলাকার সবাইকে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে জীবনযাপনে উৎসাহিত করতে হবে। কীভাবে এসব জীবাণু মানবদেহে ঢুকে পড়ে এবং কী করলে এদের প্রতিরোধ করা যাবে সে সম্পর্কে নিজে ভালোভাবে জানতে হবে। বিদ্যালয়ে, মসজিদে, মন্দিরে, খেলার মাঠে, হাটে, বাজারে যেখানে লোকসমাগম বেশি সেখানেই এ বিষয়ে আলোচনা শুরু করা যায়। এ ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করাটাই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিরোধ। রোগাক্রান্ত হলে অবশ্যই রোগীকে একজন ভালো চিকিৎসকের নিকট গিয়ে পরামর্শ নিতে হবে। প্রয়োজনে ঔষধ সেবন করতে হবে। হাতুড়ে ডাক্তারের চিকিৎসায় রোগ নিরাময়ের বদলে রোগ জটিল স্তরে পৌঁছে যায়। এ ব্যাপারে আমাদের সকলের অনেক দায়িত্ব রয়েছে।

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, অ্যামিবা ইত্যাদি নিম্ন শ্রেণির জীব।
- ভাইরাস অকোষীয় জীব।
- ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, অ্যামিবা ইত্যাদি রোগ সৃষ্টিকারী জীব।
- পানি, বায়ু ও অপরিচ্ছন্ন হাত রোগ জীবাণু ছড়ায়।
- স্বাস্থ্যসম্মতভাবে জীবন যাপন রোগ প্রতিরোধ করে।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. মানুষের টাইফয়েড রোগের কারণ ——————————।

২. আমাশয় রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীবের নাম —————————— ।

৩. জীবন্ত দেহের বাইরে —————————— কোনো জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করে না।

৪. —————————— নামক ছত্রাক পাউরুটির কারখানায় ব্যবহার করা হয়।

৫. দণ্ডাকৃতির ব্যাকটেরিয়াকে —————————— বলে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রকৃত পরজীবী কথার অর্থ কী?
২. ব্যাকটেরিয়াজনিত চারটি রোগের নাম লিখ।
৩. অণুজীব কারা?
৪. কোন কোন উপাদান নিয়ে ভাইরাসের দেহ গঠিত?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিউমোনিয়া রোগ সৃষ্টি করে কোন ব্যাকটেরিয়া?

ক. স্পাইরিলাম   খ. ব্যাসিলাস
গ. কক্কাস   ঘ. কমা

২. শৈবাল ব্যবহৃত হয়–

i. আইসক্রিম প্রস্তুতকরণে   ii. মাছ চাষের ক্ষেত্রে   iii. ঔষধ তৈরি করতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

তারেক আখ খাবার সময় লক্ষ করল আখের গায়ে লাল দাগ পড়েছে। তার বাবা বললেন এটি একধরনের পরজীবীর কারণে সৃষ্টি হয়।

৩. উদ্দীপকের পরজীবী জীবটি সৃষ্টি করে–

i. রেড রাস্ট   ii. ট্রাকিয়ার প্রদাহ   iii. মাথার খুশকি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

৪. তারেকের লক্ষ করা রোগটির জন্য কোনটি দায়ী?

ক. ছত্রাক   খ. শৈবাল
গ. ব্যাকটেরিয়া   ঘ. ভাইরাস

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

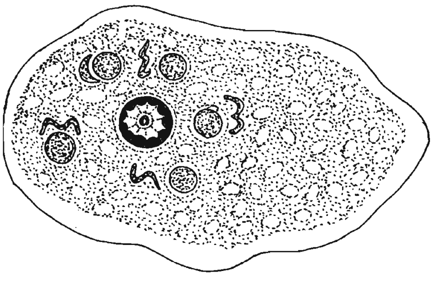

A

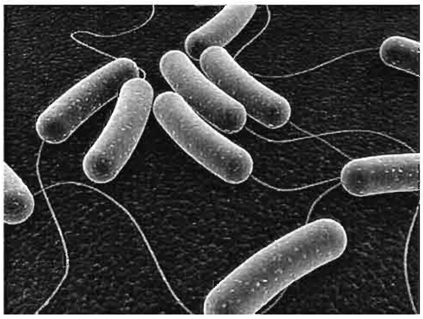

B

ক. শৈবাল কী?

খ. ছত্রাককে মৃতজীবী বলা হয় কেন?

গ. A দ্বারা সৃষ্ট রোগ প্রতিরোধের উপায় ব্যাখ্যা কর।

ঘ. B ক্ষতিকারক জীব হলেও পরিবেশের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিসহ তোমার মতামত দাও।

২. সোহেল ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়েছে। তার বাবা তাকে হাঁচি ও কাঁশি দেওয়ার সময় রুমাল ব্যবহার করতে বললেন।

ক. ভাইরাস কী?

খ. ভাইরাসকে অকোষীয় জীব বলা হয় কেন?

গ. সোহেলকে রুমাল ব্যবহার করতে বলার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সোহেল রোগটি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অন্যদের কীভাবে সচেতন করবে তা বিশ্লেষণ কর।

নিজেরা কর

১) একখণ্ড পাঁউরুটি ভিজিয়ে অন্ধকার ঘরে কয়েকদিন রেখে দাও। এর পর রুটির উপরে যে সাদা বা কাল আস্তরণ দেখা যাবে সেগুলো অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে দেখ এবং যা দেখছ তার ছবি আঁক। বিষয়টি নিয়ে শিক্ষকের সাথে আলোচনা কর।

২) ঢেঁড়শ পাতা, পেঁপে পাতাসহ অন্যান্য গাছের কুঁচকানো পাতা সংগ্রহ কর এবং বিষয়টি নিয়ে দলে আলোচনা কর। পাতার এ রকম পরিবর্তনের কারণ খুঁজে বের কর। প্রয়োজনে শিক্ষকের সাহায্য নাও।

২০১৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

উদ্ভিদ ও প্রাণীর কোষীয় সংগঠন

প্রাকৃতিক পরিবেশে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবদেহ থেকে শুরু করে অতি বৃহদাকার ও উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের সাংগঠনিক এবং কার্যপ্রণালিতে প্রচুর মিল–অমিল রয়েছে। সকল জীবদেহের মধ্যে সাধারণ মিল বা সাদৃশ্যটি হলো যে, জীবদেহ মাত্রই কোষ দ্বারা গঠিত। বিগত কয়েকশ বছর ধরে বিজ্ঞানীগণ নিরলস প্রচেষ্টায় কোষের গঠন, আকৃতি, প্রকৃতি ও অন্যান্য বিষয়ে প্রচুর গবেষণামূলক কাজ করেছেন। একটি জীবদেহের সব কোষের গঠন প্রকৃতি এক রকম নয় বরং ভিন্ন। আমরা এ পরিচ্ছেদে কোষের গঠন বর্ণনা করব কিন্তু নিম্নে বর্ণিত সকল অঙ্গাণু এক সাথে এক কোষে পাওয়া যায় না। তাই মোটামুটি সব ধরনের কোষে যেসব ক্ষুদ্র অঙ্গাণু পরিলক্ষিত হয় সেগুলোকে বর্ণনার জন্য একটি কোষের আওতায় এনে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথম দিকে যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে জীববিজ্ঞানীরা কোষের যে ধারণা পেয়েছিলেন তা ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পর আরও সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত হয়েছে। সেই আলোকে আদর্শ কোষ আলোচনা করা হলো।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- উদ্ভিদ এবং প্রাণিকোষের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করতে পারব।
- প্রাণী এবং উদ্ভিদকোষের তুলনা করতে পারব।
- কোষের বিভিন্ন অঙ্গাণুর গঠন ও কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন প্রকার টিস্যুর কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব
- উদ্ভিদ ও প্রাণিটিস্যুর পার্থক্য করতে পারব।

২০১৬

পাঠ ১–২ : একটি উদ্ভিদ কোষের বর্ণনা

প্রতিটি জীবদেহ এক বা একাধিক কোষ দিয়ে গঠিত হয়। একটি আদর্শ উদ্ভিদকোষ প্রধানত দুটি অংশ নিয়ে গঠিত– কোষপ্রাচীর এবং প্রোটোপ্লাজম।

কোষপ্রাচীর : উদ্ভিদকোষের ক্ষেত্রে কোষঝিল্লির বাইরে জড় পদার্থ দিয়ে তৈরি একটি পুরু প্রাচীর থাকে, একে কোষপ্রাচীর বলে। এটি সেলুলোজ দ্বারা গঠিত। প্রাণিকোষে এ ধরনের প্রাচীর থাকে না। প্রাণিকোষের আবরণটি প্লাজমা পর্দা দ্বারা গঠিত। কোষের সজীব অংশকে রক্ষা করা এবং কোষের সীমারেখা নির্দেশ করা কোষপ্রাচীরের প্রধান কাজ।

প্রোটোপ্লাজম : প্রোটোপ্লাজম কোষের অর্ধতরল,
প্রোটোপ্লাজমের নানাবিধ বিক্রিয়ার ফলে জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলো পরিলক্ষিত হয়। এটি বিভিন্ন জৈব ও অজৈব যৌগ সমন্বয়ে গঠিত। প্রোটোপ্লাজমে পানির পরিমাণ সাধারণত শতকরা ৬৭ থেকে ৯০ ভাগ।

প্রোটোপ্লাজম কোষের প্রধান দুটি অংশ সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস ধারন করে।

সাইটোপ্লাজম: কোষের প্রোটোপ্লাজমের নিউক্লিয়াসের বাহিরে জেলির মতো অংশকে সাইটোপ্লাজম বলে। সাইটোপ্লাজমের অভ্যন্তরে অবস্থিত কোষের বিভিন্ন জৈবনিক ক্রিয়াকলাপের সাথে সংশ্লিষ্ট সজীব বস্তুসমূহকে একত্রে সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু বলা হয়। একটি আর্দশ কোষে সাধারণত নিম্নলিখিত অঙ্গাণুগুলো দেখা যায়–

১. প্লাস্টিড, ২. মাইটোকন্ড্রিয়া, ৩. গলজি বডি, ৪. এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা, ৫. রাইবোজোম, ৬. লাইসোজোম ও ৭. সেন্ট্রিওল।

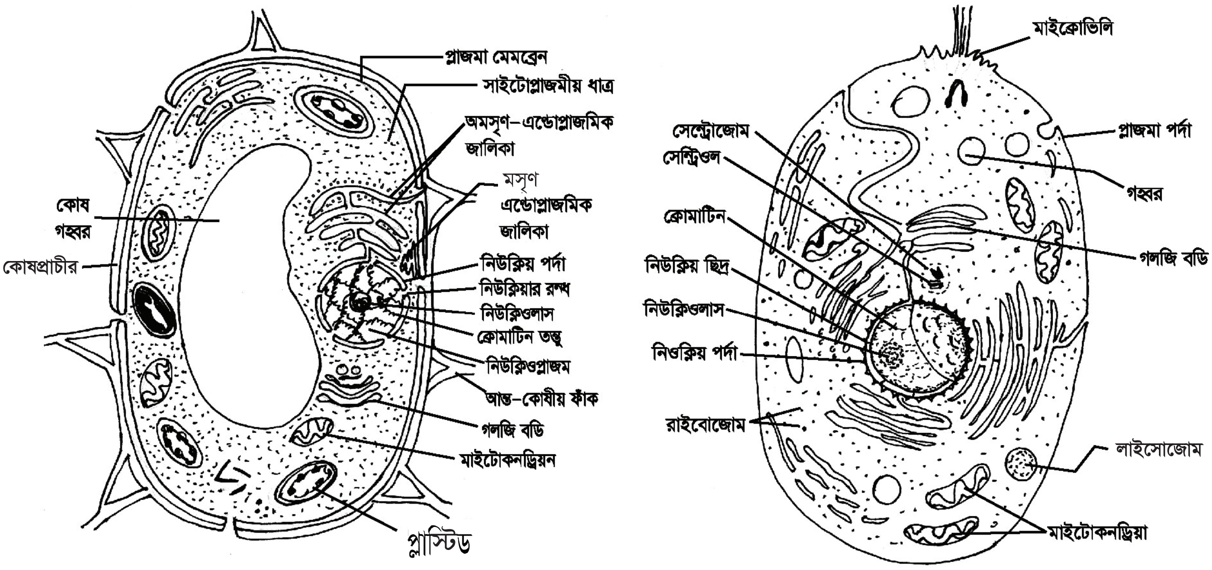
প্লাজমা মেমব্রেন
সাইটোপ্লাজমীয় ধাত্র
অমসৃণ–এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা
মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা
কোষ গহ্বর
কোষপ্রাচীর
নিউক্লিয় পর্দা
নিউক্লিয়ার রন্ধ্র
নিউক্লিওলাস
ক্রোমাটিন তন্তু
নিউক্লিওপ্লাজম
আন্ত–কোষীয় ফাঁক
গলজি বডি
মাইটোকনড্রিয়ন
প্লাস্টিড
মাইক্রোভিলি
প্লাজমা পর্দা
গহ্বর
গলজি বডি
সেন্ট্রোজোম
সেন্ট্রিওল
ক্রোমাটিন
নিউক্লিয় ছিদ্র
নিউক্লিওলাস
নিওক্লিয় পর্দা
রাইবোজোম
লাইসোজোম
মাইটোকনড্রিয়া

চিত্র : ক. আদর্শ উদ্ভিদকোষের বিভিন্ন অংশ

চিত্র : খ. আদর্শ প্রাণিকোষের বিভিন্ন অংশ

চিত্র- ২.১

কোষগহ্বর : কোষের সজীব অঙ্গাণু এবং নির্জীব বস্তুসমূহ সাইটোপ্লাজমের ধাত্রে থাকে। উদ্ভিদ কোষের নির্জীব বস্তুসমূহের মধ্যে আছে বিভিন্ন রকমের সঞ্চিত পদার্থ, বর্জ্য পদার্থ ও ক্ষরিত পদার্থ। কোষের সাইটোপ্লাজমে তরল পদার্থপূর্ণ (কোষরস) ছোট-বড় গহ্বর থাকে তাদের কোষগহ্বর বলে। প্রাণিকোষে

সাধারণত কোষগহ্বর থাকে না তবে কোনো কোনো কোষে যদি থাকে তা আকারে খুব ছোট। উদ্ভিদকোষে কোষগহ্বর বেশি থাকে এবং আকারে বড় হয়। এ কারণে উদ্ভিদকোষে নিউক্লিয়াস একপাশে এবং প্রাণিকোষে নিউক্লিয়াস মাঝে থাকে। নানা প্রকার জৈব এসিড, লবণ, শর্করা, আমিষ ইত্যাদি কোষগহ্বরে দ্রবীভূত অবস্থায় থেকে কোষরস প্রস্তুত করে।

কাজ : চিত্র দেখে দলগতভাবে প্রাণী ও উদ্ভিদকোষের মধ্যে পার্থক্যগুলো পোস্টার কাগজে লিখে উপস্থাপন কর ।

পাঠ ৩ – ৫ : কোষ অঙ্গাণুগুলোর পরিচয়

সাইটোপ্লাজমে সুনির্দিষ্ট আবরণীযুক্ত সজীব বস্তুগুলো কোষ অঙ্গাণু। নিচে এগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

প্লাস্টিড : সজীব উদ্ভিদকোষের সাইটোপ্লাজমে বর্ণহীন অথবা বর্ণযুক্ত গোলাকার বা ডিম্বাকার অঙ্গাণুকে প্লাস্টিড বলে। সাধারণত প্রাণিকোষে প্লাস্টিড নেই। এ অঙ্গাণুটি উদ্ভিদকোষের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। প্লাস্টিড উদ্ভিদের খাদ্য সংশ্লেষে, বর্ণ গঠনে এবং খাদ্য সঞ্চয়ে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। রঞ্জক পদার্থের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির উপর নির্ভর করে প্লাস্টিডকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ক্রোমোপ্লাস্টিড বা বর্ণযুক্ত প্লাস্টিড এবং লিউকোপ্লাস্টিড বা বর্ণহীন প্লাস্টিড। ক্রোমোপ্লাস্টিড দুই রকম– ক্লোরোপ্লাস্ট ও ক্রোমোপ্লাস্ট। এদের মধ্যে তিনটি অংশ পরিলক্ষিত হয়। যথা– আবরণী, স্ট্রোমা এবং গ্রানা। প্লাস্টিডের মধ্যে ক্লোরোপ্লাস্টে সবুজ বর্ণের ক্লোরোফিল নামক রঞ্জক পদার্থ থাকায় সবুজ বর্ণ ধারণ করে। সালোকসংশ্লেষণে সহায়তা করা এর প্রধান কাজ।

ক্রোমোপ্লাস্ট ফুলের পাপড়ি ও ফলের ত্বকে বিভিন্ন বর্ণবৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। সবুজ ফল পাকার সময় ক্লোরোপ্লাস্ট ক্রোমোপ্লাস্টে রূপান্তরিত হয়ে বর্ণবৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। টমেটোর যে লাল টকটকে রং দেখ তা এ ক্রোমোপ্লাস্টের লাইকোপেন নামক রঞ্জক পদার্থের জন্য হয়। ক্রোমোপ্লাস্টে লাল, কমলা ও হলুদ বর্ণের ক্যারোটিনয়েড নামক রঞ্জক পদার্থ থাকে।

উদ্ভিদের যেসব অংশে আলো পৌঁছায় না, সেসব অংশের কোষে লিউকোপ্লাস্টিড থাকে। যেমন মূলের কোষের প্লাস্টিড। সূর্যালোকের প্রভাবে এ প্লাস্টিডগুলো রূপান্তরিত হয়ে ক্লোরোপ্লাস্টে পরিণত হয়। তোমরা নিশ্চয় লক্ষ করে থাকবে, যদি সবুজ দুর্বাঘাস ইট দিয়ে কিছুদিন ঢাকা থাকে তবে ঘাসগুলো সাদা হয়ে যায়, কারণ ক্লোরোপ্লাস্টগুলো লিউকোপ্লাস্টে রূপান্তরিত হয়ে যায়। পরবর্তীতে ইট সরিয়ে নিলে সূর্যের আলোয় ঘাসগুলো আবার সবুজ বর্ণের হয়ে যায়। এতে প্রমাণিত হয় যে এক ধরনের প্লাস্টিড রূপান্তরিত হয়ে অন্য ধরনের প্লাস্টিডে পরিণত হয়।

মাইটোকন্ড্রিয়া : সজীব উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষের সাইটোপ্লাজমে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা ছোট ছোট দণ্ডাকার অঙ্গাণুগুলোকে মাইটোকন্ড্রিয়া বলে (এক বচনে মাইটোকন্ড্রিয়ন)। প্রতিটি মাইটোকন্ড্রিয়ন দ্বিস্তর পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে। এর বহিঃপর্দাটি মসৃণ। কিন্তু অন্তঃপর্দাটি আঙুলের মতো অনেক ভাঁজ সৃষ্টি করে। এদেরকে

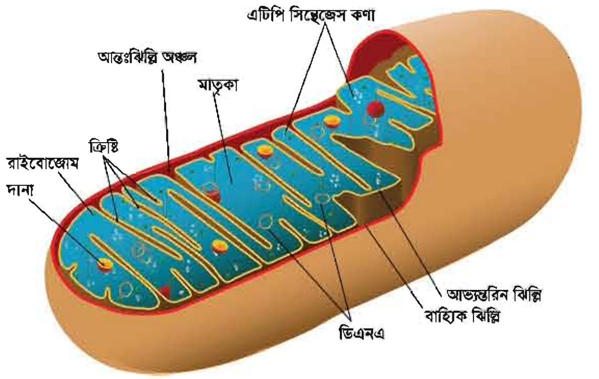

চিএ:২.২ মাইটোকন্ড্রিয়ন

ক্রিস্টি বলে।

জীবের যাবতীয় বিপাকীয় কাজের শক্তির উৎস হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়া। এ জন্য মাইটোকন্ড্রিয়াকে কোষের ‘পাওয়ার হাউস’ বলে। সবুজ উদ্ভিদকোষে এর সংখ্যা বেশি তবে প্রাণীর যকৃৎ কোষে এর সংখ্যা সহস্রাধিক।

গলজি বডি : এগুলো পর্দাঘেরা গোলাকার বা সূত্রাকার অঙ্গাণু যা নিউক্লিয়াসের কাছে অবস্থান করে। উৎসেচক, হরমোন ইত্যাদি ক্ষরণ করা এর কাজ।

সেন্ট্রিওল : প্রাণিকোষের নিউক্লিয়াসের কাছে দুটি ফাঁপা নলাকার বা দণ্ডাকার অঙ্গাণু দেখা যায়, তাদের সেন্ট্রিওল বলে, সেন্ট্রিওল সাধারণত একটি স্বচ্ছ দানাবিহীন সাইটোপ্লাজম দ্বারা আবৃত থাকে। এ অংশকে সেন্ট্রোজোম বলে। উদ্ভিদকোষে সেন্ট্রিওল সাধারণত থাকে না, তবে নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদকোষে যেমন– ছত্রাকে থাকে। প্রাণিকোষ বিভাজনের সময় অ্যাস্টার গঠন করা সেন্ট্রিওলের প্রধান কাজ।

নিউক্লিয়াস : প্রোটোপ্লাজমে পর্দা দিয়ে বেষ্টিত সর্বাপেক্ষা ঘন বস্তুকে নিউক্লয়াস বলে।

প্রতিটি নিউক্লিয়াস চারটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত হয়– i. নিউক্লিয়ার মেমব্রেন বা নিউক্লিয়ার পর্দা ii. নিউক্লিওলাস iii. নিউক্লিওজালিকা iv. নিউক্লিওপ্লাজম।

নিউক্লিয়াস–এর ভৌত গঠন পরীক্ষার প্রকৃত সময় কোষ বিভাজন–এর পূর্ব মুহূর্তে ইন্টারফেজ দশায়। নিউক্লিয়াসের চারটি অংশ নিচে আলোচনা করা হল।

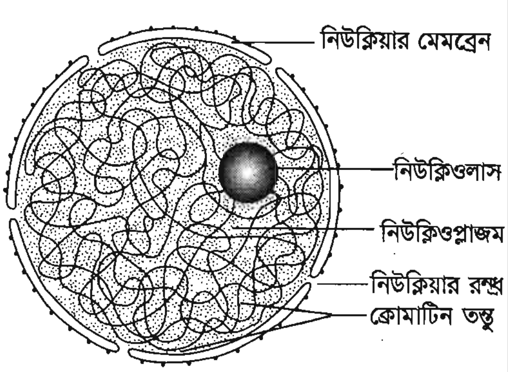

চিত্রঃ ২.৩ নিউক্লিয়াসের বিভিন্ন অংশ

i. **নিউক্লিয়ার পর্দা :** সজীব ও দ্বিস্তরবিশিষ্ট পর্দা দিয়ে প্রতিটি নিউক্লিয়াস আবৃত থাকে, তাকে নিউক্লিয়ার পর্দা বলে। নিউক্লিয়ার পর্দা অসংখ্যা ছিদ্রযুক্ত। এসব ছিদ্রের নাম নিউক্লিয়ার রন্ধ্র।

নিউক্লিয়ার পর্দা সাইটোপ্লাজম এর সাথে নিউক্লিয়াসের বিভিন্ন বস্তুর যোগাযোগ রক্ষা করে এবং নিউক্লিয়াসকে রক্ষণাবেক্ষণ করে।

ii. **নিউক্লিওপ্লাজম :** নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরস্থ নিউক্লিয়ার মেমব্রেন দিয়ে আবৃত স্বচ্ছ, দানাদার ও জেলির মতো অর্ধতরল পদার্থটির নাম নিউক্লিওপ্লাজম বা ক্যারিওলিম্ফ। এটি নিউক্লিওলাস ও ক্রোমোজোমের মাতৃকা বা ধারক হিসেবে কাজ করে এবং নিউক্লিয়াসের জৈবনিক কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে।

iii. **নিউক্লিওলাস :** নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে অবস্থিত ক্ষুদ্র, গোলাকার, উজ্জ্বল ও অপেক্ষাকৃত ঘন বস্তুটি নিউক্লিওলাস নামে পরিচিত। সাধারণত প্রতি নিউক্লিয়াসে একটি নিউক্লিওলাস থাকে।

iv. **নিউক্লিওজালিকা বা ক্রোমাটিন তন্তু :** নিউক্লিওপ্লাজমে ভাসমান অবস্থায় প্যাঁচানো সুতার মতো গঠনটি নিউক্লিওজালিকা বা ক্রোমাটিন জালিকা নামে পরিচিত। কোষ বিভাজনের সময় তন্তুময় গঠনটি কতগুলো টুকরায় পৃথক হয়ে যায়। প্রতিটি টুকরাকে ক্রোমোজোম বলা হয়।

কাজ : একটি আলু কেটে সামান্য পানিতে কচলিয়ে সে পানির দুই–তিন ফোঁটা অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখ এবং চিত্রের সাথে মিলাও। এগুলো কি কোষের অঙ্গাণু নাকি অন্য বস্তু? এগুলো কোষের কী?

নতুন শব্দ-

কোষপর্দা, প্রোটোপ্লাজম, সাইটোপ্লাজম, প্লাস্টিড, মাইটোকন্ড্রিয়া, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, লাইসোজোম, উপক্ষার, নিউক্লিক এসিড ও ক্রোমোজোম।

পাঠ ৬–৭ : উদ্ভিদটিস্যুর বৈশিষ্ট্য ও কাজ

জীবদেহ এককোষী অথবা বহুকোষী হতে পারে। যেসব জীবের দেহ একটি কোষ দিয়ে গঠিত তারা এককোষী। একটি মাত্র কোষ দিয়ে এদের পুষ্টি, রেচন, শ্বসন, জনন ইত্যাদি যাবতীয় জৈবিক কাজ সম্পন্ন হয়। বহু কোষ নিয়ে গঠিত জীবদেহকে বহুকোষী জীব বলে। বহুকোষী জীবদেহ গঠনকারী টিস্যুগুলোর মধ্যে একদিকে যেমন শ্রেণিবিন্যাস ঘটে তেমনি অপর দিকে শ্রম বিভাজনও হয়ে থাকে। কারণ যদি সকল কোষ একই সাথে এবং একই রকম ভাবে জৈবিক কার্য সম্পন্ন করত তাহলে জীবদেহের গঠন বৈচিত্র্য এবং শারীরবৃত্তীয় ও জৈবিক কাজগুলোতে নানা রকমের বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। এতে সুষ্ঠ জৈবিক ধারা বজায় থাকত না। সুষ্ঠু জৈবিক ক্রিয়া এবং সুষ্ঠু জীবন ধারা রক্ষায় বিভিন্ন প্রকার কোষ সমবেত ভাবে বা একত্রে কাজ করার জন্য জীবদেহে গুচ্ছাকারে থাকে।

উৎপত্তির দিক থেকে একইরকম কতগুলো কোষ আয়তনে ও আকৃতিতে অভিন্ন বা ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও যদি দলগত ভাবে অবস্থান করে একই ধরনের কাজ করে তখন সেই দলবদ্ধ কোষগুলোকে টিস্যু বলে।

উদ্ভিদটিস্যু

উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহ বিভিন্ন প্রকার টিস্যু দ্বারা গঠিত। এককে ধরনের টিস্যু এককে ধরনের কাজ সম্পন্ন করে।

বিভাজন ক্ষমতা অনুসারে টিস্যু প্রধানত দুই রকম, যথা– ক) ভাজক টিস্যু ও খ) স্থায়ী টিস্যু।

ভাজক টিস্যু : উদ্ভিদের দেহে যেসব টিস্যুর কোষের বিভাজনক্ষমতা রয়েছে সেগুলোকে ভাজক টিস্যু বলে। ভাজক টিস্যু উদ্ভিদের বর্ধনশীল অঙ্গে অবস্থান করে। বিশেষত কাণ্ড ও মূলের অগ্রভাগে অবস্থান করে।

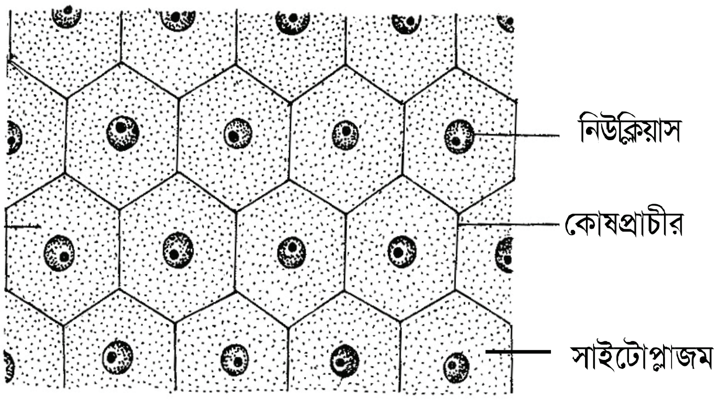

চিত্র- ২.৪ : ভাজক টিস্যু

ভাজক টিস্যুর কাজ :

- ক্রমাগত বিভাজনের ফলে ভাজক টিস্যু নতুন নতুন কোষ ও টিস্যু সৃষ্টি করে।
- এটি উদ্ভিদের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের বৃদ্ধি ঘটায়।
- ভাজক টিস্যু টিস্যুর উৎপত্তি ঘটায়।

স্থায়ী টিস্যু : ভাজক টিস্যু থেকে উৎপন্ন বিভাজন ক্ষমতাহীন নির্দিষ্ট আকৃতিযুক্ত পরিণত টিস্যুকে স্থায়ী টিস্যু বলে। উদ্ভিদের প্রায় সর্বত্র স্থায়ী টিস্যু দেখা যায়।

স্থায়ী টিস্যুর কাজ :

- খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবহন করা।
- দেহ গঠন ও উদ্ভিদকে দৃঢ়তা প্রদান করা।

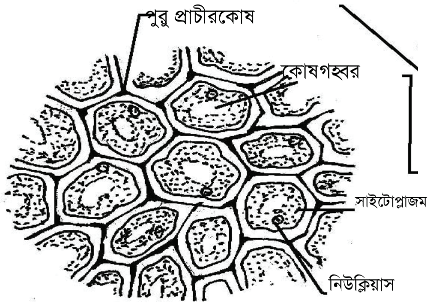

চিত্র- ২.৫ : স্থায়ী টিস্যু

কাজ : ভাজক ও স্থায়ী টিস্যুর চিত্র দেখে এদের বৈশিষ্ট্যগুলো আলাদা করে পোস্টারে লিখে দলে উপস্থাপন কর ।

পাঠ ৮–১০ : প্রাণীটিস্যুর বৈশিষ্ট্য ও কাজ

আমরা কীভাবে হাঁটাচলা করি, কীভাবে খাবার খাই, কীভাবে শ্বাস–প্রশ্বাস নেই লক্ষ কর। এ কাজগুলো যেমন আলাদা তেমনি ভিন্ন প্রকৃতির। আমরা পা দিয়ে হাঁটি, হাত দিয়ে লিখি, মুখ দিয়ে খাবার খাই, দাঁত দিয়ে খাবার চিবাই। এ কাজগুলো করে আলাদা আলাদা অঙ্গ। এই অঙ্গগুলোর কোষের গঠন ও কাজ আলাদা। আমাদের দেহের হাড়, মাংস, মস্তিষ্ক ইত্যাদি অনেকগুলো কোষ দিয়ে তৈরি যাদের গঠন ও কাজ ভিন্ন প্রকৃতির।

বহুকোষী প্রাণীতে এভাবে অনেকগুলো কোষ যখন কোনো নির্দিষ্ট কাজ করে তখন ঐ কোষগুলোকে একত্রে টিস্যু (Tissue) বা কলা বলা হয়। এসব কোষের উদ্দেশ্য এক হলেও এদের আকার, আয়তন ও গঠন ভিন্ন হতে পারে। এটা নির্ভর করে টিস্যু ও কোষের কাজের ধরনের উপর। প্রাণিদেহ বিভিন্ন প্রকার টিস্যু দিয়ে গঠিত। টিস্যু সাধারণত চার ধরনের হয়। যথা–

ক. আবরণী টিস্যু

খ. যোজক টিস্যু

গ. পেশি টিস্যু

ঘ. স্নায়ু টিস্যু

ক. আবরণী টিস্যু বা এপিথিলিয়াল টিস্যু

যে টিস্যু দেহের খোলা অংশ ঢেকে রাখে এবং দেহের ভিতরের আবরণ তৈরি করে তাকে আবরণী কলা বলে। আমাদের ত্বকের বাইরের আবরণ মুখগহ্বরের ভিতরের আবরণ ইত্যাদি আবরণী টিস্যু দিয়ে গঠিত। দেহের বিভিন্ন গ্রন্থিগুলোও আবরণী টিস্যু দিয়ে তৈরি।

আবরণী টিস্যুর বৈশিষ্ট্য

- আবরণী টিস্যুগুলো এক বা একাধিক স্তরে সাজানো থাকে।
- কোষগুলো একটি পাতলা ভিত্তি পর্দার উপর সাজানো থাকে।
- এধরনের কলাতে কোনো আন্তঃকোষীয় ধাত্র (matrix) থাকে না।

কাজ : এ টিস্যু দেহের ভিতরের ও বাইরের অঙ্গাগুলোকে আঘাত থেকে রক্ষা করে। পাকস্থলি ও অন্ত্রের আবরণী কলা পাচক রস ক্ষরণ করে জিহ্বার আবরণী কলা কাজ করে।

খ. পেশি টিস্যু বা মাসকুলার টিস্যু

দেহের কোনো কোনো পেশি আমরা ইচ্ছামত চালনা করতে পারি। যেমন– হাত বা পায়ের পেশি। এ পেশিগুলো আমরা যেভাবে চালাতে চাই সেভাবেই চলে। আবার দেহের কোনো কোনো পেশি আমরা ইচ্ছামতো চালনা করতে পারি না। এ ধরনের পেশি তাদের নিজের ইচ্ছামতো চলে। যেমন– পাকস্থলির পেশি।

এ আলোচনা থেকে জানলাম পেশি দুই প্রকার। যথা–

১. ঐচ্ছিক পেশি এবং
২. অনৈচ্ছিক পেশি।

কাজ : তোমার হাতের কনুই বাঁকাও ও সোজা কর। এতে তোমার হাতের পেশির কী পরিবর্তন ঘটছে? কেন পরিবর্তন ঘটছে? কীভাবে এ পরিবর্তন ঘটছে? লক্ষ কর এবং লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

১. ঐচ্ছিক পেশি

আমরা যখন কনুই বাঁকা করি তখন উর্ধ্ব বাহুর সামনের দিকের পেশি সংকুচিত হয়ে নিম্ন বাহুকে টেনে বাঁকা করে। যে পেশি আমরা ইচ্ছামতো সংকুচিত ও প্রসারিত করে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালন করতে পারি, তাকে ঐচ্ছিক পেশি বলে। মানবদেহে ঐচ্ছিক পেশির সংখ্যা বেশি। এ পেশি হাড়ের সাথে লেগে থেকে আমাদের অঙ্গ নড়াচড়া করতে সাহায্য করে।

২. অনৈচ্ছিক পেশি

আমাদের খাদ্য নালিতে খাদ্য পরিবহনের দায়িত্ব পালন করছে অন্ত্রের পেশি। এ ধরনের পেশির উপর আমাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। অর্থাৎ যেসব পেশি আমাদের ইচ্ছামতো সংকুচিত হয় না, তাদের অনৈচ্ছিক পেশি বলে। হৃৎপেশি নামে আরেক ধরনের বিশেষ অনৈচ্ছিক পেশি আছে। এ পেশি নিজ ছন্দে পর্যায়ক্রমে সংকুচিত ও স্বাভাবিক হয়ে দেহের রক্ত সঞ্চালন করছে। শুধু হৃৎপিন্ড এ পেশি দ্বারা গঠিত।

পেশির কাজ :

- দেহের আকৃতি দান করে ও অস্থি সঞ্চালনে সহায়তা করে।
- নড়াচড়া ও চলাচলে সাহায্য করে।
- দেহের ভিতরের অঙ্গাগুলোকে রক্ষা করে।
- হৃৎপেশি দেহে রক্ত সঞ্চালনে সহায়তা করে।

কাজ : একটি টেবিলের উপর এমনভাবে বস যাতে পা'দুটো ঝুলে থাকে। হাটুর নিচ থেকে একটি পা সোজা কর। আবার একটু বাঁকাও। কোন পেশিগুলো এই নড়াচাড়ায় অংশ নিচ্ছে? হাত দিয়ে ধরে বোঝার চেষ্টা কর এবং কী বুঝলে তা শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

২০১৫

পাঠ : ১১

যোজক টিস্যু বা কানেক্টিভ টিস্যু : যোজক টিস্যু প্রাণিদেহের বিভিন্ন টিস্যু এবং অঙ্গের মধ্যে সংযোগ সাধন করে। এই টিস্যু প্রধানত কঠিন, তরল ও মেদময় হয়। যেমন–রক্ত, হাড়, তরুণাস্থি, মেদময় কলা ইত্যাদি যোজক টিস্যুর উদাহরণ।

যোজক কলার কাজ :

হাড়ের গঠনের একটি প্রধান উপাদান হলো ক্যালসিয়াম। হাড় দেহের কাঠামো গঠন করে, দেহের ভার বহন করে ও দৃঢ়তা দান করে। পেশিবন্ধনী বা টেন্ডন পেশিকে হাড়ের সাথে যুক্ত করে। মেদ কলা স্নেহ পদার্থ সঞ্চিত রাখে। তন্তুময় যোজক টিস্যু ফুসফুস ও রক্তনালির প্রাচীর সংকোচন ও প্রসারণে সাহায্য করে। তরুণাস্থি হাড়ের চেয়ে নরম ও অন্যান্য টিস্যুর চেয়ে বেশি চাপ ও টান সহ্য করতে পারে। যেমন– নাক ও কানের তরুণাস্থি। রক্ত বিভিন্ন দ্রব্যাদি (অক্সিজেন, খাদ্য, রেচন পদার্থ) দেহের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবহন করে। এছাড়া রক্ত রোগ জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করে। রক্ত তরল যোজক কলা।

স্নায়ুটিস্যু বা নার্ভটিস্যু

প্রাণিদেহের যে কলা উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে উপযুক্ত প্রতিবেদন সৃষ্টি করতে পারে তাকে স্নায়ুটিস্যু বা নার্ভটিস্যু বলে। স্নায়ুটিস্যুর একক হচ্ছে স্নায়ুকোষ বা নিউরন। মস্তিষ্ক অসংখ্য স্নায়ুকোষ বা নিউরন দিয়ে তৈরি। প্রতিটি নিউরন তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত। যথা–

(ক) কোষদেহ (খ) ডেনড্রন এবং (গ) অ্যাক্সন।

স্নায়ুটিস্যুর কাজ

- দেহের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ও সংবেদন গ্রহণকারী অঙ্গ থেকে গৃহীত উদ্দীপনা মস্তিষ্কে প্রেরণ করে।
- দেহের কার্যকর অংশ এ উদ্দীপনায় সাড়া দেয়। যেমন– মশা কামড়ালে এ অনুভূতি মস্তিষ্কে পাঠায়। মস্তিষ্ক হাতকে এ কথা জানায় তখন হাত মশা মারার চেষ্টা করে।
- উদ্দীপনা বা ঘটনাকে স্মৃতিতে ধারণ করে।
- দেহের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।

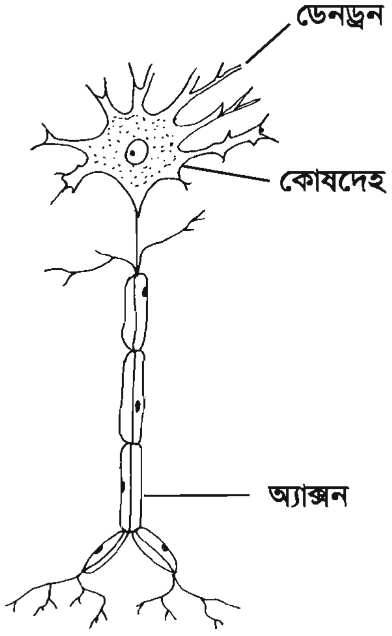

চিত্র-২.৬: একটি স্নায়ুকোষ

কাজ : তুমি চোখ বন্ধ কর। কিছু দেখতে পাচ্ছ কি? কান হাত দিয়ে বন্ধ কর। কিছু শুনতে পাচ্ছ কি? তুমি পড়া মনে রাখ কীভাবে? এই কাজগুলো করতে তোমার দেহের কোন টিস্যু সাহায্য করে, তার একটি কোষের চিত্র অংকন কর ও এর বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- জীবদেহের গঠনগত ও কার্যগত এককের নাম কোষ।
- বিজ্ঞানী রবার্ট হুক প্রথম কোষ আবিষ্কার করেন।
- কোষ মধ্যস্থ সম্পূর্ণ সজীব অংশকে প্রোটোপ্লাজম বলে।
- সাইটোপ্লাজমের মধ্যে অবস্থিত সজীব অঙ্গাণুগুলোর নাম যথাক্রমে নিউক্লিয়াস, প্লাস্টিড, মাইটোকন্ড্রিয়া, গলগিবস্তু, সেন্ট্রিওল ইত্যাদি।
- প্লাস্টিড তিন প্রকার। যথা– ক্লোরোপ্লাস্টিড, ক্রোমোপ্লাস্টিড ও লিউকোপ্লাস্টিড।
- মাইটোকন্ড্রিয়াকে শক্তির ঘর বলা হয় কারণ শ্বসন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তি মাইটোকন্ড্রিয়াতে সঞ্চিত থাকে।
- উৎপত্তির দিক থেকে এক হয়ে সম আকৃতির অথবা ভিন্ন আকৃতির কোষগুলো যদি দলগতভাবে একই ধরনের কাজ করে, তখন সেই দলবদ্ধ কোষগুচ্ছকে টিস্যু বলে।
- টিস্যু প্রধানত দুই প্রকার– ভাজক টিস্যু ও স্থায়ী টিস্যু। ভাজক টিস্যু থেকে স্থায়ী টিস্যুর উৎপত্তি।
- যে টিস্যুর কোষগুলো ক্রমাগত বিভাজিত হয়ে নতুন কোষ সৃষ্টি করে তাকে ভাজক টিস্যু বলে।
- ভাজক টিস্যু থেকে উৎপন্ন বিভাজন ক্ষমতাহীন নির্দিষ্ট আকৃতিযুক্ত পরিণত টিস্যুকে স্থায়ী টিস্যু বলে।
- হৃৎপেশি এক ধরনের বিশেষ অনৈচ্ছিক পেশি।
- রক্ত এক ধরনের যোজক কলা।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. ———— টিস্যু বিভাজন অক্ষম।

২. উদ্ভিদ টিস্যু দুই ধরনের ———— টিস্যু ও ———— টিস্যু।

৩. হৃৎপেশি এক ধরনের ———— পেশি।

৪. মস্তিষ্ক অসংখ্য ———— দ্বারা গঠিত।

৫. ———— কোষের পাওয়ার হাউস বলে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পেশির কাজ বর্ণনা কর।

২. আবরণী টিস্যুর বৈশিষ্ট্য লিখ।

৩. নিউক্লিয়াসের গঠন বর্ণনা কর।

৪. প্লাস্টিডের কাজ উল্লেখ কর।

৫. মাইটোকন্ড্রিয়ার গঠন বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ভাজক কোষে অনুপস্থিত কোনটি?

ক. কোষপ্রাচীর	খ. নিউক্লিয়াস
গ. কোষগহ্বর	ঘ. সেলুলোজ

২. কোষগহ্বরে বিদ্যমান থাকে–

i. জৈব এসিড ও লবণ

ii. আমিষ ও শর্করা

iii. অজৈব এসিড ও জৈব এসিড

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii	খ. i ও iii
গ. ii ও iii	ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

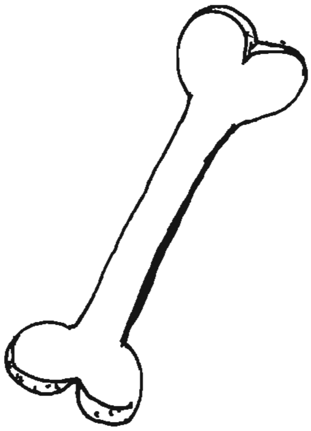

A

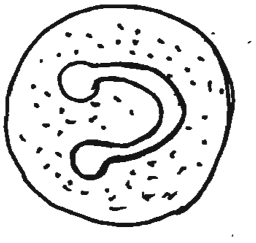

B

৩. উদ্দীপকের A চিহ্নিত অংশটির কাজ হচ্ছে –

i. দৃঢ়তা প্রদান করা

ii. চর্বি জমা রাখা

iii. রক্ত কণিকা তৈরি করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii	খ. i ও iii
গ. ii ও iii	ঘ. i, ii ও iii

৪. A ও B এর বৈশিষ্ট্য হলো–

i. এরা যোজক টিস্যু

ii. এরা অক্সিজেন পরিবহন করে

iii. এদের প্রধান উপাদান ক্যালসিয়াম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i	খ. iii
গ. i ও ii	ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

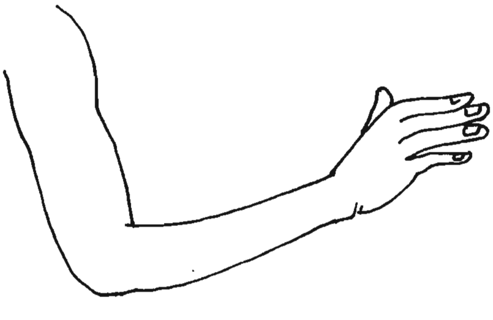

P

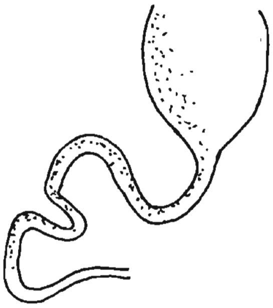

Q

ক. রক্ত কী?

খ. আবরণী টিস্যু বলতে কী বোঝায়?

গ. P চিত্রে অস্থির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

ঘ. P ও Q চিত্রের পেশির টিস্যুর তুলনামূলক পার্থক্য কর।

২.

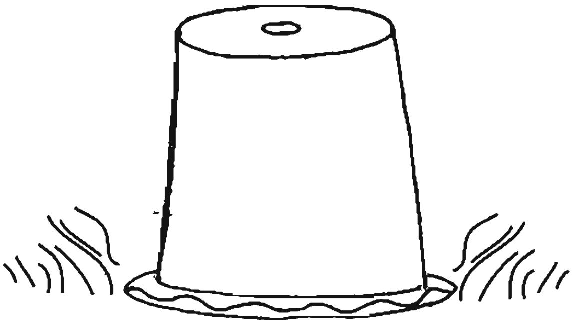

M

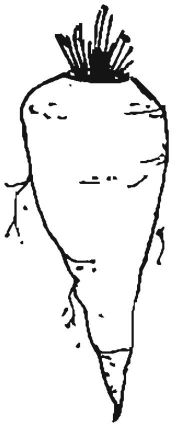

N

ক. কোষ প্রাচীর কী?

খ. মাইটোকন্ড্রিয়াকে শক্তিঘর বলা হয় কেন?

গ. চিত্র N মূল হওয়া স্বত্ত্বেও বর্ণময় কেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. চিত্র M এর টবে ঢাকা উদ্ভিদটিতে ৮–১০ দিন পর যে পরিবর্তন ঘটবে তা বিশ্লেষণ কর।

নিজেরা কর

১। তোমার দেহের কোন কোন অঙ্গ ঐচ্ছিক পেশি তার একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

তৃতীয় অধ্যায়

উদ্ভিদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

কখনও কখনও উদ্ভিদের মূল, কান্ড ও পাতা এমন ভাবে রূপান্তরিত হয় যে তাদের চেনাই যায় না। কেন এরা রূপান্তরিত হয় এবং কীভাবেই বা তাদের নিজ রূপে চেনা যাবে এ অধ্যায়ে তা আলোচনা করা হবে।

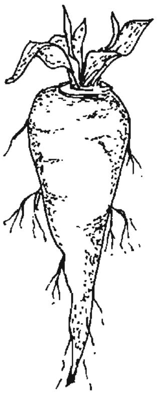

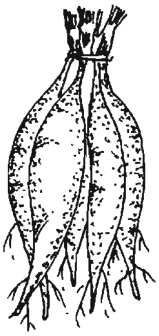

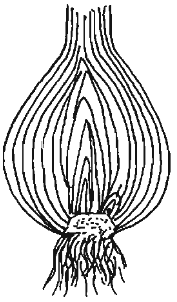

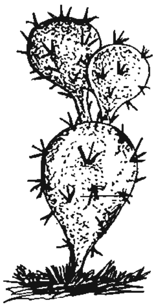

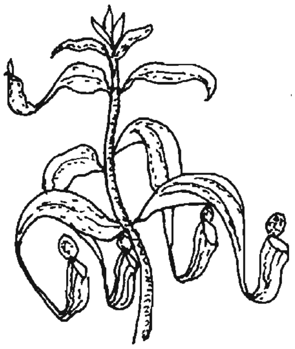

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- রূপান্তরিত মূলের গঠন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রূপান্তরিত কাণ্ডের গঠন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রূপান্তরিত পত্রের গঠন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রূপান্তরিত মূল, কান্ড ও পাতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রূপান্তরিত মূল, কান্ড ও পাতার চিত্র অঙ্কণ করতে পারব।
- আমাদের জীবনে রূপান্তরিতমূল, কান্ড ও পাতার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারব।

পাঠ– ১ : প্রধান মূলের রূপান্তর

মূলের প্রধান কাজ হল গাছকে মাটির সঙ্গে আবদ্ধ রাখা। কিন্তু মূল কখনো বিশেষ কাজ সম্পাদনের জন্য রূপান্তরিত হতে পারে। এবার খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য প্রধান মূলের রূপান্তর সম্পর্কে আলোচনা করব। মুলা, গাজর ও শালগম আমরা সবাই দেখেছি এবং খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করেছি। এগুলো মূল না কান্ড? একটু লক্ষ কর। এদের গায়ে কি কোনো “গিট বা পর্ব আছে? পাতা আছে? মুকুল আছে? না নেই। মাটির উপরে যে পাতা দেখা যায় তা মূলের উপরে অবস্থিত ক্ষুদ্র কান্ডের গা থেকে বেরিয়েছে। আকৃতিগত দিক থেকে এরা চার প্রকার, যথা– ১। **মুলাকৃতি মূল, ২। গাজরাকৃতি মূল ৩। শালগমাকৃতি মূল এবং ৪। কন্দাকৃতি মূল।**

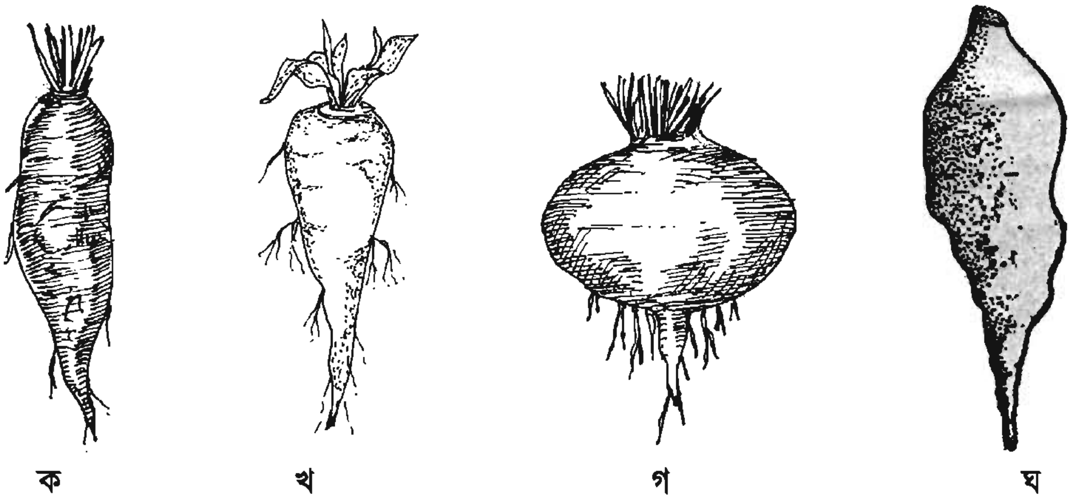

চিত্র- ৩.১ : বিভিন্ন ধরনের রূপান্তারিত মূল, ক. মুলাকৃতি মূল, খ. গাজরাকৃতি মূল, গ. শালগমাকৃতি মূল, ঘ. কন্দাকৃতি মূল

মুলাকৃতি মূল: এরা খাদ্য সঞ্চয় করে তাই প্রধান মূল মোটা ও রসাল হয়। এই মূলের মধ্যভাগ মোটা কিন্তু দুই প্রান্ত ক্রমশ সরু। যেমন – মুলা।

গাজরাকৃতি মূল: এরা খাদ্য সঞ্চয় করে তাই প্রধান মূলটি মোটা ও রসাল হয়। এই মূলের উপরের দিক মোটা এবং নিচের দিকে ক্রমশ সরু হয়ে যায়। যেমন – গাজর।

শালগমাকৃতি মূল: এই ক্ষেত্রে প্রধান মূলটির উপরের অংশ খাদ্য সঞ্চয়ের ফলে গোলাকার এবং নিচের অংশ হঠাৎ করে সরু হয়ে যায়। যেমন – শালগম।

কন্দাকৃতি মূল: খাদ্য সঞ্চয়ের ফলে কখনো কখনো প্রধান মূলটি অনিয়মিতভাবে মোটা হয়। এদের কোনো নির্দিষ্ট আকার বা আকৃতি নেই। যথা– সন্ধ্যামালতি।

পাঠ–২–৪ : রূপান্তরিত অস্থানিক মূল

অস্থানিক মূল বিশেষ বিশেষ কার্য সাধনের জন্য পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হয়ে থাকে। অস্থানিক মূল সাধারণত তিন ধরনের কাজ করার জন্য রূপান্তরিত হয়ে থাকে, যথা– খাদ্য সঞ্চয়, যান্ত্রিক ভারসাম্য রক্ষা ও শারীরবৃত্তীয় কার্য সম্পাদন।

খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য রূপান্তর : বিভিন্ন ধরনের অস্থানিক মূল ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করে স্ফীত হয় এবং বিভিন্ন আকার ধারণ করে, যেমন মিষ্টি আলুর কন্দাল মূল, শতমূলী ও ডালিয়ার গুচ্ছিত কন্দ মূল ও করলার মালাকৃতির মূল ইত্যাদি। মিষ্টি আলুর কন্দাল অস্থানিক মূল মাটির কাছাকাছি কাণ্ডের পর্ব হতে বের হয় এবং খাদ্য সঞ্চয় করার ফলে অনিয়মিত ভাবে স্ফীত হয়ে অনির্দিষ্ট আকার ধারণ করে। খাদ্য সঞ্চয় করা এই মূলের পরিবর্তিত কাজ।

কন্দাল মূল (চিত্র ৩.২) : অস্থানিক মূল কখনো অনিয়মিতভাবে স্ফীত হয়, যথা– মিষ্টি আলু।

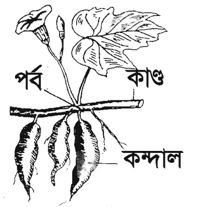

চিত্র-৩.২: কন্দাল মূল

গুচ্ছিত কন্দমূল (চিত্র ৩.৩): ইহা কন্দাল মূলের মতো খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য অনিয়মিতভাবে স্ফীত হয়। তবে স্ফীত মূলগুলো একটি গুচ্ছে অবস্থান করে কারণ, এক গুচ্ছ অস্থানিক মূলের সবগুলোই খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য কন্দের মতো স্ফীত হয়ে থাকে এই জন্য এই মূলকে গুচ্ছিত কন্দমূল বলা হয়। খাদ্য সঞ্চয়ই এর প্রধান কাজ। উদাহরণ– শতমূলী ও ডালিয়া।

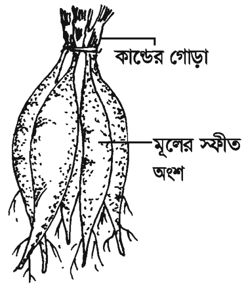

চিত্র- ৩.৩ : ডালিয়ার গুচ্ছিত কন্দমূল

নড়ুলুজ মূল (চিত্র ৩.৪) : যখন মূলের অগ্রভাগ খাদ্য সঞ্চয় করে স্ফীত হয়, যেমন– আমআদা।

মালা আকৃতির মূল (চিত্র ৩.৫) : যখন কোনো অস্থানিক মূল পর্যায়ক্রমে স্ফীত ও সংকুচিত হয়, যথা– করলার মূল।

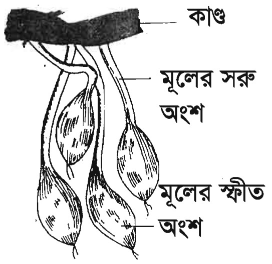

চিত্র ৩.৪ : নড়ুলুজ মূল

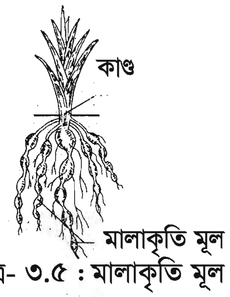

চিত্র- ৩.৫ : মালাকৃতি মূল

যান্ত্রিক ভারসাম্য রক্ষার্থে রূপান্তর

এ মূল উদ্ভিদকে মাটির উপর খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে, আরোহণ করতে বা পানিতে ভাসতে সাহায্য করে। এ জন্য অস্থানিক মূলের বিভিন্ন রকম রূপান্তর ঘটে থাকে, যেমন– স্তম্ভমূল, ঠেসমূল, আরোহী মূল, ভাসমান মূল ইত্যাদি।

আরোহী মূল (চিত্র ৩.৬) : এই মূল দুর্বল কাণ্ডযুক্ত উদ্ভিদের পর্ব হতে উৎপন্ন হয়ে অন্য কোনো উদ্ভিদ বা অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরে এবং উদ্ভিদটিকে উপরে উঠতে সাহায্য করে, যেমন– পান।

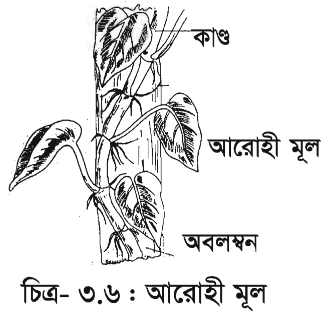

চিত্র- ৩.৬ : আরোহী মূল

স্তম্ভমূল (চিত্র ৩.৭): এই ধরনের অস্থানিক মূল কান্ড বা শাখা হতে উৎপন্ন হয়। এরা খাড়াভাবে নিচের দিকে নামতে নামতে মাটির মধ্যে প্রবেশ করে এবং মোটা হয়ে স্তম্ভের আকার ধারণ করে, যেমন– বট।

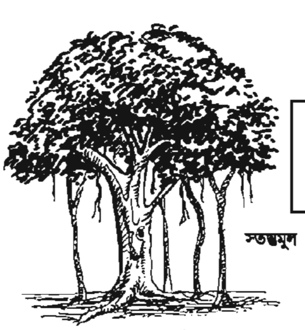

স্তম্ভমূল : শাখা–প্রশাখার অতিরিক্ত ভার বহন করে এবং গাছকে দৃঢ়তা প্রদান করে।

চিত্র-৩.৭ : বটের স্তম্ভমূল

ঠেস মূল (চিত্র ৩.৮) : কোনো কোনো উদ্ভিদের প্রধান কাণ্ড দুর্বল হওয়ার কারণে সোজাভাবে দাড়াতে পারে না। তাই কাণ্ডের গোড়ার দিক থেকে কতগুলো অস্থানিক মূল বের হয়ে তীর্যকভাবে মাটিতে প্রবেশ করে, যেমন – কেয়ার ঠেশ মূল।

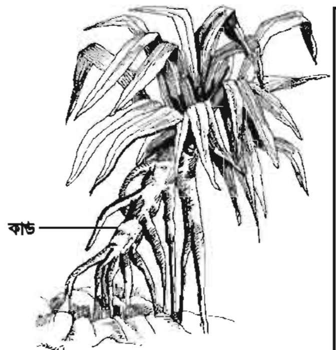

ঠেস মূল : পর্ব, পর্বমধ্য ও পাতা ধারণ করে না। গাছকে সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করে

চিত্র-৩.৮ : কেয়ার ঠেস মূল

শারীরবৃত্তিয় কার্য সাধনের জন্য রূপান্তর

মূলের স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় কাজ ছাড়াও বিশেষ বিশেষ শারীরবৃত্তীয় কাজ সমাধা করার জন্য অস্থানিক মূলের রূপান্তর ঘটে থাকে।

পরাশ্রয়ী বায়বীয় মূল (চিত্র ৩.৯) : এক প্রকার মূল বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প গ্রহণ করে। এদের বায়বীয় মূল বলে। যথা– রাস্না।

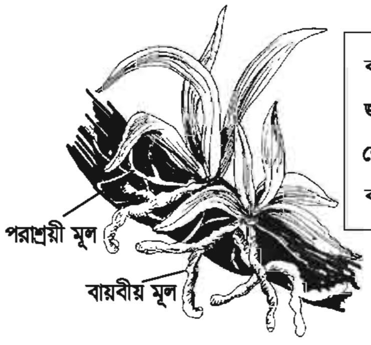

বায়বীয় মূল : জলীয় বাষ্প শোষণ ও সঞ্চিত করে।

চিত্র-৩.৯ : রাস্নার বায়বীয় মূল

পরজীবী বা শোষক মূল (চিত্র ৩.১০) : পরজীবী উদ্ভিদে ক্লোরোফিল থাকে না তাই খাদ্যের জন্য আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের দেহে বিশেষ ধরণের মূল প্রবেশ করিয়ে খাদ্যরস শোষণ করে থাকে। এ মূলগুলোকে শোষক মূল বলে, যেমন– স্বর্ণলতা।

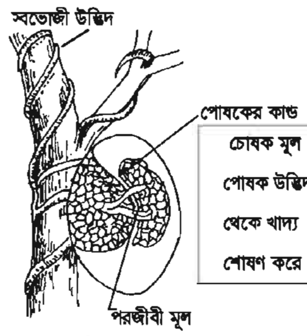

চোষক মূল : পোষক উদ্ভিদ থেকে খাদ্য শোষণ করে।

চিত্র-৩.১০ : স্বর্ণলতার শোষক মূল

শ্বাসমূল (চিত্র ৩.১১) : সমুদ্র উপকূলে লবণাক্ত ও কর্দমাক্ত মাটিতে উদ্ভিদের প্রধান মূল হতে শাখা মূল মাটির উপরে খাড়াভাবে উঠে আসে। এই সকল মূলে ছোট ছোট ছিদ্র থাকে। এই ধরনের রূপান্তরিত মূলকে শ্বাসমূল বা নিউমাটোফোর বলে। যেমন– সুন্দরী, গরান ইত্যাদি।

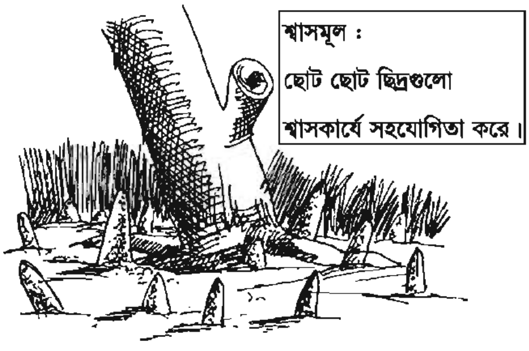

চিত্র-৩.১১ : শ্বাসমূল

জনন মূল (চিত্র ৩.১২) : কোনো কোনো উদ্ভিদের মূল প্রজননে অংশ গ্রহণ করে থাকে। যেমন– মিষ্টি আলু, পটল, কাকরোল ইত্যাদি।

পাঠ ৫–৭ : রূপান্তরিত কাণ্ড

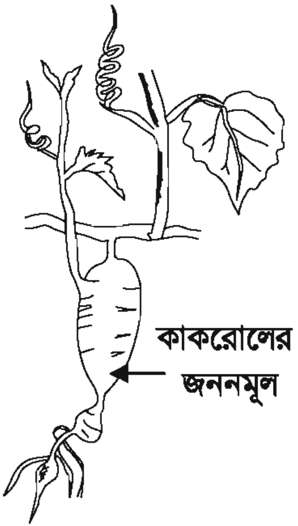

চিত্র-৩.১২ : জনমূল

তোমরা জান, কাণ্ড সাধাণরত মাটির উপরে অবস্থান করে এবং পাতা, ফুল ও ফল ধারণ করে। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে সাধারণ কাজ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পন্ন করার জন্য কাণ্ডের আকৃতিগত ও অবস্থাগত পরিবর্তন ঘটে। এ ধরনের পরিবর্তনকে কাণ্ডের রূপান্তর বলে। অবস্থান অনুযায়ী রূপান্তরিত কাণ্ড তিন প্রকার, যথা– ১) **ভূ– নিম্নস্থ ২) অর্ধ বায়বীয় ও ৩) বায়বীয়।**

ভূ–নিম্নস্থ রূপান্তরিত কাণ্ড

প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকা, খাদ্য সঞ্চয় এবং অঙ্গজ উপায়ে বংশবিস্তার করার জন্য কিছু কিছু উদ্ভিদের কাণ্ড মাটির নিচে বৃদ্ধি পায়। এ ধরনের কাণ্ডকে ভূ–নিম্নস্থ রূপান্তরিত কাণ্ড বলে। এরা চার প্রকারের, যথা– স্ফীত কন্দ, মৌলকাণ্ড বা রাইজোম, কন্দ ও গুড়িকন্দ।

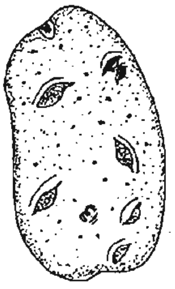

চিত্র-৩.১৩ : টিউবার

টিউবার বা স্ফীত কন্দ : গোল আলু স্ফীতকন্দের উদাহরণ। স্ফীত কন্দে পর্ব, পর্বমধ্য, শল্কপত্র ও কাক্ষিক মুকুল থাকে। শল্কপত্রের কক্ষে গর্তের মতো অংশকে "চোখ" বলে। অনুকূল ঋতুতে "চোখ" হতে কাক্ষিক মুকুল বৃদ্ধি পেয়ে নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি করে। খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য স্ফীত হয়ে এরা গোলাকার রূপ ধারণ করে।

রাইজোম : আদা, হলুদ প্রভৃতি উদ্ভিদের কাণ্ড রাইজোম–জাতীয়। এরা মাটির নিচে খাদ্য সঞ্চয় করে সমান্তরাল বা খাড়াভাবে অবস্থান করে। এদের সুস্পষ্ট পর্ব ও পর্বমধ্য থাকে। পর্ব হতে শল্কপত্র ও অস্থানিক মূল এবং শল্কপত্রের কক্ষে কাক্ষিক মুকুল উৎপন্ন হয়।

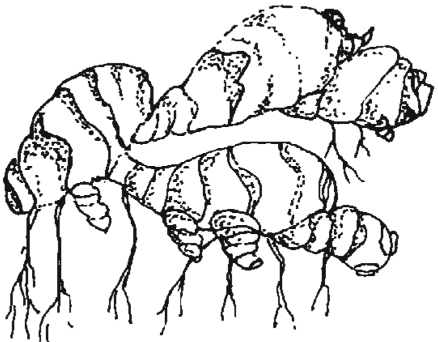

চিত্র-৩.১৪ : রাইজোম

কন্দ : পিঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি উদ্ভিদের কাণ্ড এই প্রকারের। এদের কাণ্ডটি (কন্দ) খুবই ক্ষুদ্র, গোলাকার ও উত্তল। পর্ব ও পর্বমধ্যগুলো সংকুচিত। পুরু ও রসালো শল্কপত্রগুলো এমন ভাবে অবস্থান করে যে কন্দটিকে দেখা যায় না। এ কাণ্ডের নিচের দিক থেকে প্রচুর অস্থানিক গুচ্ছমূল বের হয়।

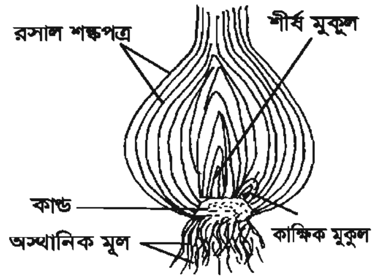

চিত্র-৩.১৫ : কন্দ

গুঁড়িকন্দ : ওলকচু গুড়িকন্দের উদাহরণ। এ ধরনের কাণ্ড বেশ বড়। আকৃতিতে প্রায় গোলাকার। এতে সুস্পষ্ট পর্ব ও পর্বমধ্য থাকে। শল্কপত্রের কক্ষে উৎপন্ন পার্শ্ব বা কাক্ষিক মুকুলগুলি বড় হয় এবং শিশু গুড়িকন্দের সৃষ্টি করে।

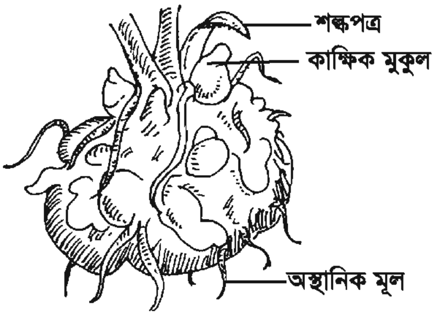

চিত্র-৩.১৬ : গুড়িকন্দ

অর্ধবায়বীয় রূপান্তরিত কাণ্ড

নরম কাণ্ডযুক্ত (বিরুৎ) উদ্ভিদে এক ধরনের বিশেষ শাখা উৎপন্ন হয়। এ শাখাগুলো অঙ্গজ প্রজননের মাধ্যমে নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি করে থাকে। মাটির উপরে বা সামান্য নিচে অবস্থিত এ ধরনের দুর্বল শায়িত রূপান্তরিত কাণ্ডকে অর্ধবায়বীয় কাণ্ড বলে। এরা চার প্রকারের হতে পারে।

রানার বা ধাবক: থানকুনি, দুর্বাঘাস, আমরুল ইত্যাদি উদ্ভিদের কাণ্ডের নিচের পর্বের কাক্ষিক মুকুল থেকে যে শায়িত শাখা জন্মায় তাকে ধাবক বলে।

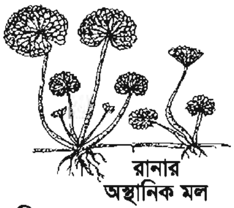

চিত্র-৩.১৭ : ধাবক

স্টোলন বা বক্র ধাবক : এরা এক বিশেষ ধরনের ধাবক। কচু উদ্ভিদের গোড়া থেকে লম্বা শাখা বের হয়। এ শাখার শুধুমাত্র পর্বগুলি অস্থানিক মূলের সাহায্যে মাটি ধরে রাখে বাকি শাখাটি বক্রভাবে অবস্থান করে। কক্ষে সৃষ্ট মুকুল থেকে পরে নুতন উদ্ভিদ জন্মায়।

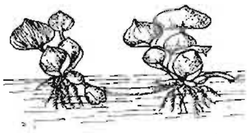

চিত্র-৩.১৮ : অফসেট

অফসেটঃ টোপাপানা, কচুরিপানা নামক জলজ উদ্ভিদের পর্বমধ্যগুলো ছোট ও মোটা হওয়ার কারণে কান্ডকে খর্বাকৃতি দেখায়। এদের অফসেট বলে।

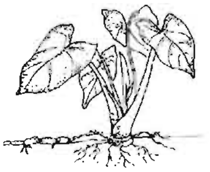

চিত্র-৩.১৯ বক্র ধাবক

সাকার বা উর্ধ্ব ধাবক ঃ চন্দ্র মল্লিকা, বাঁশ প্রভৃতি উদ্ভিদের শায়িত কাক্ষিক মুকুল থেকে উৎপন্ন হয়ে শাখাটির অগ্রভাগ মাটির উপরে চলে আসে এবং নুতন উদ্ভিদ উৎপন্ন করে।

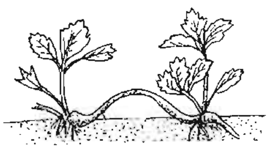

চিত্র : উর্ধ্ব ধাবক

চিত্র-৩.২০ : উর্ধ্ব ধাবক

বায়বীয় রূপান্তরিত কাণ্ড

এ সকল কাণ্ড মাটির উপরে স্বাভাবিক কাণ্ডের মত অবস্থান করে কিন্তু

বিশেষ ধরনের কাজ যেমন- খাদ্য তৈরি, অঙ্গজ প্রজনন, আত্মরক্ষা, আরোহণ ইত্যাদি কাজের জন্য রূপান্তরিত হয়ে থাকে। এরা চার প্রকারের হতে পারে।

ফাইলোক্ল্যাড বা পর্ণ কান্ড : ফনিমনসা জাতীয় উদ্ভিদটিই এ ধরনের কান্ডের উদাহরণ। এ ধরনের কান্ড পাতার মত চ্যাপ্টা ও সবুজ, যার ফলে এরা খাদ্য তৈরি করতে পারে। পাতাগুলো কাঁটায় পরিণত হয়ে উদ্ভিদের আত্মরক্ষার কাজ করে।

স্টেম টেনড্রিল বা শাখা আকর্ষী: ঝুমকোলতা, হাড়জোড়া ইত্যাদি দুর্বল আরোহী উদ্ভিদের পত্রকক্ষ থেকে সুতার মতো সরু, লম্বা ও প্যাঁচানো যে অংশগুলো বের হয় তাকে শাখা আকর্ষী বলে। আকর্ষীতে পাতা উৎপন্ন হয় না ।

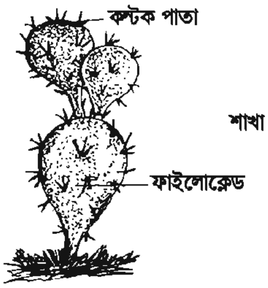
কন্টক পাতা
ফাইলোক্লেড
চিত্র-৩.২১: পর্ণ কান্ড

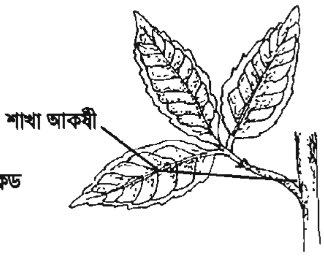

চিত্র-৩.২২ : শাখা আকষী

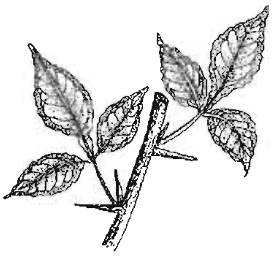
চিত্র-৩.২৩ : শাখা কন্টক

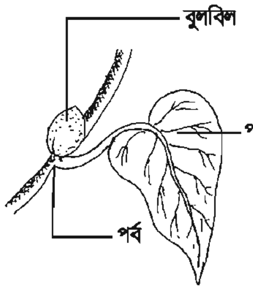

চিত্র-৩.২৪ : বুলবিল

থর্ন বা শাখা কন্টক : অনেক সময় কাক্ষিক মুকুল শাখা মুকুল তৈরি না করে শক্ত ও সুঁচালো কাঁটায় রূপান্তরিত হয়। বেলো, ময়নাকাঁটা, মেহেদি ইত্যাদি উদ্ভিদে কাঁটার মতো শাখা কন্টক দেখা যায়।

বুলবিল: কোনো কোনো আরোহী উদ্ভদের কাক্ষিক মুকুল শাখায় পরিণত না হয়ে প্রচুর খাদ্য সঞ্চয় করে গোলাকার মাংস পিণ্ডের আকার ধারণ করে। এরাই বুলবিল।

পাঠ–৮ : রূপান্তরিত পাতা

বিশেষ কাজ সমাধা করার জন্য পাতার রূপ পরিবর্তিত হয়। এ ধরনের রূপান্তরিত পাতা সম্পর্কে এবার আমরা জানব।

ক) আকর্ষী : সম্পূর্ণ পাতা, পাতার শীর্ষভাগ অথবা পত্রক অনেক সময় প্যাঁচানো স্প্রিং-এর মতো রূপ ধারণ করে । এগুলো আকর্ষি । এর সাহায্যে গাছ কোনো কিছু আঁকড়ে ধরতে পারে । জংলী মটর গাছে এ ধরনের আকর্ষী দেখা যায় ।

চিত্র-৩.২৫ : পাথরকুচি

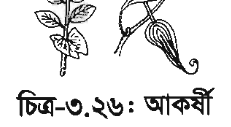
রূপান্তরিত পত্রক
রূপান্তরিত পত্রশীর্ষ
চিত্র-৩.২৬: আকর্ষী

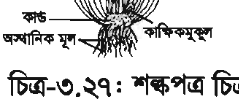
রসাল শল্কপত্র
শীর্ষ মুকুল
কাণ্ড
অস্থানিক মূল
কাক্ষিকমুকুল
চিত্র-৩.২৭: শল্কপত্র

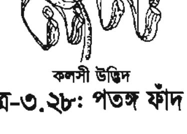

চিত্র-৩.২৮: পতঙ্গ ফাঁদ

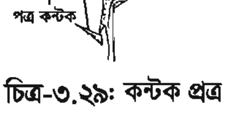

চিত্র-৩.২৯: কন্টক প্রত্র

খ) খাদ্য সঞ্চয় : পেঁয়াজ, রসুন বা ঘৃতকুমারী গাছের পাতা পুরু ও রসালো হয়। এসব পাতায় খাদ্য জমা থাকে।

গ) পতঙ্গ ফাঁদ : কলসি উদ্ভিদ এক ধরনের লতানো গাছ ও ঝাঁঝি নামক জলজ উদ্ভিদের পাতা রূপান্তরিত হয়ে কলসি বা থলের মতো রূপ ধারণ করে। এর মধ্যে পোকামাকড় ঢুকলে কলসির ঢাকনাটি বন্ধ হয়ে যায়, পরে গাছ তার দেহ থেকে রস শুষে নেয়।

ঘ) প্রজনন : কোনো কোনো উদ্ভিদে পাতার কিনারা থেকে কুঁড়ি গজায়। ধীরে ধীরে এসব কুঁড়ি থেকে নিচের দিকে গুচ্ছমূলও গজায়। কোনো এক সময় এরা মুক্ত হয়ে স্বাধীন উদ্ভিদের জন্ম দেয়, যেমন– পাথরকুঁচি।

ঙ) কণ্টক পত্র : পাতা কখনো কাঁটায় রূপান্তরিত হয়, যথা– লেবু।

চ) শল্কপত্র : কখনো ভূ–নিম্নস্থ কাণ্ডের পাতা পাতলা আঁশের মতো আকার ধারণ করে। যেমন– আলু, আদা, হলুদ ইত্যাদি। এগুলোই শল্কপত্র। রসাল শল্কপত্র খাদ্য সঞ্চয় করে এবং কাক্ষিক মুকুলকে রক্ষা করে। যেমন–পিঁয়াজের রসাল শল্কপত্র।

পাঠ–৯ ও ১০

দলগত কাজ :

১। রূপান্তরিত অস্থানিক মূলের গুরুত্ব দলে আলোচনা ও উপস্থাপন।

২। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে রূপান্তরিত কাণ্ডের গুরুত্ব পোস্টার পেপারে উপস্থাপন।

৩। পাতার রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা যুক্তিসহকারে উপস্থাপন।

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- আদা ও আলু রূপান্তরিত কাণ্ড।
- কাণ্ড ও পাতা কণ্টক বা আকর্ষীতে রূপান্তরিত হতে পারে।
- মূল, কাণ্ড ও পাতা খাদ্য সঞ্চয়, জৈবনিক কার্য সম্পন্ন করা, প্রজনন ইত্যাদি কারণে রূপান্তরিত হয়।
- রূপান্তরিত মূল, কাণ্ড ও পাতা মানব জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১। মিষ্টি আলু একটি রূপান্তরিত ---------------।

২। কাঁচা হলুদ একটি রূপান্তরিত---------------।

৩। ফনিমনসা একটি রূপান্তরিত -------------।

৪। মূল থেকে পাতায় পানি পৌঁছানোর কাজ করে---------------------।

৫। পাতার প্রধান কাজ ---------------করা।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১। গোল আলু মূল নয় কেন?

২। ফনিমনসার দেহটি কান্ড না পত্র, ব্যাখ্যা কর।

৩। পাতা কী কী কারণে রূপান্তরিত হয় ?

৪। কান্ডের বিশেষ কাজগুলো উল্লেখ কর।

৫। মূল কী কী কারণে রূপান্তরিত হয়?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন উদ্ভিদের মালাকৃতির মূল থাকে?

ক. ডালিয়া খ. আম আদা গ. মিষ্টি আলু ঘ. করলা

২. রাইজোম কান্ডের বৈশিষ্ট্য হলো–

i. সুস্পষ্ট পর্ব ও পর্ব মধ্য থাকে ii. পর্ব ও পর্ব মধ্যগুলো সংকুচিত iii. মাটির নিচে সমান্তরাল ভাবে থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

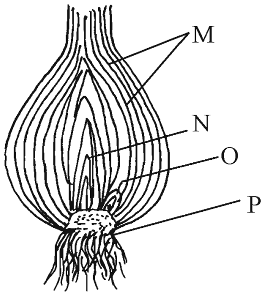

৩. M চিহ্নিত অংশটির কাজ হচ্ছে–

i. খাদ্য জমা রাখা ii. কাক্ষিক মুকুলকে রক্ষা করা iii. প্রজননে সাহায্য করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. উদ্দীপকের কোন অংশগুলো থেকে নতুন চারা সৃষ্টি হয়?

ক. M ও N খ. N ও O গ. O ও P ঘ. M ও P

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

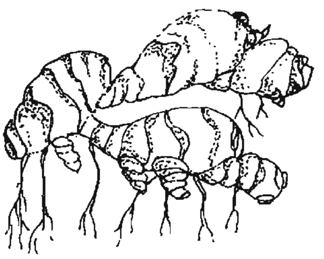

X

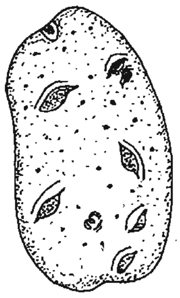

Y

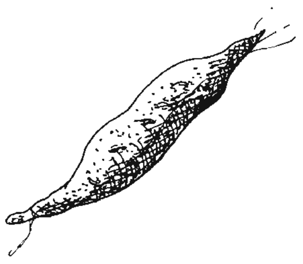

Z

ক. বুলবিল কী?

খ. পাথরকুঁচি পাতার মাধ্যমে কীভাবে প্রজনন ঘটে?

গ. চিত্র X এর ব্যবহারিক দিক ব্যাখ্যা কর।

ঘ. Y ও Z এর বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক আলোচনা কর।

২.

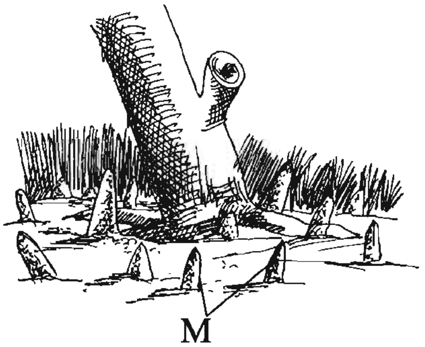

M

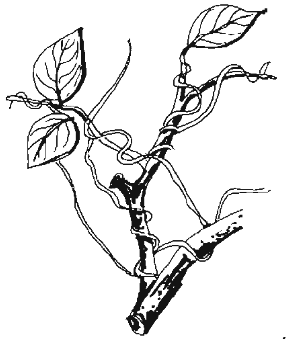

R

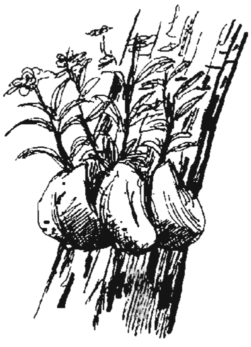

N

ক. অফসেট কী?

খ. কলসি উদ্ভিদকে পতঙ্গ ফাঁদ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. ১ম চিত্রে M চিহ্নিত অংশের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. R ও N উদ্ভিদ দুইটির তুলনামূলক আলোচনা কর।

নিজেরা কর

১। মরিচ গাছ, ঘাস, এক খণ্ড আদা, এক খণ্ড কাঁচা হলুদ, আমরুল শাক, কচুর লতি, ফণীমনসা ও বেলকাঁটা সংগ্রহ কর। এদের কাণ্ড কোন প্রকৃতির তা খাতায় নোট কর এবং তোমার কথার স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্বসন

প্রতিটি উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন আছে। জীবদেহে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের জৈবনিক প্রক্রিয়ার জন্য শক্তি প্রয়োজন। জীব কোষের সাইটোপ্লাজমে সঞ্চিত স্টার্চ, শর্করা, প্রোটিন ও ফ্যাটের অণুতে শক্তি সঞ্চিত থাকে। সকল জীবকোষের জৈব ক্রিয়ার জন্য অক্সিজেন অপরিহার্য। প্রকৃতপক্ষে অক্সিজেন দ্বারা খাদ্যস্থ স্থৈতিক শক্তি যা সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৌরশক্তি থেকে সঞ্চিত হয়, তাকে গতিশক্তি ও তাপশক্তিতে রূপান্তরিত করাই শ্বসনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই গতিশক্তি ও তাপশক্তির দ্বারা জীব খাদ্য গ্রহণ, চলন, রেচন, বৃদ্ধি, জনন প্রভৃতি শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পন্ন করে থাকে। শ্বসন এক প্রকার দহন প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন দ্বারা খাদ্য জারিত হয়ে শক্তি নির্গত হয়।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- জীবের শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- চিত্রের সাহায্যে প্রাণীর শ্বসনতন্ত্রের প্রধান অংশসমূহের কাজ বর্ণনা করতে পারব।
- শ্বসনতন্ত্রের রোগের কারণ ও রোগের লক্ষণ বর্ণনা করতে পারব।
- শ্বসনতন্ত্রের রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকারের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সালোকসংশ্লেষণ এবং শ্বসন প্রক্রিয়ার তুলনা করতে পারব।
- প্রাণীর শ্বসনতন্ত্রের প্রধান অংশসমূহের চিত্র অঙ্কন করতে পারব।

পাঠ–১ : শ্বসন পদ্ধতি

জীবদেহে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পন্ন করার জন্য শক্তির প্রয়োজন। শ্বসন দ্বারা এশক্তি উৎপন্ন হয়। শ্বসনের সময় জীবদেহে কোষস্থিত খাদ্যকে দহন করার জন্য অক্সিজেন ব্যবহৃত হয়। এর ফলে উৎপন্ন হয় শক্তি এবং কার্বন ডাই–অক্সাইড। সুতরাং যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জীবকোষস্থ খাদ্যবস্তু অক্সিজেনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে জারিত হয়ে খাদ্যস্থ রাসায়নিক শক্তিকে গতিশক্তি ও তাপশক্তিতে রূপান্তরিত ও মুক্ত করে এবং ফলশ্রুতিতে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি উৎপন্ন হয় তাকে শ্বসন বলে।

শ্বসন একটি বিপাকীয় ক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া চলাকালে প্রতিটি জীব পরিবেশ থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে। নিম্নশ্রেণির কিছু উদ্ভিদ ও প্রাণী অক্সিজেন ছাড়া শ্বসনক্রিয়া সম্পন্ন করে।

তবে সকল ক্ষেত্রে কার্বন ডাই–অক্সাইড উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রতিটি সজীব কোষে দিন রাত্রি সব সময় শ্বসন কার্য ঘটে।

পাঠ–২ : জীবজগতে শ্বসন

শ্বসন একটি অন্তঃকোষীয় বিপাক প্রক্রিয়া এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের বিভিন্ন সজীব কোষে শ্বসন প্রক্রিয়াটি মুলত একই। কিন্তু বিভিন্ন জীবের অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমন পদ্ধতিটি ভিন্নরূপ। উদ্ভিদ দেহে শ্বসন কালে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিনিময় অপেক্ষাকৃত সরল। উদ্ভিদের কোনো নির্দিষ্ট শ্বসন অঙ্গ নাই। পাতার পত্ররন্ধ্র, কাণ্ডের লেন্টিসেল এবং অন্তঃকোষের মাধ্যমে বায়ু দেহঅভ্যন্তরে প্রবেশ করে। পানিতে নিমজ্জিত উদ্ভিদগুলো সমগ্র দেহতলের সাহায্যে অক্সিজেন শোষণ করে। প্রাণিদেহেও শ্বসন বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে নানাভাবে সম্পন্ন হয়। নিম্নশ্রেণির প্রাণীতে প্রধানত ত্বক ও ট্রাকিয়ার মাধ্যমে শ্বসন হয়। উন্নত প্রাণীদের শ্বসনে গ্যাসীয় বিনিময়ের জন্য বিশেষ ধরনের শ্বসন অঙ্গ আছে। যেমন– মাছ ও ব্যাঙাচি ফুলকার সাহায্যে এবং স্থলজ মেরুদন্ডীরা ফুসফুসের সাহায্যে শ্বসন সম্পন্ন করে।

শ্বসনকালে শক্তি উৎপন্ন হওয়ার প্রমাণ

শ্বসনে যে শক্তি (তাপ) উৎপন্ন হয় তা নিম্নে বর্ণিত পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করা যায়।

উপকরণ : দুটি থার্মোফ্লাক্স, দুটি থার্মোমিটার, অঙ্কুরিত ছোলা বীজ, পানিতে সিদ্ধ ছোলা বীজ ও ছিদ্রযুক্ত রাবারের ছিপি।

পরীক্ষা : অঙ্কুরিত ছোলা বীজগুলোকে একটি থার্মোফ্লাক্সের মধ্যে রেখে একটি ছিদ্রযুক্ত ছিপি দিয়ে মুখটি বন্ধ করতে হবে। এরপর ছিপির ছিদ্রের মধ্য দিয়ে একটি থার্মোমিটার এমন ভাবে প্রবেশ করাতে হবে, যাতে থার্মোমিটারের পারদপূর্ণ প্রান্তটি অঙ্কুরিত ছোলা বীজগুলোর মধ্যে প্রোথিত থাকে। অনুরূপভাবে অপর থার্মোফ্লাক্সটিতে সিদ্ধ ছোলা বীজগুলো রাখতে হবে এবং অপর থার্মোমিটারটি স্থাপন করতে হবে। প্রতিটি থার্মোমিটারের পারদ রেখার অবস্থান চিহ্নিত করে রাখতে হবে।

পর্যবেক্ষণ : কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে জীবন্ত অঙ্কুরিত ছোলা বীজযুক্ত থার্মোফ্লাক্সের উষ্ণতার বৃদ্ধি ঘটায় থার্মোমিটারের পারদ রেখার পরিবর্তন ঘটেছে। সিদ্ধ বীজযুক্ত থার্মোফ্লাক্সের উষ্ণতার বৃদ্ধি হয়নি অর্থাৎ থার্মোমিটারের পারদ রেখা অপরিবর্তিত আছে।

- জীবন্ত ছোলা বীজযুক্ত থার্মোফ্লাক্সের থার্মোমিটারের পারদ রেখার কেন পরিবর্তন ঘটল?
- এতে কী প্রমাণিত হলো?

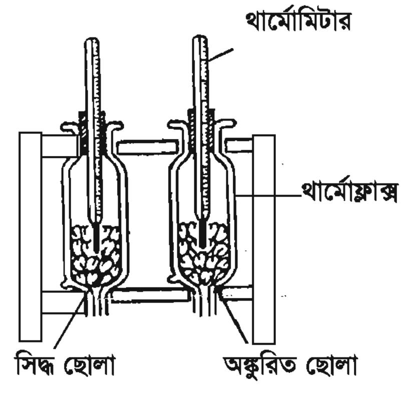

চিত্র-৪.১ : ছোলাবীজে শ্বসনের পরীক্ষ

পাঠ–৩ : প্রাণীর শ্বসন

আমরা নাক দিয়ে শ্বাস–প্রশ্বাস গ্রহণ করি। শ্বাস–প্রশ্বাসের সময় আমরা কী গ্যাস গ্রহণ ও ত্যাগ করি? প্রাণী ও উদ্ভিদ বায়ু থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে। তাদের এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে সারাজীবন। তবে প্রাণী ও উদ্ভিদের বেলায় গ্যাস গ্রহণ ও বর্জন করার প্রক্রিয়া ভিন্ন প্রকৃতির। উদ্ভিদ পাতায় অবস্থিত স্টোমাটা নামক এক প্রকার ছিদ্রের মাধ্যমে অক্সিজেন গ্রহণ করে। নিম্ন ও উচ্চশ্রেণির প্রাণীর দেহে গ্যাসের আদান প্রদান ঘটে বিভিন্ন প্রকার অঙ্গের মাধ্যমে। যেমন– ফুলকা, ফুসফুস। যে অঙ্গগুলো শ্বসনকার্য চালানোর কাজে অংশ নেয় তাদের একত্রে শ্বসনতন্ত্র বলে। মানব শ্বসনতন্ত্র নিম্নলিখিত অঙ্গগুলো নিয়ে গঠিত।

১. নাসারন্ধ্র ও নাসাপথ
২. নাসা গলবিল
৩. স্বরযন্ত্র
৪. শ্বাসনালি বা ট্রাকিয়া
৫. ক্লোম শাখা বা ব্রংকাস
৬. ফুসফুস
৭. মধ্যচ্ছদা

১. নাসারন্ধ্র ও নাসাপথ: নাসিকা মুখগহ্বরের উপরে অবস্থিত একটি ত্রিকোণাকার গহ্বর। এটি সামনে নাসিকা ছিদ্র হতে পশ্চাতে গলবিল পর্যন্ত বিস্তৃত। একটি পাতলা পর্দা দিয়ে এটি দুইভাগে বিভক্ত হয়েছে। এর সম্মুখভাগ লোম ও পশ্চাৎ দিক ঝিল্লি দ্বারা আবৃত থাকে। আমরা নাক দিয়ে যে বায়ু গ্রহণ করি তাকে প্রশ্বাস বলে। প্রশ্বাস বায়ুতে ধুলিকণা, রোগজীবাণু থাকলে তা এই লোম ও ঝিল্লিতে আটকে যায়।

২. নাসা গলবিল : নাসা গলবিল হলো নাসাপথের শেষ অংশ যা গলবিলের সাথে মিশেছে। গলবিল পথে শ্বাসনালিতে বাতাস প্রবেশ করে।

৩. স্বরযন্ত্র : গলবিল ও শ্বাসনালির সংযোগস্থলে স্বরযন্ত্র অবস্থিত। স্বরযন্ত্রে স্বর সৃষ্টিকারী স্বররজ্জু বা ভোকাল কর্ড থাকে। তাই একে স্বরযন্ত্র বলে। স্বরছিদ্রের মুখে একটা ঢাকনা থাকে। এটি খাদ্য গ্রহণের সময় স্বরযন্ত্রকে ঢেকে রাখে, যাতে এতে খাদ্য ঢুকতে না পারে আবার শ্বাস গ্রহণের সময় খুলে যায়।

৪. শ্বাসনালি: খাদ্যনালির সম্মুখে অবস্থিত স্বরযন্ত্র থেকে শুরু হয়ে ক্লোম শাখা পর্যন্ত বিস্তৃত নালিকে শ্বাসনালি বলে। শ্বাসনালির মাধ্যমে বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করে।

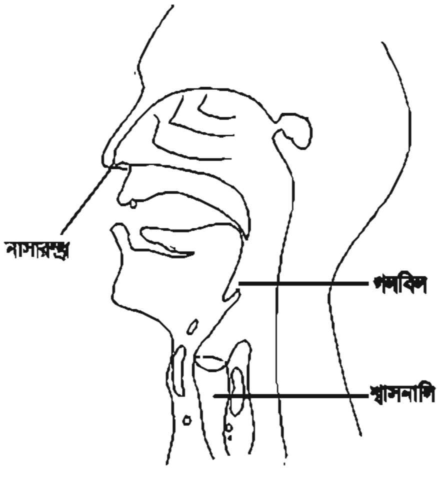

চিত্র-৪.২: নাসারন্ধ্র ও নাসাপথ

৫. ক্লোম শাখা বা ব্রঙ্কাস: শ্বাসনালি ফুসফুসের কাছে এসে ডান ও বাম দুইটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যথাক্রমে ডান ও বাম ফুসফুসে প্রবেশ করে। এদেরকে ডান ও বাম ক্লোম শাখা বা ব্রঙ্কাই (এক বচনে ব্রঙ্কাস) বলে। ফুসফুসে প্রবেশ করার পর এই শাখাদ্বয় অসংখ্য শাখা–প্রশাখায় বিভক্ত হয়। এদেরকে ব্রংকিওল বলে। ব্রঙ্কাইয়ের গঠন শ্বাসনালির মতো।

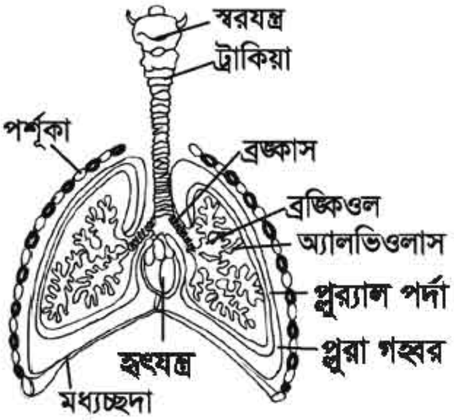

চিত্র-৪.৩: মানব শ্বসনতন্ত্র

৬. ফুসফুস : বক্ষগহ্বরের ভিতর দুইটি ফুসফুস হৃৎপিণ্ডের দুই পাশে অবস্থিত। এটা স্পঞ্জের মতো নরম ও কোমল। ডান পাশের ফুসফুসটি বাম পাশের ফুসফুসের চেয়ে সামান্য বড়। ফুসফুস দুই ভাজবিশিষ্ট প্লুরা নামক একটি ঝিল্লি বা পর্দা দ্বারা আবৃত। দুই ভাঁজের মধ্যে এক প্রকার পিচ্ছিল পদার্থ থাকে। ফলে শ্বাস–প্রশ্বাস কাজে, ফুসফুস ও বক্ষগাত্রের সাথে কোনো ঘর্ষণ লাগে না। ব্রঙ্কাস প্রতিপাশে ফুসফুসে প্রবেশ করে অসংখ্য শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়। এই সূক্ষ্ম ব্রংকিওলগুলো বায়ুথলে বা বায়ুকোষে প্রবেশ করে। প্রত্যেকটি বায়ুথলে পাতলা এ্যাপিথেলিয়াল কোষ দ্বারা গঠিত। এ কোষগুলো কৈশিক জালিকা দ্বারা পরিবেষ্টিত। কোষগুলোতে বায়ু প্রবেশ করলে এগুলো বেলুনের মতো ফুলে উঠে ও পরে আপনা আপনি কুঞ্চিত হয়ে যায়। বায়ুথলে ও কৈশিক জালিকা উভয়ের প্রাচীর এত পাতলা যে, সহজেই এগুলোর মধ্য দিয়ে বায়ু আদান–প্রদান করতে পারে।

৭. মধ্যচ্ছদা : যে মাংসপেশি বক্ষগহ্বর ও উদরগহ্বরকে পৃথক করে রেখেছে তাকে মধ্যচ্ছদা বলে। এটা দেখতে অনেকটা প্রসারিত ছাতার মতো। মধ্যচ্ছদা সংকুচিত হলে নিচের দিকে নামে। তখন বক্ষগহ্বরের আয়তন বাড়ে। আবার এটা যখন প্রসারিত হয় তখন উপরের দিকে উঠে এবং বক্ষগহ্বর সংকুচিত হয়। মধ্যচ্ছদা সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।

নিজেরা কর : চার্ট দেখে শ্বসনতন্ত্রের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর এবং ফুসফুসের কাজ বর্ণনা কর।

নতুন শব্দ: শ্বাসনালি, বায়ুথলি, স্বরযন্ত্র, ব্রংকিওল, ব্রঙ্কাস, ক্লোম শাখা ও অনুক্লোম শাখা।

পাঠ ৪–৬ : শ্বসন পদ্ধতি

আমরা নাক দিয়ে বাতাস নিই আবার ছেড়ে দিই। একেই আমরা সাধারণত শ্বসন বলে থাকি। আমাদের এ ধারণা ভুল। আমাদের বুক হাপরের মতো অবিরত সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। এতে ফুসফুসের আয়তন বাড়ে ও কমে। ফুসফুস অবিরত সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিত্যাগ করে। এভাবে অবিরত অক্সিজেন নেওয়া ও কার্বন ডাই–অক্সাইড পরিত্যাগ করাই শ্বাস ক্রিয়া

নামে পরিচিত। এটা শ্বসনের একটি ধাপ। শ্বসন প্রক্রিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা – ১. বহিঃশ্বসন ২. অন্তঃশ্বসন

১. বহিঃশ্বসন : যে প্রক্রিয়ায় ফুসফুসের মধ্যে গ্যাসীয় আদান–প্রদান ঘটে তাকে বহিঃশ্বসন বলে। এ পর্যায়ে ফুসফুস ও রক্ত জালিকা বা কৈশিক নালির মধ্যে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইডের বিনিময় ঘটে। বহিঃশ্বসন দুই পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। যথা–

(i) **প্রশ্বাস বা শ্বাস গ্রহণ :** পরিবেশ থেকে আমরা যে অক্সিজেনযুক্ত বায়ু গ্রহণ করি একে শ্বাস গ্রহণ বা প্রশ্বাস বলে। প্রশ্বাসের সময় মধ্যচ্ছদা ও বক্ষপিঞ্জরাস্থির মাঝের পেশি সংকুচিত হয়।

(ii) **নিঃশ্বাস:** প্রশ্বাসের পর পরই নিঃশ্বাস পর্যায় শুরু হয়। এ পর্যায়ে মধ্যচ্ছদা ও পিঞ্জরাস্থির পেশিগুলো শীথিল ও প্রসারিত হয় এবং ফুসফুস আয়তনে ছোট ও সংকুচিত হয়। ফলে বায়ুথলির ভিতরের বায়ু, কার্বন ডাই–অক্সাইড গ্যাস ফুসফুস থেকে ব্রঙ্কাস ও ট্রাকিয়ার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে নাসারন্ধ্র দিয়ে বাইরে নির্গত হয়।

নিজেরা কর

তুমি তোমার সহপাঠীর নিঃশ্বাস ত্যাগ ও প্রশ্বাস নেওয়া লক্ষ কর। মধ্যচ্ছদা চেপে রেখে এ কাজটি করার চেষ্টা কর। কী ঘটে? কেন ঘটে? তা ব্যাখ্যা কর।

২. অন্তঃশ্বসন: অন্তঃশ্বসন প্রক্রিয়ায় দেহকোষস্থ খাদ্য অক্সিজেনের সাহায্যে জারিত হয়ে গতিশক্তি ও তাপশক্তিতে পরিণত হয়। ফুসফুসের রক্তে যে অক্সিজেন প্রবেশ করে তা রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়ে দেহের দূরবর্তী কৈশিকনালিতে পৌছায়। কৈশিকনালির গাত্র ভেদ করে আন্তঃকোষস্থ রস হয়ে কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তারপর এটি কোষের ভিতরের খাদ্যের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে শক্তি উৎপন্ন করে। এর ফলে তাপশক্তি ও কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয়। এই কার্বন ডাইঅক্সাইড আবার রক্ত দ্বারা বাহিত হয়ে ফুসফুসে ফেরত আসে।

নতুন শব্দ: বহিঃশ্বসন, অন্তঃশ্বসন, প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস

শ্বসনতন্ত্রের প্রবাহ চিত্র নিম্নে দেখানো হলো:

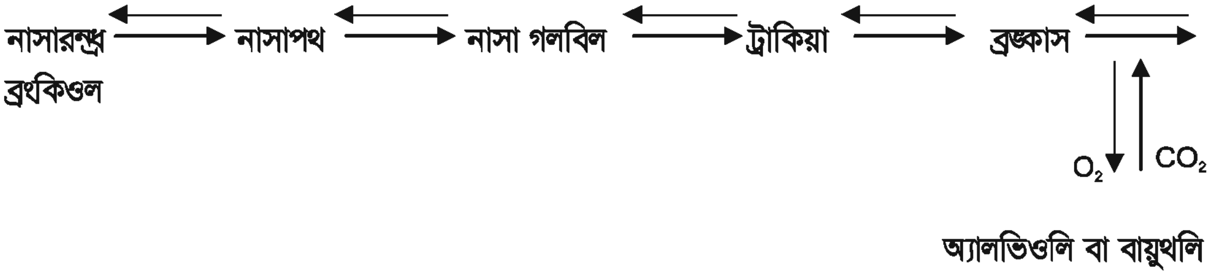

নিজেরা কর

বেশ কয়েকবার উঠাবসা কর অথবা দৌড়াও। তারপর ঘড়ি ধরে শ্বাস–প্রশ্বাস গণনা কর। দেখবে বিশ্রামরত অবস্থায় শ্বাস–প্রশ্বাস যত ছিল, পরিশ্রমের ফলে তা বৃদ্ধি পেয়েছে। তোমার ছোট ভাই বোনদের প্রত্যেকের প্রতি মিনিটে নিঃশ্বাস–প্রশ্বাসের হার গণনা কর।

পাঠ–৭ : শ্বসনতন্ত্রের সাধারণ রোগ

হাকিম সাহেব যক্ষ্মায় ভুগছেন। প্রফুল্ল বাবুর এ্যাজমা বা হাঁপানি। ছোট্ট শিশু বিকাশের নিউমোনিয়া হয়েছে। এ রোগগুলোর কারণ কী? কী ধরনের সাবধানতা গ্রহণ করলে তাদের এ রোগগুলো হতো না? এ রোগগুলোর প্রতিকার কী? এ রোগগুলোর কারণ, লক্ষণ, প্রতিকার ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা জেনে নিলে রোগের আক্রমণ থেকে অনেকাংশে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব।

যক্ষ্মা:

যক্ষ্মা একটি অতি পরিচিত সংক্রামক রোগ। এ রোগ সহজে সংক্রমিত হয়। যারা অধিক পরিশ্রম করে, দুর্বল, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করে এবং অপুষ্টিতে ভোগে বা যক্ষ্মা রোগীর সাথে বাস করে তারা এ রোগের শিকার হয়ে থাকে।

কারণ: এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এই রোগ হয়।

লক্ষণ:

- দেহের ওজন কমতে থাকে ও শরীর দুর্বল হতে থাকে।
- খুসখুসে কাশি হয়, কখনো কখনো কাশির সাথে রক্ত পড়তে পারে।
- বিকালের দিকে অল্প জ্বর হয়, রাত্রে শরীরে ঘাম হয়।
- বুক বা পিঠে ব্যথা হয়, মাঝে মাঝে পেটে অসুখ দেখা দেয়।

প্রতিকার:

- রোগীকে পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে।
- ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। এ চিকিৎসা দীর্ঘমেয়াদী, সম্পূর্ণ ভালো না হওয়া পর্যন্ত চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনো অবস্থাতেই চিকিৎসা বন্ধ করা যাবে না।

প্রতিরোধ:

- যক্ষ্মা প্রতিষেধক টিকা হলো বি.সি.জি.। জন্মের পর থেকে এক বছরের মধ্যে শিশুকে এই টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। জন্মের পরপরই যত দ্রুত সম্ভব শিশুকে এ টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত।

- যক্ষ্মা রোগীকে পৃথক রাখতে হবে। সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা হলো হাসপাতালে পাঠানো। এতে সুচিকিৎসা নিশ্চিত হয়।
- রোগীর কফ–থুতু মাটিতে পুঁতে ফেলা দরকার। কারণ এসবে অসংখ্য জীবাণু থাকে।
- হাঁচি–কাশির সময় মুখ রুমাল দিয়ে ঢেকে নিতে হবে।
- যক্ষ্মা রোগীর কাছে শিশুদেরকে যেতে দেওয়া উচিত নয়।

নিউমোনিয়া

নিউমোনিয়া একটি ফুসফুসের রোগ। অত্যধিক ঠান্ডা লাগলে নিউমোনিয়া রোগ হতে পারে। হাম, ব্রংকাইটিস ইত্যাদি রোগের পরে ঠান্ডা লেগে নিউমোনিয়া রোগ হতে পারে। শিশুদের জন্য এটি একটি মারাত্মক রোগ।

কারণ : এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ রোগ হয়।

লক্ষণ : কাশি ও শ্বাস কষ্ট হয়। শ্বাস নেওয়ার সময় নাকের ছিদ্র বড় হয়। বেশি জ্বর হয়। কাশির সময় রোগী বুকে ব্যথা অনুভব করে।

প্রতিকার: অতিদ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী রোগীর ঔষধ ও পথ্য খাওয়া দরকার। বেশি করে পানি ও তরল পদার্থ (স্যুপ, ফলের রস) পান করতে হবে। রোগীকে পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে হবে।

প্রতিরোধ: শিশুদের হাম বা ব্রংকাইটিস হলে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

ব্রংকাইটিস

শ্বাসনালির সংক্রমণকে ব্রংকাইটিস বলে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, ধুলাবালি মিশ্রিত আবহাওয়া, ঠান্ডা লাগা এবং ধুমপান থেকে এ রোগ হতে পারে।

কারণ : এক ধরনের ভাইরাস থেকে এ রোগ হয়।

লক্ষণ: কাশি ও শ্বাস কষ্ট হয়। কাশির সাথে কফ থাকে। জ্বর হয়, রোগী ক্রমান্বয়ে দুর্বল হতে থাকে।

প্রতিকার: ধূমপান বন্ধ করা। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

হাঁপানি বা এ্যাজমা:

হাঁপানি ছোঁয়াচে বা জীবাণুবাহিত রোগ নয়।

কারণ: বিশেষ কোনো খাবার, বাতাসে উপস্থিত ধুলাবালি অথবা ফুলের রেণু প্রশ্বাসের সাথে ফুসফুসে প্রবেশ করলে হাঁপানি হতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে সাধারণ সর্দি থেকে হাঁপানি হতে পারে।

ব্যতিক্রম: বছরের বিশেষ ঋতুতে বা ঋতু পরিবর্তনের সময় এ রোগ বেড়ে যায়।

লক্ষণ: হঠাৎ শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়। শ্বাসকষ্টে দম বন্ধ হওয়ার মতো হয়। রোগী জোরে জোরে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করে। ফুসফুসের বায়ুথলিতে ঠিকমত অক্সিজেন সরবরাহ হয় না বা বাঁধাগ্রস্থ হয়। ফলে

রোগীর কষ্ট হয়। শ্বাস নেওয়ার সময় রোগীর পাঁজরের মাঝের চামড়া ভিতরের দিকে ঢুকে যায়। কাশির সাথে কখনো কখনো সাদা কফ বের হয়। জ্বর থাকে না। রোগী কোনো শক্ত খাবার খেতে পারে না। কখনো কখনো বমি হয়। রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে।

প্রতিকার: আলো–বাতাসপূর্ণ গৃহে বসবাস করা। যে সকল জিনিসের সংস্পর্শে আসলে বা খেলে হাঁপানি বাড়ে, তা থেকে বিরত থাকা। যেমন– পশমি কাপড়। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চলা। ধোঁয়া, ধুলাবালি ইত্যাদি থেকে দূরে থাকা। ধূমপান পরিহার করা।

ঔষধ সেবনে শ্বাসকষ্টের কিছুটা লাঘব হয় বটে, কিন্তু রোগ পুরোপুরি ভালো হয় না। তাই শ্বাসকষ্ট লাঘবে রোগীর সাথে সব সময় ঔষধ রাখা অত্যন্ত জরুরি।

পাঠ–৮

তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে সালোকসংশ্লেষণ সম্পর্কে জেনেছ। তোমরা পূর্বজ্ঞান কাজে লাগিয়ে নিম্নের কাজটি কর।

কাজ : দলগত কাজের মাধ্যমে সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসনের পার্থক্য লিখে একটি পোস্টার কাগজে উপস্থাপন কর।

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

শক্তির জন্য প্রতিটি জীবের শ্বসন অপরিহার্য।

পত্ররন্ধ্র ও রক্ষীকোষ : পত্ররন্ধ্রের রক্ষীকোষগুলো পত্ররন্ধ্রকে খোলা বা বন্ধ রাখতে সাহায্য করে। রক্ষীকোষে ক্লোরোফিল থাকে। তাই দিনের বেলায় রক্ষীকোষে সালোকসংশ্লেষণ ঘটে এবং এর ফলেই পত্ররন্ধ্র খুলে যায়। প্রতিটি জীবে শ্বসন অপরিহার্য।

বহিঃশ্বসন : ফুসফুসের বায়ুথলে থেকে অক্সিজেন কৈশিকনালির রক্তে প্রবেশ করে এবং কার্বন ডাই–অক্সাইড রক্ত থেকে বায়ুথলিতে আসে। ফুসফুসের এই গ্যাসীয় আদান–প্রদানকে বহিঃশ্বসন বলে। প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস এই দুই প্রক্রিয়া বহিঃশ্বসনের অন্তর্গত।

অন্তঃশ্বসন : কোষের মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরে কতগুলো এনজাইমের নিয়ন্ত্রণাধীনে খাদ্যের সাথে অক্সিজেনের বিক্রিয়া ঘটে। এভাবে অন্তঃশ্বসন ক্রিয়া ঘটে।

লসিকা : এক রকম স্বচ্ছ, ঈষৎ মৃদু ক্ষারীয় পদার্থ। এটা এক ধরনের রূপান্তরিত কলারস।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. ———— খাদ্য তৈরি হয় কিন্তু ———— খাদ্য জারিত হয়।

২. জীবকোষের ———— নামক সাইটোপ্লাজমিয় অঙ্গাণুকে কোষের শক্তিঘর বলে।

৩. ফুসফুস অসংখ্য ———— দ্বারা গঠিত।

৪. ———— একটি ছোঁয়াচে রোগ।

৫. শ্বসন একটি ———— প্রক্রিয়া।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. অন্তঃশ্বসন কাকে বলে?

২. নিউমোনিয়া রোগের কারণ ও লক্ষণ কী?

৩. শ্বসনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর।

৪. বায়ুথলির কাজ উল্লেখ কর।

৫. উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে শ্বসন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি উদ্ভিদের শ্বসন অঙ্গের নয়?

ক. ত্বক
খ. লেন্টিসেল
গ. রক্ষীকোষ
ঘ. পত্ররন্ধ্র

২. নিম্নশ্রেণির প্রাণীরা শ্বাসকার্য চালায়–

i. ফুলকা ও ত্বকের সাহায্যে
ii. ত্বক ও ট্রাকিয়ার মাধ্যমে
iii. ফুসফুস ও ফুলকার সাহায্যে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. i ও ii
ঘ. i ও iii

উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ৩, ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

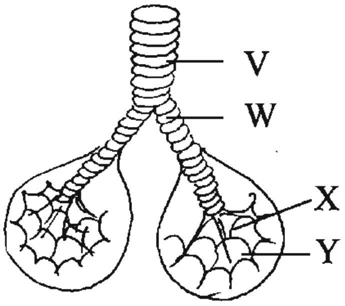

৩. W চিহ্নিত অংশটির নাম কী?

ক. অ্যালভিওলাস খ. ব্রঙ্কাস গ. ব্রঙ্কিওল ঘ. ট্রাকিয়া

৪. উদ্দীপকের কোন অংশটিতে O_2 ও CO_2 এর বিনিময় ঘটে?

ক. V খ. W গ. X ঘ. Y

৫. V এর সংক্রমণে কোন রোগ হয়?

ক. এ্যাজমা খ. ব্রংকাইটিস গ. নিউমোনিয়া ঘ. যক্ষ্মা

সৃজনশীল প্রশ্ন

১।

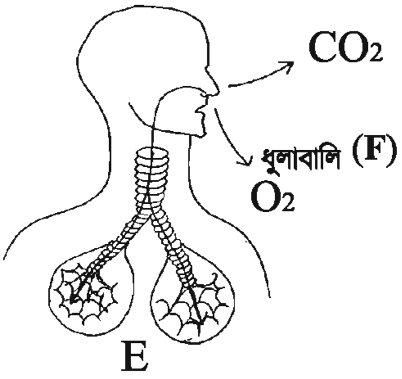

ক. প্লুরা কী?
খ. নিউমোনিয়া একটি মারাত্মক রোগ– ব্যাখ্যা কর।
গ. চিত্রে সংঘটিত প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর।
ঘ. F উপাদানটি E অংশে প্রবেশের ফলে সৃষ্ট সমস্যা প্রতিরোধের উপায়গুলো বিশ্লেষণ কর।

২।

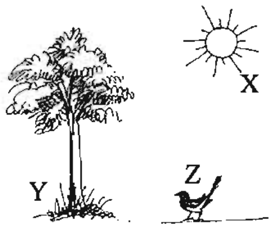

ক. শ্বসন কী?
খ. পত্ররন্ধ্র কীভাবে শ্বসনে সাহায্য করে? ব্যাখ্যা কর।
গ. Y ও Z এর মধ্যে কোনটি X এর উপাদান সরাসরি ব্যবহার করে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. গ্যাসীয় বিনিময়ের ক্ষেত্রে ণ ও ত কীভাবে একে অন্যের উপর নির্ভরশীল যুক্তিসহ লেখ।

নিজেরা কর

শ্বসনতন্ত্রের চিত্র এঁকে চিহ্নিত কর। শ্বসনে ফুসফুসের গুরুত্ব আলোচনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

পরিপাকতন্ত্র এবং রক্ত সংবহনতন্ত্র

আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি তাদের অধিকাংশই জটিল খাদ্য। এই জটিল খাদ্যদ্রব্যকে আমাদের শরীর শোষণ করে সরাসরি কাজে লাগাতে পারে না। শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় জটিল, অদ্রবণীয় খাদ্যবস্তু নির্দিষ্ট এনজাইমের সহায়তায় দেহের গ্রহণ উপযোগী দ্রবণীয় সরল ও তরল খাদ্য উপাদানে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে পরিপাক বলে। যে তন্ত্র পরিপাকে অংশ নেয় তাকে পৌষ্টিকতন্ত্র বা পরিপাক তন্ত্র বলে।

প্রাণিদেহের যাবতীয় জৈবনিক কাজের ক্ষুদ্রতম একক হলো কোষ। বেঁচে থাকার জন্য প্রতিটি কোষের প্রয়োজন অক্সিজেন ও খাদ্য। বিপাকের ফলে কিছু অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর বস্তু তৈরি হয় যেগুলো অপসারণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও তন্ত্রের মধ্যে যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন। রক্ত সংবহনতন্ত্র এই যোগাযোগের কাজটি করে থাকে।

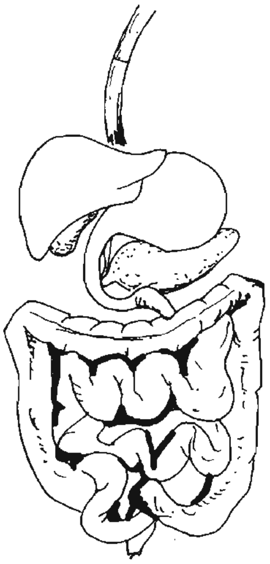

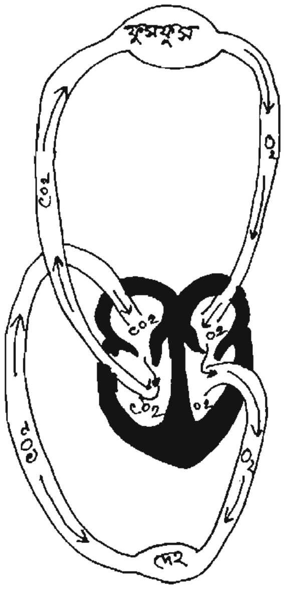

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- প্রবাহ চিত্রের সাহায্যে পরিপাকতন্ত্রের প্রধান অংশের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খাদ্য পরিপাকে এনজাইমের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিপাকতন্ত্রের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিপাকতন্ত্রের রোগের কারণ ও রোগের লক্ষণ বর্ণনা করতে পারব।
- পরিপাকতন্ত্রের রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকারের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।

২০১৬

- পরিপাকতন্ত্রের রোগের বিষয়ে নিজে সচেতন হব এবং পরিবারের সকলকে সচেতন হতে উদ্বুদ্ধ করব।
- পরিপাকতন্ত্রের প্রধান অংশের চিত্র অঙ্কন করতে পারব।
- রক্ত ও রক্তকণিকার কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রক্ত সংবহনতন্ত্র ব্যাখ্যা করতে পারব।
- হৃৎপিন্ডের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- হৃৎপিন্ড সুস্থ রাখার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ : ১ খাদ্য পরিপাক

বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য প্রয়োজন। আমরা কী কী খাদ্য খাই? খাদ্য কেন খাই? নিম্নের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আমরা তা জানার চেষ্টা করি।

ক. আমাদের দেহে খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা কী?

খ. প্রধান তিন শ্রেণির খাদ্যগুলো কী কী?

গ. কীভাবে তিন শ্রেণির খাদ্য আমাদের দেহের চাহিদা মেটায়?

ঘ. ভিটামিন ও খনিজ লবণের প্রয়োজনীয়তা কী?

ঙ. হজম হয় না এমন আঁশযুক্ত খাবারের প্রয়োজনীয়তা কী? কী ধরনের খাবারে এটা পাওয়া যায়?

তোমরা এ প্রশ্নগুলোর উত্তর জেনেছ ষষ্ঠ শ্রেণির বিজ্ঞান বইয়ের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে। এ অধ্যায়ে আমরা দেহে খাদ্যের কী পরিকর্তন ঘটে তা জানব। আমরা মুখ দিয়ে খাবার খাই। খাদ্য গিলে ফেলার পর আমরা খাদ্যকে আর দেখতে পাই না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই খাদ্য পরিপাক হয়ে সরল উপাদানে পরিণত হয়, যা দেহ শোষণ করে নেয়। হজম না হওয়া অপ্রয়োজনীয় বস্তুগুলো দেহ থেকে মলরূপে বের করে দেয়। দেহের ভিতর খাদ্যের যে পরিবর্তন ঘটছে, তার উপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। সুস্থ দেহে এ কাজটি আপনা–আপনি ঘটে। মুখ দিয়ে খাদ্য গ্রহণ এবং খাদ্যের অপ্রয়োজনীয় অংশ উচ্ছিষ্ট হিসেবে পায়ুপথে বের করে দেওয়া এটুকুই আমরা দেখছি। এই দুটি ঘটনার মাঝখানে খাদ্যের কী পরিবর্তন ঘটছে?

যে সকল অঙ্গ খাদ্যের এই পরিবর্তন ঘটাতে অংশ নেয় তাদেরকে একত্রে পৌষ্টিকতন্ত্র বা পরিপাকতন্ত্র বলা হয়। আমরা যে খাবার খাই তার পরিপাক আরম্ভ হয় মুখগহ্বরে। মুখগহ্বরের ভিতর খাদ্যের কী পরিবর্তন ঘটে তা আমরা নিম্নের পরীক্ষণ দ্বারা নিজেরা করে দেখতে পারি।

কাজ: পরীক্ষণটি করার জন্য দুজন ছাত্র/ছাত্রী দরকার। তাদের একজনের মুখে টোস্ট বিস্কুট বা শুকনো রুটি (সেদ্ধ আলু বা ভাত) নিয়ে চিবাতে বলো। চিবানোর পর খাবারটুকু সরাসরি না গিলে কিছুক্ষণ মুখের ভেতর রেখে দেবে। অপর ছাত্রটি তা পর্যবেক্ষণ করবে। পরে দ্বিতীয় ছাত্রটিও নিজে এ কাজটি করবে। এবার প্রথম ছাত্রটি দ্বিতীয় ছাত্রটির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবে। এবার তারা দুজনে মিলে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিবে।

ক. খাবার চিবানোর সময় মুখগহ্বরের কোন কোন অংশ নড়েছিল?

খ. মুখের ভিতর বিস্কুট বা শুকনো রুটির টুকরোর কি কোনো পরিবর্তন ঘটেছিল?

গ. চিবানোর পর খাদ্যটির স্বাদের কোনো পরিবর্তন ঘটেছিল কি?

ঘ. রুটি বা বিস্কুটে কোন ধরনের খাদ্য উপাদান থাকে?

ঙ. খাদ্য গিলবার সময় তোমার দেহের কোন অংশটি নড়েছিল?

চ. খাদ্য গিলবার পর খাদ্য কোথায় যায়? কীভাবে যায়, লক্ষ কর।

নতুন শব্দ: পরিপাক ও খাদ্য উপাদান

পাঠ–২ : লালা ও এনজাইম

তুমি খুব মিষ্টি পছন্দ কর। তোমার সামনে এক থালা রসগোল্লা রাখা হলো। তোমার মুখের ভিতর কোনো পরিবর্তন লক্ষ করছ কি? তোমার মুখের ভিতর কোনো পানির মতো তরল পদার্থের উপস্থিতি অনুভব করছ কি? তোমার ডান হাতটি ভাল করে সাবান দিয়ে ধুয়ে নাও। পরিষ্কার আঙ্গুল দিয়ে জিহ্বা থেকে কিছুটা তরল পদার্থ নাও। এর বর্ণ কেমন?

উপরের পরীক্ষা থেকে যা জানলাম তা নিন্মের বর্ণনার সাথে মিলিয়ে নেই। আমরা মুখ দিয়ে খাবার খাই। খাবার মুখে নিয়ে আমরা তা দাঁত দিয়ে চিবুতে থাকি। জিহ্বা খাবারগুলোকে নেড়েচেড়ে দেয় যেন এগুলো ভাল করে চিবানো যায়। মুখের মধ্যে ঐ খাবারগুলো লালার সাথে মিশ্রিত হয়। লালা একপ্রকার বর্ণহীন তরল পদার্থ। মুখের পেছনে অবস্থিত লালাগ্রন্থি থেকে লালা নিঃসৃত হয়। খাদ্য পরিপাকে লালার বিশেষ ভূমিকা আছে। লালা খাদ্যবস্তুকে পিচ্ছিল করে ও গিলতে সাহায্য করে। লালায় এক ধরনের অনুঘটক বা এনজাইম থাকে। তোমরা হয়তো ভাবছো এনজাইম কী? এনজাইম হলো :

- এমন একটি বস্তু, যা খাদ্যবস্তুর সাথে মিশে রাসায়নিক ক্রিয়ায় সাহায্য করে, কিন্তুনিজে অংশ নেয় না ও অপরিবর্তীত থাকে।
- নির্দিষ্ট তাপমাত্রা পর্যন্ত এনজাইম ভাল কাজ করে।
- নির্দিষ্ট এনজাইম নির্দিষ্ট কাজ করে। যেমন– ট্রিপসিন এনজাইম শুধুমাত্র আমিষের উপর ক্রিয়া করে।

লালার এনজাইম শ্বেতসারকে পরিবর্তন করে শর্করায় (মলটোজ) পরিণত করে। এ কারণে শর্করা জাতীয় খাবার চিবানোর পর কিছুক্ষণ মুখে রাখলে মিষ্টি লাগে। জিহ্বা আমাদের খাদ্যবস্তু গিলতে সাহায্য করে। মুখের শেষ প্রান্ত থেকে দুইটি নল আমাদের দেহের ভিতরের দিকে নেমে গেছে। এই নলের মতো অংশটিকে অন্ননালি বলে। এই নালি দিয়ে খাদ্য ও পানীয় পাকস্থলিতে পৌছায়।

খাদ্য কীভাবে পাকস্থলিতে পৌছায়:

নিজেরা কর :

একটি মার্বেল নাও। খেয়াল রাখতে হবে, নলের পরিধির চেয়ে মার্বেলটি যেন বড় হয়। মার্বেলটিকে নলের ভিতর প্রবেশ করাও। এবার মার্বেলের পেছনদিক ঠেলতে থাক। ওটা নলের ভিতর দিয়ে সামনের দিকে এগোতে থাকবে। এভাবে খাদ্য অন্ননালির ভিতর দিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হয়। অন্ননালিতে আংটির মতো গোল পেশি রয়েছে। এই পেশিগুলো সংকোচন ও প্রসারণ করতে পারে। খাদ্যবস্তুর পেছনে অন্ননালির পেশি সংকুচিত হয় এবং সামনে অন্ননালির পেশি প্রসারিত হয়। অন্ননালির এরূপ সংকোচন ও প্রসারণকে ক্রমসংকোচন বলে। এভাবে সংকোচন ও প্রসারণের ফলে খাদ্যবস্তু ধীরে ধীরে পাকস্থলিতে পৌঁছায়।

নতুন শব্দ: সংকোচন, অন্ননালি ও এনজাইম।

পাঠ ৩ – ৫ : পরিপাকতন্ত্র

আমরা আগেই জেনেছি জীবন ধারণের জন্য চাই খাদ্য। আমরা জটিল খাদ্য খেয়ে থাকি। আমরা এও জেনেছি, জটিল খাদ্য দেহকোষ সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না। সেজন্য জটিল খাদ্যকে রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে সরল ও পানিতে দ্রবীভূত করা প্রয়োজন। এ কাজকে খাদ্যের হজমক্রিয়া বা পরিপাক বলে। হজম কাজ সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন অঙ্গ নিয়ে গঠিত হয় পৌষ্টিকনালি বা পরিপাকনালি এর সাথে রয়েছে কতগুলো জারক রস ও সাহায্যকারী এনজাইম নিঃসরণকারী গ্রন্থি।

মুখছিদ্র, মুখগহবর, অন্ননালি, পাকস্থলি, ক্ষুদ্রান্ত্র এবং বৃহদন্ত্র নিয়ে পৌষ্টিকনালি গঠিত। এছাড়া পৌষ্টিকনালির সাথে রয়েছে বিভিন্ন এনজাইম বা জারক রস নিঃসরণকারী তিনটি গ্রন্থি যথা: লালাগ্রন্থি, অগ্ন্যাশয় এবং যকৃৎ। এছাড়া পাকস্থলি ও ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীরেও আছে আরও এনজাইম ও জারক রস নিঃসরণকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি।

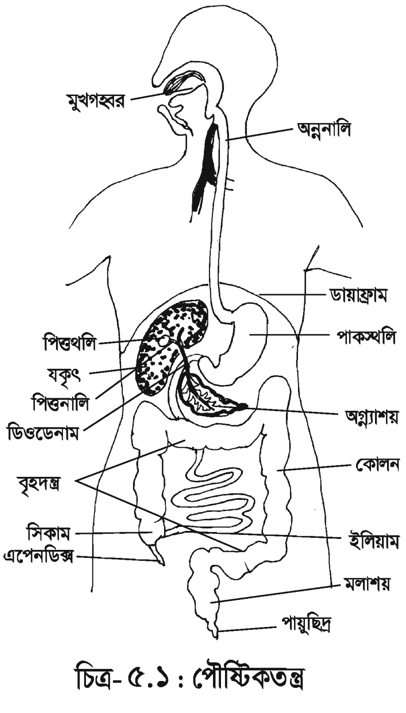

চিত্র-৫.১ : পৌষ্টিকতন্ত্র

আমাদের পরিপাকনালি বা পৌষ্টিকনালি মুখগহ্বর থেকে শুরু থেকে মলদ্বার পর্যন্ত বিস্তৃত। নিম্নে এ তন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গাগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো:

১. মুখছিদ্র : মুখছিদ্র থেকেই পরিপাকনালি শুরু। মুখছিদ্রের উপরে রয়েছে উপরের ঠোঁট এবং নিচে রয়েছে নিচের ঠোঁট। ঠোঁটদ্বয় খোলা ও বন্ধ থেকে খাদ্য গ্রহণ নিয়ন্ত্রণ করে। এ ছিদ্র পথেই খাদ্য পরিপাকনালিতে প্রবেশ করে।

২. মুখগহ্বর : মুখছিদ্রের পরেই মুখগহ্বরের অবস্থান। সামনে দাঁতসহ দুটি চোয়াল দ্বারা মুখগহ্বর বেষ্টিত। এর উপরে রয়েছে তালু এবং নিচের দিকে রয়েছে মাংসল জিহ্বা। এছাড়া দুই পাশে রয়েছে তিন জোড়া লালাগ্রন্থি।

দাঁত খাদ্যবস্তু কেটে ছোট ছোট করে পেষণে সাহায্য করে। এসময় জিহ্বা খাদ্যবস্তুর স্বাদ গ্রহণ করে এবং খাদ্যবস্তুকে বার বার দাঁতের নিচে পাঠিয়ে চিবাতে সাহায্য করে। লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালা খাদ্যকে পিচ্ছিল করে এবং খাদ্যবস্তুকে গিলতে সাহায্য করে। লালা রসে এক ধরনের উৎসেচক বা এনজাইম আছে, যা শ্বেতসারকে আংশিক ভেঙে শর্করায় পরিণত করে। মানুষের স্থায়ী দাঁতের সংখ্যা ৩২টি। প্রতি চোয়ালে ১৬টি করে থাকে। এসব দাঁত চার প্রকার। যথা–

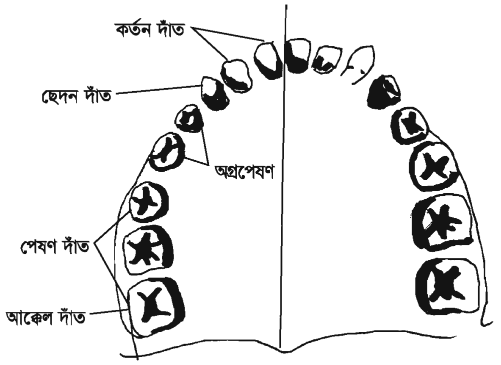

চিত্র-৫.২ : বিভিন্ন প্রকার দাঁত

I. কর্তন দাঁত খাবার ছোট ছোট করে কাটে।

II. ছেদন দাঁত দিয়ে মাংস ও অন্যান্য শক্ত জিনিস ছিঁড়ে ও কাটে।

III. অগ্রপেষণ দাঁত দিয়ে খাদ্যবস্তু চর্বণ ও পেষণ করা যায়।

IV. পেষণ দাঁতগুলো খাদ্যবস্তু চিবাতে ও পিষতে সাহায্য করে।

এ ছাড়া অন্যান্য দাঁতের অনেক পরে গজায় আক্কেল দাঁত।

৩. গলবিল : মুখগহ্বরের পরেই এর অবস্থান। এর মাধ্যমেই খাদ্যবস্তু মুখগহ্বর থেকে অন্ননালি বা গ্রাসনালিতে যায়। গলবিলে কোনো এনজাইম নিঃসৃত হয় না। তাই এখানে কোনো খাদ্যবস্তু পরিপাক হয় না।

৪. অন্ননালি : গলবিল ও পাকস্থলির মাঝামাঝি জায়গায় এর অবস্থান। খাদ্যবস্তু এর ভেতর দিয়ে গলবিল থেকে পাকস্থলিতে যায়।

৫. পাকস্থলি : অন্ননালি ও ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যবর্তী স্থানে এর অবস্থান। গলবিল ও অন্ননালির ক্রমসংকোচনের ফলে পিচ্ছিল খাদ্যবস্তু এখানে এসে জমা হয়। পাকস্থলির আকৃতি থলের মতো। এর প্রাচীর বেশ পুরু ও পেশিবহুল। পাকস্থলির প্রথম ও শেষ অংশে পেশিবলয় রয়েছে। পাকস্থলির প্রাচীরে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি নামে

প্রচুর গ্রন্থি থাকে। এখানে খাদ্য সাময়িক জমা থাকে। গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির পাচক রস পরিপাকে সাহায্য করে।

৬. ক্ষুদ্রান্ত্র : ক্ষুদ্রান্ত্র হলো পাকস্থলীর পরবর্তী অংশ, এটা পরিপাকনালির সবচেয়ে দীর্ঘ অংশ। ক্ষুদ্রান্ত্র তিনটি ভাগে বিভক্ত। যথা – (ক) ডিওডেনাম (খ) জেজুনাম ও (গ) ইলিয়াম।

(ক) ডিওডেনাম : এটা ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশ। পাকস্থলির পরের অংশ, দেখতে ট আকৃতির। পিত্তথলি থেকে পিত্তরস এবং অগ্ন্যাশয় থেকে অগ্ন্যাশয় রসনালির মাধ্যমে এখানে আসে খাদ্যের সাথে মেশে। এ রসগুলোও পরিপাকে অংশ নেয়। এখানে আমিষ, শর্করা ও স্নেহ পদার্থের পরিপাক ঘটে।

(খ) জেজুনাম : এটা ডিওডেনাম এবং ইলিয়ামের মাঝের অংশ।

(গ) ইলিয়াম : ইটা ক্ষুদ্রান্ত্রের শেষ অংশ। ইলিয়ামের ভেতরের প্রাচীরে শোষণ যন্ত্র থাকে। ব্যাপন পদ্ধতিতে শোষণকার্য সমাধার জন্য প্রাচীরগাত্রে আঙ্গুলের মতো প্রক্ষেপিত অংশ থাকে। এদের ভিলাই (ভিলাস) বলে। হজমের পর খাদ্যের সারাংশ ভিলাসগাত্র দ্বারা শোষিত হয়।

৭. বৃহদন্ত্র : ক্ষুদ্রান্ত্রের পরেই বৃহদন্ত্রের শুরু। এটা ইলিয়ামের পর থেকে পায়ুপথ পর্যন্ত বিস্তৃত। ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রে সংযোগস্থলে একটি ভাল্ব বা কপাটিকা থাকে। লম্বায় এটা ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে ছোট। কিন্তু ভেতরের ব্যাস ক্ষুদ্রান্ত্রের ভেতরের ব্যাস থেকে বড় থাকে। বৃহদন্ত্র তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা– (ক) সিকাম (খ) কোলন এবং (গ) মলাশয়।

মলাশয় বৃহদন্ত্রের শেষ প্রান্ত। দেখতে কতকটা থলের মতো। খাদ্যের অপাচ্য বা অহজমকৃত অংশ এখানে মলরূপে জমা হয়।

৮. মলদ্বার : পায়ু পরিপাকনালির শেষ প্রান্ত। এই প্রান্ত পথেই পরিপাক নালি দেহের বাইরে উন্মুক্ত হয়।

পরিপাকগ্রন্থি ও পরিপাকগ্রন্থির কাজ :

পরিপাকনালির যেসব গ্রন্থির নিঃসত রস খাদ্য পরিপাকে অংশগ্রহণ করে তাদের পরিপাকগ্রন্থি বলে। তোমরা আগেই জেনেছ লালাগ্রন্থি, যকৃৎ এবং অগ্ন্যাশয় পরিপাক গ্রন্থির অন্তর্ভুক্ত। লালাগ্রন্থি থেকে লালা ক্ষরণ হয়। লালায় এনজাইম ও পানি থাকে। পানি খাদ্যকে নরম করে। লালার এনজাইম হলো টায়ালিন।

যকৃৎ : দেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি হলো যকৃৎ। যকৃৎ থেকে পিত্তরস তৈরি হয়। পিত্তরস পিত্তথলিতে জমা থাকে। হজমের সময় পিত্তনালি দিয়ে পিত্তরস ডিওডেনামে এসে খাদ্যের সঙ্গে মিশে। পিত্তরস স্নেহ জাতীয় খাদ্য হজমে সাহায্য করে।

অগ্ন্যাশয় : প্রধানত তিনটি এনজাইম অগ্ন্যাশয়ে তৈরি হয়। যথা–অ্যামাইলেজ, ট্রিপসিন, কাইমোট্রিপসিন এবং লাইপেজ ডিওডেনামে এসে খাদ্যের সঙ্গে মেশে। ট্রিপসিন ও কাইমোট্রিপসিন আমিষ খাদ্য, লাইপেজ স্নেহ খাদ্য এবং অ্যামাইলেজ শর্করা জাতীয় খাদ্য হজমে সাহায্য করে।

গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি: গ্যাস্ট্রিকগ্রন্থি পাকস্থলির ভিতরের প্রাচীরে থাকে। এই গ্রন্থি নিঃসৃত রসের নাম গ্যাস্ট্রিক রস বা পাচক রস।

আন্ত্রিক গ্রন্থি: ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীরে ভিলাসে প্রচুর আন্ত্রিক গ্রন্থি থাকে। এই গ্রন্থি নিঃসৃত রসের নাম আন্ত্রিক রস।

বৃহদন্ত্র : বৃহদন্ত্রে খাদ্য হজম হয় না। এখানে কোনো জারক রস বা এনজাইম তৈরি হয় না। বৃহদন্ত্র মূলত খাদ্যের জলীয় অংশ থেকে পানি শোষণ করে। এ কাজটি অত্যন্ত দরকারি। এতে শরীর থেকে পানি বেশি পরিমাণে বের হওয়া রোধ করে।

বৃহদন্ত্রের সর্বশেষ অংশ অর্থাৎ মলাশয়ে খাদ্যের অপাচ্য অংশ মল হিসাবে সঞ্চিত হয়। প্রয়োজনমতো পরে পায়ু দিয়ে তা শরীরের বাইরে বর্জিত হয়।

নতুন শব্দ: পাকস্থলি, অগ্ন্যাশয়, যকৃৎ, ট্রিপসিন, অ্যামাইলেজ ও লাইপেজ।

পাঠ–৬ : সাধারণ রোগ ও প্রতিকার

১. গ্যাস্ট্রাইটিস : সাধারণত বেশি মসলা ও তেলযুক্ত খাবার খেলে, খাওয়ায় অনিয়ম করলে বুক জ্বালা আর অম্বল হয়। এতে পেটে বাড়তি এসিড তৈরি হয় আর তা থেকে পেট বা বুকের মাঝখানে একটা অস্বস্তি বা জ্বালার ভাব হয়। গলা ও পেট জ্বালা করে এবং পেটে ব্যথাসহ বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেয়। সময়মত এ রোগের চিকিৎসা করা না হলে পাকস্থলি ও অন্ত্রে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। তখন একে গ্যাস্ট্রিক আলসার বলে। নিয়মিতভাবে কম মসলা ও তেলযুক্ত খাবার খাওয়া এবং সময়মত খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস করলে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

২. আমাশয় : আমাশয় আমাদের দেশে একটি অতি পরিচিত রোগ। দুই ধরনের আমাশয় দেখা যায়। যথা–

(ক) অ্যামিবিক আমাশয়: প্রধাণত এন্টামিবা নামে এক প্রকার এককোষী প্রাণী মানুষের অন্ত্রে প্রবেশ করলে এ ধরনের রোগ দেখা দেয়। এ রোগের উপসর্গগুলো হলো– তলপেটে ব্যথা, মলের সাথে রক্ত বা শ্লেষ্মা বের হওয়া।

নলকূপের পানি বা ফুটানো পানি পান, পানি ও শাকসবজি যাতে দূষিত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা। মাছি, আরশোলা থেকে খাদ্যবস্তুকে রক্ষার মাধ্যমে এ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। তবে এ রোগে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসকের পরামর্শে ওষুধ সেবন করা প্রয়োজন।

(খ) ব্যাসিলারি আমাশয় : সিগেলা নামের এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া অন্ত্রকে আক্রমণ করলে এ ধরনের আমাশয় হয়। জীবাণু বৃহদন্ত্রের ঝিল্লিকে আক্রমণ করে। ফলে বারবার পায়খানা হয় এবং পায়খানার সাথে শ্লেষ্মা বের হয়। অনেক সময় এর সাথে রক্তও যায়। এজন্য এ রোগকে রক্ত আমাশয় বলে। এ রোগকে অবহেলা করা ঠিক নয়। ডাক্তারের পরামর্শে চিকিৎসা করা প্রয়োজন। সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে এ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

৩. কোষ্ঠকাঠিন্য : কোষ্ঠকাঠিন্য প্রকৃতপক্ষে কোনো রোগ নয়। বিভিন্ন কারণে কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে। যেমন– পৌষ্টিকনালির মধ্য দিয়ে খাদ্যবস্তুর চলন ধীর হওয়া, কাঁচা ফলমূল ও শাকসবজি না খাওয়া,

পায়খানার বেগ পেলে সংঙ্গে সংঙ্গে পায়খানায় না বসা ইত্যাদি। নিয়মিত মল ত্যাগের অভ্যাস গড়ে তোলা, নিয়মিত শাকসবজি খাওয়া, ফলমূল ও আঁশযুক্ত খাবার খাওয়ার মাধ্যমে এ অসুবিধা দূর করা যায়।

কাজ: শিক্ষার্থীরা খাতায় পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন রোগের নাম লিখবে। দলে বিভক্ত হয়ে শিক্ষার্থী কী কারণে এ রোগগুলো হয় তা খাতায় লিপিবদ্ধ করবে। প্রতিটি দলের একজন করে তা শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে। অন্যরা বিষয়গুলো মিলিয়ে নিবে।

পরিপাকতন্ত্রের যত্ন

১। **দাঁত:** প্রতিবার খাওয়ার পর দাঁত ব্রাশ করা ও পরিষ্কার করা উচিত। দাঁতের ফাঁকে খাবারের কণা আটকে থাকলে তা পচে মুখে দুর্গন্ধ হয়। দাঁতের ক্ষয় হয়। খুব বেশি মিষ্টি খেতে নেই। মিষ্টি দাঁত ক্ষয়ের জন্য দায়ী।

২। **খাদ্যবস্তু:** খাদ্যবস্তু পরিষ্কার ও সুসিদ্ধ হওয়া উচিত। বাসি পচা খাবার খাওয়া উচিত নয়। আঙ্গুলের নখ ছোট রাখা এবং খাওয়ার আগে থালাবাটি ও হাত অবশ্যই পরিষ্কার করে নিতে হবে।

৩। **খাওয়া:** নিয়মিত নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়া উচিত। একসাথে বেশি খাবার খাবে না। সব সময় সুষম খাবার খাবে। খাওয়ার কিছুক্ষণ পর প্রচুর পানি খাবে। সব সময় পানি ফুটিয়ে ঠান্ডা করে খাবে। খাবার ধীরে ধীরে ভালো করে চিবিয়ে খাবে। অধিক মসলা ও তেলযুক্ত খাবার খাওয়া উচিত নয়।

নতুন শব্দ: কোষ্ঠ্যকাঠিন্য, ব্যাসিলারি আমাশয় ও অ্যামিবিক আমাশয়।

পাঠ ৭–৮ : রক্ত সংবহন তন্ত্র

যে প্রক্রিয়ায় প্রাণিদেহে রক্ত পরিবহনের কাজ সম্পন্ন হয় তাকে সংবহন প্রক্রিয়া বলে। রক্ত, হৃৎপিন্ড, ধমনি, শিরা এবং লসিকা ও লসিকাবাহী নালির সমন্বয়ে মানব দেহের সংবহনতন্ত্র গঠিত। যে তন্ত্রের মাধ্যমে দেহে রক্ত সঞ্চালিত হয় তাকে রক্ত সংবহনতন্ত্র বলে। হৃৎপিন্ড, রক্ত ও রক্তবাহী নালির সমন্বয়ে রক্ত সংবহনতন্ত্র গঠিত।

রক্ত ও রক্তের উপাদান

তোমরা মুরগি, গরু অথবা ছাগল জবাই করতে দেখে থাকবে। জবাই করার সময় ক্ষতস্থান থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বের হয়। এই রক্তের রঙ কেমন? রক্ত কী ধরনের পদার্থ? রক্ত ঘন লাল রঙের একটি তরল পদার্থ। এটি এক ধরনের তরল যোজক কলা বা টিস্যু। রক্তের স্বাদ ক্ষারধর্মী। রক্তের উপাদান দুইটি, যথা–

১। রক্তরস

২। রক্তকণিকা

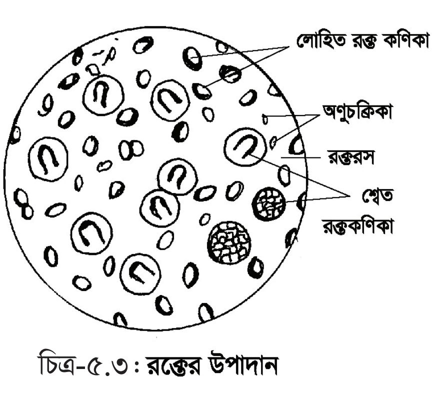

চিত্র-৫.৩ : রক্তের উপাদান

১। রক্তরস: রক্তরস রক্তের তরল অংশ। সাধারণত রক্তের শতকরা ৫৫ ভাগ রক্তরস। এতে আমিষ, লবণ ও অন্ত্র থেকে শোষিত খাদ্য উপাদান থাকে। রক্তরসে রক্তকণিকা ভাসমান অবস্থায় থাকে। এতে ফাইব্রিনোজেন নামে একটি উপাদান থাকে যা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।

কাজ :

১। রক্তরস দেহের বিভিন্ন অংশে অক্সিজেন, খাদ্যসার, হরমোন ইত্যাদি বহন করে।

২। দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে ক্ষতিকর পদার্থ (যেমন–কার্বন ডাই–অক্সাইড, ইউরিয়া, ইউরিক এসিড ইত্যাদি) বহন করে বিভিন্ন রেচন অংঙ্গের মাধ্যমে দেহ থেকে বের করে দেয়।

২। **রক্তকণিকা** : রক্তে তিন ধরনের কণিকা রয়েছে। যথা–

ক. লোহিত রক্তকণিকা
খ. শ্বেত রক্তকণিকা
গ. অণুচক্রিকা

ক. লোহিত রক্তকণিকা : লোহিত রক্ত কণিকার জন্য রক্তের রঙ লাল দেখায়। এর মধ্যে হিমোগ্লোবিন নামক একটি রঞ্জক পদার্থ থাকে। হিমোগ্লোবিনের সাথে অক্সিজেন যুক্ত হয়ে দেহকোষে পৌঁছায়। লোহিত রক্তকণিকা উভঅবতল (উভয় পৃষ্ঠে খাদ আছে)। চাকতির মতো গোলাকার কোষ। লোহিত রক্তকণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে না। লোহিত রক্তকণিকা যকৃত ও অস্থিমজ্জায় তৈরি হয়।

খ. শ্বেত রক্তকণিকা: শ্বেত রক্তকণিকা লোহিত রক্তকণিকার চেয়ে আকারে কিছুটা বড় ও অনিয়মিত আকারের হয়। এদের নিউক্লিয়াস আছে। প্লীহা ও অস্থিমজ্জায় এদের জন্ম। দেহে কোনো রোগ–জীবাণু প্রবেশ করলে শ্বেত রক্তকণিকা সেগুলোকে ধ্বংস করে। শ্বেত রক্তকণিকা দেহের প্রহরীর মতো কাজ করে। এদের সৈনিকের সাথে তুলনা করা হয়।

গ. অণুচক্রিকা : অণুচক্রিকা দেখতে গোলাকার বা বৃত্তের মতো। এরা লোহিত রক্তকণিকার চেয়ে আকারে ছোট হয় ও নিউক্লিয়াস থাকে না। এরা গুচ্ছাকারে থাকে। এদের উৎপত্তি লোহিত অস্থিমজ্জায়। দেহের কোনো অংশ কেটে রক্তপাত ঘটলে অণুচক্রিকা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। এদের প্লেটলেটও বলে।

রক্তের কাজ : রক্ত আমাদের দেহের একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। রক্ত দেহে নানা রকম কাজ করে। যথা–

১. **খাদ্য পরিবহন** : আমরা যে খাবার খাই, পরিপাকের পর এগুলো সরল উপাদানে পরিণত হয় এবং রক্তের সাথে মিশে যায়। রক্ত সেই খাদ্যের সারাংশকে দেহের সর্বত্র বহন করে নিয়ে যায়। এভাবে দেহের কোষগুলোর পুষ্টি সাধন হয়।

২. **অক্সিজেন পরিবহন** : আমাদের দেহে সকল কাজের জন্য অক্সিজেন দরকার। অক্সিজেন না হলে জীবকোষ বাঁচতে পারে না। কাজেই খাবারের সাথে সাথে এদের দিতে হয় অক্সিজেন। রক্তের লোহিত রক্তকণিকায় অবস্থিত হিমোগ্লোবিন ফুসফুস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে। অক্সিহিমোগ্লোবিন রূপে প্রতিটি কোষে বহন করে।

৩. **কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহন :** রক্তরস দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কোষগুলোতে উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড বহন করে ফুসফুসে নিয়ে যায়।

৪. **বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন :** দেহে সৃষ্ট নাইট্রোজেন দ্বারা গঠিত দূষিত পদার্থ দেহ থেকে বের করে দেওয়ার কাজে সহায়তা করে।

৫. **রোগ প্রতিরোধ :** দেহে কোনো রোগজীবাণু প্রবেশ করলে রক্তের শ্বেত রক্তকণিকা সেগুলোকে মেরে ফেলে রোগ প্রতিরোধ করে।

৬. **হরমোন পরিবহন :** দেহের নালিহীন গ্রন্থিতে হরমোন উৎপন্ন হয়। রক্তের মাধ্যমে হরমোন দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয়।

৭. **তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ :** রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশের তাপ পরিবহন করে। এতে দেহের সর্বত্র তাপমাত্র ঠিক থাকে।

৮. **রক্ত জমাট বাধা :** দেহের কোনো অংশ কেটে গেলে রক্তপাত হয়। অণুচক্রিকা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। ফলে রক্তপাত বন্ধ হয়।

নতুন শব্দ : লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা, অণুচক্রিকা, রক্তরস, হরমোন, নালিহীন গ্রন্থি।

পাঠ–৯–১০ : রক্তনালি

তোমার হাতের উপর দিক লক্ষ্য করলে দেখতে পারবে নীল রঙের এক ধরনের নালি দেখা যায়। এগুলো হল শিরা। শিরা এক ধরনের রক্তনালি। রক্তনালি কী? যে নালির মধ্য দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হয়, তাকে রক্তনালি বলে। আমাদের দেহে তিন ধরনের রক্তনালি আছে। যথা–১. ধমনি ২. শিরা ও ৩. কৈশিকনালি।

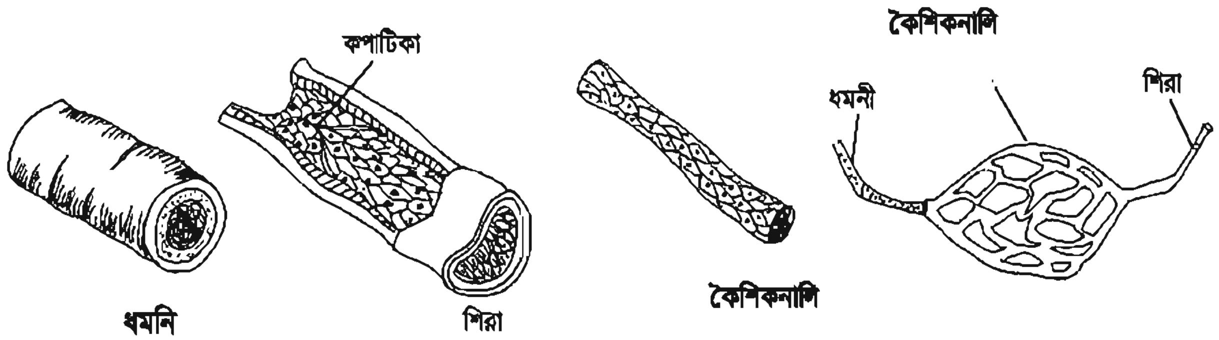

চিত্র-৫.৪ : ধমনি, শিরা ও কৈশিকনালি

১. **ধমনি :** যে সকল রক্তবাহী নালি হৃৎপিন্ড থেকে উৎপন্ন হয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে রক্ত বহন করে, তাকে ধমনী বলে। এরা দেহের ভিতর দিকে অবস্থিত। ধমনির প্রাচীর পুরু, গহ্বর ছোট এবং এর গহ্বরে কপাটিকা থাকে না। ধমনি অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে।

২. **শিরা :** যে সকল রক্তনালি দ্বারা দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে তাকে শিরা বলে। শিরা প্রাচীর অপেক্ষকৃত পাতলা। এদের গহ্বরটি বড় ও গহ্বরের প্রাচীরগাত্রে কপাটিকা থাকে। দেহের

কৈশিক জালিকা থেকে শিরার উৎপত্তি ঘটে। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া শিরা সাধারণত কার্বন ডাইঅক্সাইডযুক্ত রক্ত বহন করে।

৩. কৈশিকনালি : ধমনি ক্রমান্বয়ে শাখা–প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত অতিসূক্ষ্ম নালি তৈরি করে। এই সকল সূক্ষ্মনালিকে কৈশিকনালি বা কৈশিক জালিকা বলে। কৈশিকনালি থেকে শিরার উৎপত্তি। এক স্তরবিশিষ্ট পাতলা এপিথেলিয়াল কোষ দিয়ে কৈশিকনালির প্রাচীর গঠিত। কৈশিকনালি দেহকোষের চারপাশে অবস্থান করে।

নিজেরা কর : তোমরা নিচের ছকটি পূরণ করে ধমনি ও শিরার পার্থক্য নির্ণয় কর।

উৎপত্তি	ধমনি	শিরা
কপাটিকা		
গহবর		
প্রাচীর		
অক্সিজেনের পরিমাণ		
কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ		

হৃৎপিণ্ড :

হৃৎপিণ্ড বক্ষগহ্বরের বাম দিকে দুই ফুসফুসের মাঝখানে অবস্থিত একটি মোচাকৃতির অঙ্গ। এটা পেরিকার্ডিয়াম নামে দুই স্তরবিশিষ্ট একটি পাতলা পর্দা দ্বারা আবৃত। হৃৎপিণ্ড হৃৎপেশি দ্বারা গঠিত। হৃৎপেশি এক ধরনের স্বাধীন অনৈচ্ছিক পেশি, যা কারো নিয়ন্ত্রণ ছাড়া নিজে নিজেই সংকোচন ও প্রসারণে সক্ষম। প্রতি মিনিটে কমবেশি ৭২ বার হৃৎপিণ্ড সংকোচিত ও প্রসারিত হয়। তুমি তোমার বুকের মাঝখানে হাত রাখ। একটা ধুকধুকানি বা কোনো স্পন্দন টের পাচ্ছ কী? কেন এমন ঘটে? হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে এইরূপ ঘটে। এটা হৃদস্পন্দন।

নিজেরা কর : তুমি ঘড়ি দেখে তোমার বন্ধুর হৃদস্পন্দন গণনা কর।

হৃৎপিণ্ড তিন স্তরে গঠিত। যথা– ক. বাইরের স্তর বা এপিকার্ডিয়াম খ. মাঝের স্তর বা মায়োকার্ডিয়াম এবং গ. ভিতরের স্তর বা এন্ডোকার্ডিয়াম। এদের মধ্যে মায়োকার্ডিয়ামই সবচেয়ে পুরু এবং এর সংকোচনের কারণে হৃৎপিণ্ড পাম্প করে রক্ত সঞ্চালন করে।

হৃৎপিণ্ড একটি চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট ফাঁপা অঙ্গ। হৃৎপিণ্ডের উপরের প্রকোষ্ঠ দুটির নাম ডান অলিন্দ ও বাম অলিন্দ এবং নিচের প্রকোষ্ঠ দুইটি যথাক্রমে ডান ও বাম নিলয়।

অলিন্দে প্রাচীর পাতলা ও নিলয়ের প্রাচীর পুরু থাকে।

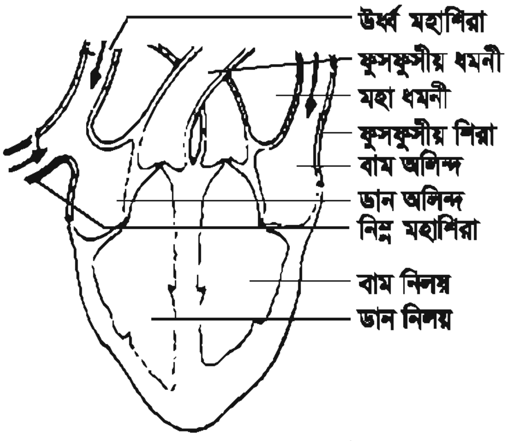

চিত্র-৫.৫ : হৃৎপিণ্ডের গঠন

অলিন্দ ও নিলয় দুইটি আলাদা প্রাচীর দ্বারা পৃথক থাকে।

আয়তনে অলিন্দগুলো নিলয়ের চেয়ে আকারে ছোট হয়।

ডান অলিন্দ ও ডান নিলয়ের মাঝে ডান অলিন্দ–নিলয় ছিদ্র থাকে। ঐ ছিদ্রপথে কপাটিকা থাকে। রক্ত এ ছিদ্রপথে অলিন্দ থেকে নিলয়ে প্রবেশ করতে পারে। অনুরূপভাবে বাম অলিন্দ ও নিলয়ের মাঝে কপাটিকা থাকে। এক্ষেত্রেও বাম অলিন্দ থেকে রক্ত কেবল মাত্র নিলয়ে প্রবেশ করতে পারে। এছাড়া মহাধমনি ও বাম নিলয়ের সংযোগস্থলে ও ফুসফুসীয় ধমনি এবং ডান নিলয়ের সংযোগস্থলে অর্ধচন্দ্রাকৃতির কপাটিকা রয়েছে। এ কপাটিকাগুলো রক্তের গতিপথ একদিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

নিজেরা কর : একদিন সাগরের বাবা অসুস্থ্য হয়ে পড়েছিলেন। সাগরের বড় ভাই একজন ডাক্তার। ভাইয়া বাবার হাতের কবজির উপর হাত রেখে হাত ঘড়ি দেখছিলেন। সাগর বিষয়টি লক্ষ করল। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ভাইয়ার কাছে জানছে চাইল বাবার কবজির উপর হাত রেখে তিনি কী পরীক্ষা করছিলেন। হাতের উপরের দিকে যে রক্তনালিগুলি দেখা যায় ওগুলোকে কী বলে? ভাইয়া তার প্রশ্নের জবাবে বললেন, তিনি বাবার নাড়ির স্পন্দন দেখছিলেন। নাড়ি স্পন্দন কী? হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে ধমনির মধ্যে যে স্পন্দন সৃষ্টি হয় তাকে নাড়ি স্পন্দন বলে। ধমনি থাকে দেহের ভেতরে আর শিরা থাকে দেহের উপরিভাগে।

এবার তুমি তোমার বন্ধুর নাড়ির স্পন্দন পরীক্ষা কর। তার হাতের শিরাগুলো পর্যবেক্ষণ কর। তোমার বন্ধু তোমার নাড়ির স্পন্দন পরীক্ষা করবে। এবার তুমি স্কুলের মাঠে পাঁচ মিনিট দৌড়ে আস। তুমি তোমার বন্ধুকে তোমার নাড়ির স্পন্দন পরীক্ষা করতে বলো। কোনো পরিবর্তন লক্ষ করছ কী? পরিশ্রমে হৃৎপিণ্ডের সংকোচন–প্রসারণ বেড়ে যায় ফলে নাড়ির স্পন্দনও বৃদ্ধি পায়।

হৃৎপিণ্ডর মাধ্যমে রক্ত সঞ্চালন :

হৃৎপিণ্ড হৃৎপেশি নামক এক বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি দ্বারা গঠিত। যখন হৃৎপিণ্ডর সংকোচন হয় তখন হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত ধমনি পথে বিভিন্ন অংশে সঞ্চালিত হয়। আবার হৃৎপিণ্ডে যখন প্রসারণ ঘটে তখন দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে রক্ত শিরা পথে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। এভাবে হৃৎপিণ্ডর সংকোচন প্রসারণ দ্বারা রক্ত একবার হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে আবার হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে সঞ্চালিত হয়।

নতুন শব্দ: কপাটিকা, ধমনি, শিরা, কৈশিকনালি, অলিন্দ ও নিলয়

পাঠ ১১–১২ : হৃদরোগ

আমান সাহেব একজন ব্যাংক কর্মচারী। তিনি একজন মাঝারি গড়নের মোটাসোটা মানুষ। তিনি মাছ–মাংস ও তেলযুক্ত খাবার খেতে খুব পছন্দ করেন। তিনি একজন ধূমপায়ী। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একটানা পরিশ্রম করেন। পরিশ্রমের সাথে মাত্রাতিরিক্ত ধূমপান করেন। সারা দিন হাঁটাচলা, ব্যায়াম হয় না বললেই চলে। হঠাৎ একদিন অফিস থেকে ফিরে বুকের বাম দিকে ব্যথা অনুভব করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যথা তীব্র হলো। তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তার স্ত্রী তৎক্ষণাৎ তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে

গেলেন। ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষা করে বললেন যে, আমান সাহেব হৃদরোগে ভুগছেন। এবার বলতো হৃদরোগের কারণগুলো কী কী?

হৃদরোগের কারণ :

উপরের অনুচ্ছেদ থেকে আমরা হৃদরোগের যে কারণগুলো জানতে পারলাম তা হলো:

- অধিক তেল ও চর্বিযুক্ত খাবার গ্রহণ।
- সুষম খাদ্য গ্রহণ না করা।
- ধূমপান করা।
- অতিরিক্ত পরিশ্রম করা।
- খেলা, হাঁটাচলা, ব্যায়াম বা কোনো রকম শারীরিক পরিশ্রম না করা।

হৃদরোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় :

১। অধিক শর্করা ও চর্বিযুক্ত খাবার না খাওয়া।

২। নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম করা। যথা– খেলাধুলা, হাঁটাচলা, ব্যায়াম করার অভ্যাস গড়ে তোলা।

৩। নিয়মিত সুষম খাদ্য গ্রহণ করা।

৪। ধূমপান ত্যাগ করা। ধূমপানের ফলে ধমনিগাত্র শক্ত হয়ে রক্ত প্রবাহের ব্যাঘাত ঘটায়।

৫। অতিরিক্ত পরিশ্রম, অতিরিক্ত মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তামুক্ত থাকার চেষ্টা করা।

৬। তাজা ফলমূল, শাকসবজি খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা।

৭। দেহের ওজন বাড়তে না দেওয়া। দেহের ওজন বেড়ে গেলে হৃৎপিণ্ডের উপর রক্ত সঞ্চালনের চাপ পড়ে। ফলে হৃৎপিণ্ড ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

নিজেরা কর : হৃৎপিণ্ডের চিত্র অঙ্কন কর। হৃৎপিণ্ডে রক্তের গতিপথ চিহ্নিত কর। কীভাবে হৃদরোগ রোধে সচেতনতা সৃষ্টি করা যায় এমন একটি চার্ট তৈরি কর।

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

ধমনি : ধমনি হৃৎপিণ্ড থেকে উৎপন্ন হয়ে দেহের সকল অঙ্গে সাধারণত অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে। কিন্তু ফুসফুসীয় ধমনি এর ব্যতিক্রম। ফুসফুসীয় ধমনি কার্বন ডাই অক্সাইডযুক্ত রক্ত ফুসফুসে নিয়ে যায়।

শিরা: শিরা দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে উৎপত্তি হয়ে সাধারণত কার্বন ডাই অক্সাইডযুক্ত রক্ত হৃৎপিণ্ডের দিকে পরিবহন করে। কিন্তু ফুসফুসীয় শিরা এর ব্যতিক্রম। ফুসফুসীয় শিরাপথে অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত বাম অলিন্দে নিয়ে আসে।

লোহিত কণিকা : লোহিত কণিকায় হিমোগ্লোবিন নামক রঞ্জক পদার্থ থাকে। হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে অক্সিহিমোগ্লোবিন তৈরি করে।

অণুচক্রিকা : অণুচক্রিকা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পুরণ কর

১. এনজাইম ———————— সাহায্য কর।

২. ——————— জাতীয় খাদ্য পরিপাক হয়ে অ্যামাইনো এসিডে পরিণত হয়।

৩. লোহিত কণিকায় —————— নামক এক প্রকার পদার্থ থাকে।

৪. ————— রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।

৫. —————— কণিকা দেহে প্রহরীর মতো কাজ করে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পরিপাক হওয়া খাদ্য কোথায়, কীভাবে, শোষিত হয়?

২. দাঁত পরিষ্কার রাখার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

৩. মুখ দিয়ে পাকস্থলিতে কীভাবে খাদ্য যায় বর্ণনা কর।

৪. তোমার দেহে রক্তকণিকার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

৫. রক্তনালি আমাদের দেহে কী কাজ করে?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. দেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি কোনটি?

ক. অগ্নাশয়
খ. আন্ত্রিক গ্রন্থি
গ. গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি
ঘ. যকৃৎ

২. লালায় থাকে কোনটি?

ক. টায়ালিন ও পানি
খ. ট্রিপসিন ও পানি
গ. লাইপেজ ও পানি
ঘ. অ্যামাইলেজ ও পানি

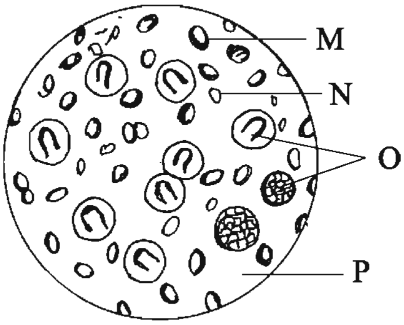

উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ৩, ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

৩. নিউক্লিয়াস অনুপস্থিত থাকে–

i. M, N
ii. N, O
iii. O, M

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. i ও ii
ঘ. i ও iii

৪. P চিহ্নিত অংশটির কাজ হচ্ছে–

i. খাদ্যসার বহন করা ii. প্রহরী হিসেবে কাজ করা iii. বর্জ্য নির্গমনে সহায়তা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫. কোনটি রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে?

ক. M খ. N গ. O ঘ. P

সৃজনশীল প্রশ্ন

১।

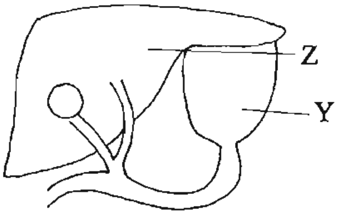

ক. ভিলাই কী?

খ. খাওয়ার পর দাঁত ব্রাশ করা উচিত কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. Y চিহ্নিত অংশটির কার্যকারিতা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. Z অংশটি ক্ষতিগ্রস্থ হলে মানবদেহে কী ধরনের সমস্যা দেখা দিবে? ব্যাখ্যা কর।

২।

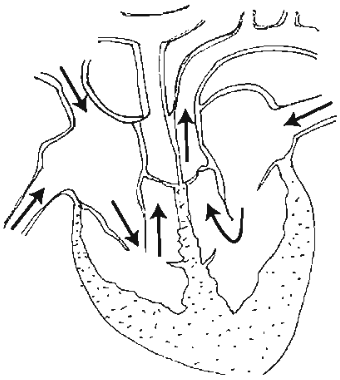

ক. পেরিকার্ডিয়াম কী?

খ. লাইপেজ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে তীর চিহ্নিত পথে কীভাবে রক্ত সঞ্চালিত হয় ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের অঙ্গটি সুস্থ রাখার জন্য আমাদের কেন সর্তকতা অবলম্বন করা উচিত, তা যুক্তিসহ লেখ।

নিজেরা কর :

১. তুমি তোমার বন্ধুর নাড়ির স্পন্দন কীভাবে পরীক্ষা করবে? ব্যায়াম করার পর তোমার বন্ধুর নাড়ির স্পন্দন পরীক্ষা কর। কোনো পরিবর্তন লক্ষ করছো কি? পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা কর।

২. তোমরা দলগতভাবে মানব পরিপাকতন্ত্রের একটি চার্ট তৈরি কর এবং প্রতিটি অঙ্গের পাশে এর কাজ লিপিবদ্ধ কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পদার্থের গঠন

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বায়ু, পানি, লোহা, খাদ্যদ্রব্য, বইপুস্তক, চক ইত্যাদি নানা রকম জিনিস বা পদার্থ ব্যবহার করি। এদের মধ্যে কোনোটি আছে মৌলিক পদার্থ, কোনোটি যৌগিক পদার্থ আবার কোনোটি বিভিন্ন পদার্থের মিশ্রণ। প্রতিটি পদার্থ কী দিয়ে তৈরি বা এদের গঠন কেমন ও কিভাবে তৈরি হয় তা কি তোমরা জান?

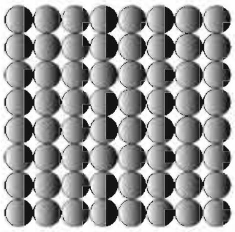

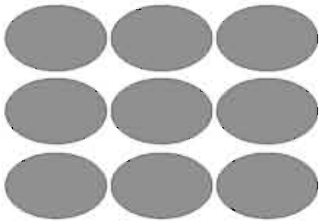

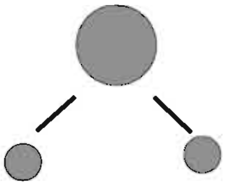

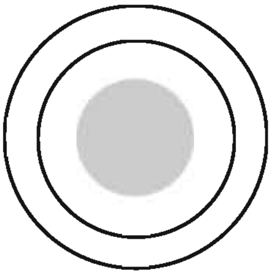

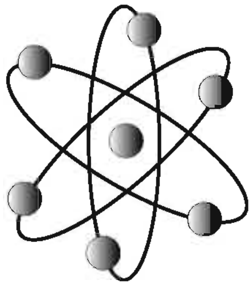

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- পদার্থের গঠন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অণু ও পরমাণুর মধ্যে পার্থক্য করতে পারব।
- মৌলিক, যৌগিক ও মিশ্র পদার্থের মধ্যে পার্থক্য করতে পারব।
- প্রতীক ও সংকেত থেকে নির্বাচিত মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ চিনতে পারব।
- সার্বজনীন দ্রাবক হিসেবে পানির ব্যবহার প্রদর্শন করতে পারব।

পাঠ ১–২ : পদার্থের গঠন

আমাদের চারপাশে সবসময়ই কোনো না কোনো পদার্থ দেখতে পাই। এগুলো আমরা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করি। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই আমরা হাতমুখ ধোয়ার কাজে পানি ব্যবহার করি। এই পানি একটি পদার্থ। একই ভাবে চক, চিনি, লবণ, লোহা, তামা ইত্যাদি সবই পদার্থ। এসব পদার্থ কী দিয়ে গঠিত ?

পদার্থের ভিন্নতার কারণ কি?

পদার্থের ভিন্নতার কারণ হলো এদের গঠন। একেকটি পদার্থের গঠন একেক রকম বলেই তারা দেখতে ভিন্ন রকম হয় ও তাদের ধর্মও ভিন্ন রকম হয়। সে কারণেই ধর্ম অনুযায়ী তারা ভিন্ন ভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়।

এবার আমাদের বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি পদার্থের গঠন দেখা যাক। প্রথমে লোহা ও তামার কথাই ধরি। আমরা যে লোহা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করি, তা মূলত ছোট ছোট লোহার কণা দিয়ে গঠিত। তামার ক্ষেত্রেও তাই। এটি ছোট ছোট তামার কণা দিয়ে গঠিত। লোহাকে ভাঙলে শুধু লোহারই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা পাওয়া যাবে অর্থাৎ লোহাতে একটি মাত্র উপাদান বিদ্যমান। একই ভাবে তামাকে ভাঙলে শুধু তামারই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা পাওয়া যাবে এবং এতেও একটি মাত্র উপাদান বিদ্যমান।

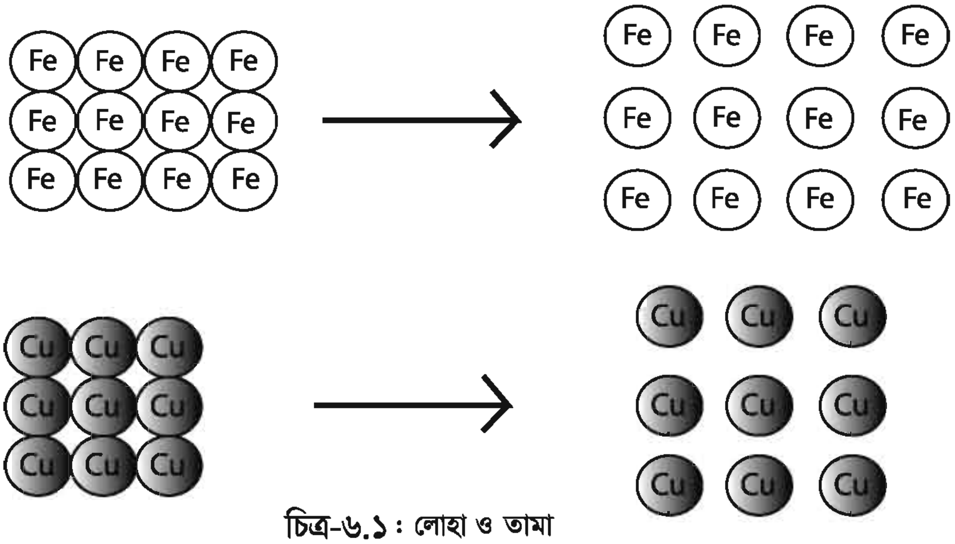

চিত্র-৬.১ : লোহা ও তামা

লোহা ও তামার মতো যে সকল পদার্থ একটি মাত্র উপাদান দিয়ে তৈরি, তাদেরকে আমরা বলি মৌলিক পদার্থ।

লোহা ও তামার মতো আমাদের পরিচিত হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন একটি করে উপাদান দিয়ে তৈরি এবং এরাও মৌলিক পদার্থ।

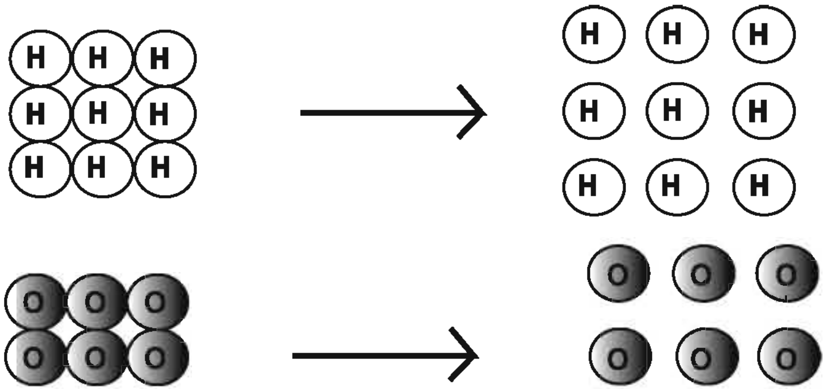

চিত্র-৬.২ : হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের দুটি অত্যাবশ্যকীয় পদার্থ হলো লবণ ও চিনি। লবণ হলো সোডিয়াম ও ক্লোরিন নামের দুই রকম উপাদান দিয়ে তৈরি একটি পদার্থ। আর চিনি হলো কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামের তিনটি ভিন্ন উপাদান দিয়ে তৈরি।

আমরা যদি লবণকে অর্থাৎ সোডিয়াম ক্লোরাইডকে ভাঙতে থাকি, তবে প্রথমে লবণের বড় দানা থেকে ছোট বা ক্ষুদ্র দানা, প্রাপ্ত ছোট দানাগুলি থেকে আরও ক্ষুদ্র দানা এবং একপর্যায়ে একেবারে ক্ষুদ্রতম দানায় পরিণত হবে, যখন এটিকে খালি চোখে আর দেখা যাবে না। যদিও এটি লবণের একটি অতি ক্ষুদ্রতম অংশ, যেখানে একটি মাত্র সোডিয়াম ক্লোরাইড আছে এই অংশ ভেঙ্গে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে সোডিয়াম ও ক্লোরিন হয়ে যায়। অর্থাৎ দুটি ভিন্ন উপাদান পাওয়া যায়।

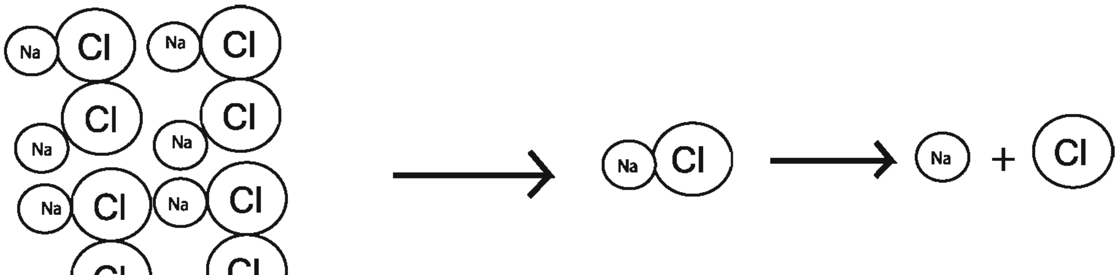

চিত্র- ৬.৩ : সাধারণ লবন

একই ভাবে চিনিকে ভাঙলে শেষ পর্যন্ত কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন তিনটি উপাদানই পাওয়া যাবে।

লবণ ও চিনির মতো যে সব পদার্থ একের অধিক ভিন্নধর্মী উপাদান দিয়ে তৈরি তাদেরকে আমরা বলি যৌগিক পদার্থ।

লোহায় মরিচা ধরার কথা আমরা কে না জানি। ধূসর কালচে রঙের লোহার তৈরি রড (যা একটি মৌলিক পদার্থ) কিছুদিন বাইরে রেখে দিলে এর উপর লালচে বাদামী রঙের একটি আস্তরন পড়ে, যার নাম মরিচা। এখানে আসলে একটি মৌলিক পদার্থ (লোহা) জলীয়বাষ্পের উপস্থিতিতে অপর একটি মৌলিক পদার্থ অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়ার মাধ্যমে মরিচার সৃষ্টি করে, যা আয়রন অক্সাইড নামের একটি যৌগিক

পদার্থ। তাহলে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থ মিলে একটি যৌগিক পদার্থ তৈরি হয়।

মিশ্র পদার্থ: একটি গ্লাসে পানি নিয়ে তাতে সমান্য একটু লবণ যোগ করে নাড়া দাও। লবণ ও পানির এই মিশ্রণ যেখানে একের অধিক পদার্থ বিদ্যমান সেটি হলো মিশ্র পদার্থ। একই ভাবে, বায়ু এক ধরনের মিশ্র পদার্থ যেখানে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, জলীয়বাষ্পসহ অন্যান্য পদার্থ থাকে। এখানে লক্ষণীয় যে, বায়ু এমন একটি মিশ্র পদার্থ যেখানে মৌলিক ও যৌগিক উভয় ধরনের পদার্থ রয়েছে। আবার লবণ পানির মিশ্রণে উপস্থিত লবণ ও পানি দুটিই যৌগিক পদার্থ।

পাঠ ৩: ক্ষুদ্রতম কণার মতবাদ

আগের পাঠে আমরা দেখেছি, মৌলিক বা যৌগিক পদার্থকে ক্রমাগত ভাঙতে ভাঙতে এক পর্যায়ে এটি ক্ষুদ্রতম কণায় পরিণত হয়। এই ক্ষুদ্রতম কণার বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ নানা রকম মতবাদ ব্যক্ত করেছেন। গ্রিক দার্শনিক ডেমক্রিটাস (Democritus) খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দে সর্বপ্রথম পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা নিয়ে মতবাদ পোষণ করেন। তার মতে সকল পদার্থই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবিভাজ্য (যা আর ভাঙা যায় না) কণা দিয়ে তৈরি । তিনি এই ক্ষুদ্রতম কণার নাম দেন পরমাণু বা এটম। এটম কথাটি তিনি নিয়েছিলেন গ্রিক শব্দ এটমস (Atomos) থেকে, যার অর্থ হলো অবিভাজ্য (Indivisible) বা যা ভাঙা যায় না। তাঁর সমসাময়িক আরও দুজন দার্শনিক প্লেটো (Plato) এবং অ্যারিস্টটল (Aristotle) তাঁর মতবাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। অ্যারিস্টটলের মতে, পদার্থসমূহ অবিচ্ছেদ্য (Continuous) এবং ভাঙনের কোনো সীমা নেই অর্থাৎ যতই ভাঙা হোক না কেন, পদার্থের কণাগুলো ক্ষদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হতে থাকবে।

১৮০৩ সালে জন ডাল্টন (John Dalton) নামের ইংরেজ বিজ্ঞানী পরীক্ষালব্ধ তথ্যের উপর ভিত্তি করে পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা সম্পর্কে তাঁর মতবাদ দেন। তাঁর এই মতবাদ ডাল্টনের পরমাণুবাদ নামেই পরিচিত। ডাল্টনের মতে–

১। মৌলিক পদার্থসমূহ পরমাণু নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দিয়ে গঠিত।

২। একটি মৌলের বা মৌলিক পদার্থের সকল পরমাণু একই রকম। একটি মৌলের সকল পরমাণুর আকার, ভর ও রাসায়নিক ধর্ম একই।

৩। একটি মৌলের পরমাণুসমূহ অপর মৌলের পরমাণুসমূহ হতে ভিন্ন রকম। অর্থ্যাৎ ভিন্ন ভিন্ন মৌলের পরমাণুর আকার, ভর ও ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন।

৪। যৌগিক পদার্থসমূহ একের অধিক মৌলিক পদার্থ দিয়ে গঠিত। বিভিন্ন মৌলের পরমাণুসমূহ সরল অণুপাতে যুক্ত হয়ে যৌগিক পদার্থ বা যৌগ তৈরি করে।

৫। একটি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পরমাণুসমূহের সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় না। শুধু একে অপরের সাথে যুক্ত হয় বা একে অন্য থেকে আলাদা হয়।

পাঠ ৪ ও ৫: পরমাণু ও অণু

আমরা ডাল্টনের মতবাদ থেকে জানলাম যে, পদার্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দিয়ে গঠিত। এ ক্ষুদ্র কণাদেরকে পরমাণু বলা হয়। তবে পরমাণু স্বাধীন বা মুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে না। এরা একে অন্যের সাথে যুক্ত হয়ে অণু গঠন করে। অণুরা মুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে।

মৌলিক পদার্থের বেলায় শুধু ঐ পদার্থের পরমাণুরা যুক্ত হয়ে অণু গঠন করে। যেমন দুটি অক্সিজেন পরমাণু যুক্ত হয়ে একটি অক্সিজেন অণু গঠন করে।

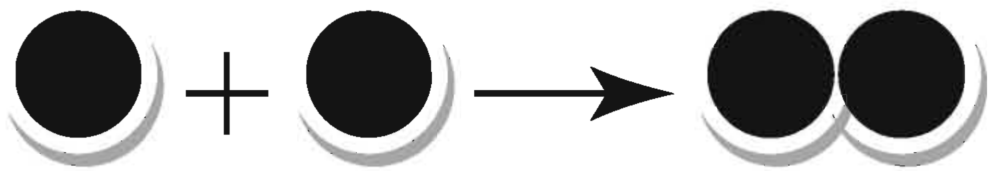

চিত্র-৬.৪

অন্যভাবে বলা যায়, অক্সিজেন নামের মৌলিক পদার্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু দ্বারা গঠিত। আবার অক্সিজেনের একটি অণুকে ভাঙলে অক্সিজেনের দু'টি পরমাণু পাওয়া যাবে।

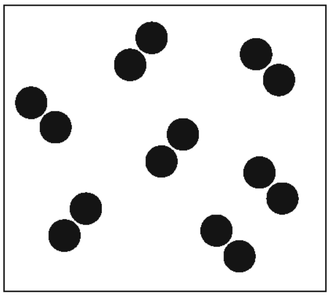

চিত্র-৬.৫ : একটি পাত্রে অক্সিজেন গ্যাস। অণুগুলো মুক্ত অবস্থায় আছে

এবার একটি যৌগিক পদার্থ পানির কথা বিবেচনা করি। একটি পাত্রে কয়েক ফোঁটা পানি নিয়ে একে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করতে থাকি। ধরা যাক, এক পর্যায়ে আমরা ছোট্ট এক ফোঁটা পানি পাবো। সেই এক ফোঁটা পানিও অসংখ্য কণার সমষ্টি। এক পর্যায়ে হয়তো আমরা একটিমাত্র পানির কণা পাবো যেটি যুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে এরকম কণাতে পানির বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। এই ক্ষুদ্র কণাঠি হলো পানির অণু।

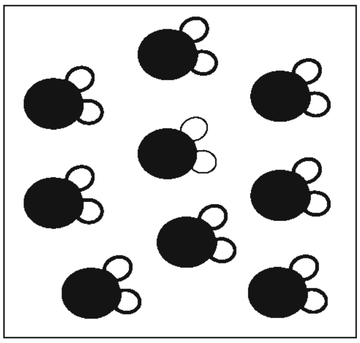

চিত্র-৬.৬ : পানি আসলে পানির অণুর সমষ্টি

একটি পানির অণুকে ভাঙলে আরও ক্ষুদ্র কণা পাওয়া যায়, তবে সেগুলো স্বাধীনভাবে থাকতে পারে না। সেগুলো পানির বৈশিষ্ট্যও ধারণ করে না। আসলে তারা আর পানির কণা থাকে না। একটি পানির অণুকে ভাঙলে একটি অক্সিজেন পরমাণু ও দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু পাওয়া যায়। অন্যভাবে বলা যায় একটি অক্সিজেন পরমাণু ও দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত হয়ে একটি পানির অণু গঠন করেছে।

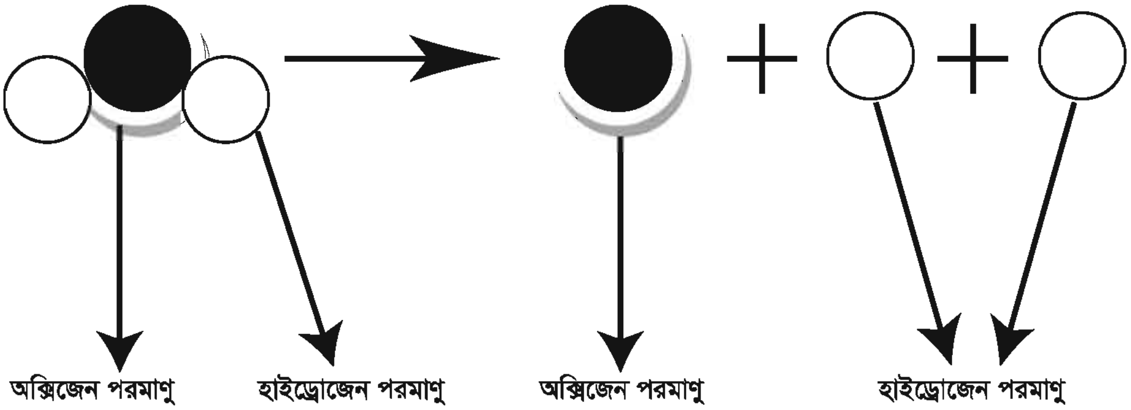

চিত্র-৬.৭

কাজ: গোলাকার সহজলভ্য কোন বস্তু বা কাঁদামাটির তৈরি মার্বেল ও কাঠি দিয়ে পানি ও অক্সিজেন অণুর মডেল তৈরি কর।

তাহলে পরমাণু ও অণুর পার্থক্য ও সর্ম্পক বোঝা গেল?

পরমাণু নামক ক্ষুদ্র কণা দ্বারা পদার্থ গঠিত। এরা স্বাধীন অবস্থায় থাকতে পারে না। দুই বা ততোধিক পরমাণু মিলে অণু গঠন করে। একই ধরনের পরমাণু মিলে মৌলিক পদার্থের অণু গঠন করে। আর দুই বা ততোধিক পদার্থের পরমাণু মিলে যৌগিক পদার্থের অণু গঠন করে। অণু স্বাধীনভাবে থাকতে পারে।

পাঠ ৬: পরমাণু ও প্রতীক

আগের পাঠে তোমরা জেনেছ যে, ভিন্ন ভিন্ন মৌলের পরমাণু ভিন্ন ভিন্ন হয়। এখন প্রশ্ন হলো, সর্বমোট কতগুলি মৌল বা মৌলিক পদার্থ আছে অথবা কত রকমের পরমাণু আছে? এ পর্যন্ত ১১৮টি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে যার মধ্যে ৯৮টি প্রকৃতিতে পাওয়া যায় আর বাকী ২০টি কৃত্রিমভাবে তৈরি মৌলিক পদার্থ। প্রতিটি মৌলিক পদার্থেরই একটি নাম আছে। আর এদেরকে সংক্ষিপ্ত ও সুবিধাজনকভাবে প্রকাশের জন্যই আমরা প্রতিটির জন্য আলাদা প্রতীক ব্যবহার করি। প্রতীক সাধারণত মৌলের ল্যাটিন, গ্রিক বা ইংরেজি নামের একটি বা দুটি আদ্যক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা হয়। একটি অক্ষর দিয়ে প্রকাশিত প্রতীকের ক্ষেত্রে সর্বদাই বড় হাতের অক্ষর আর দুটি অক্ষর দিয়ে প্রকাশিত প্রতীকের ক্ষেত্রে প্রথমটি বড় হাতের অক্ষর এবং পরেরটি ছোট হাতের অক্ষর হয়। নিচে কয়েকটি পরমাণুর প্রতীক ও তাদের ইংরেজী, গ্রীক বা ল্যাটিন নাম দেয়া হলো।

পরমাণু	প্রতীক	ইংরেজী, গ্রীক বা ল্যাটিন নাম
হাইড্রোজেন	H	Hydrogen
হিলিয়াম	He	Helium
লিথিয়াম	Li	Lithium
বেরিলিয়াম	Be	Beryllium
বোরন	B	Boron
কার্বন	C	Carbon
নাইট্রোজেন	N	Nitrogen
অক্সিজেন	O	Oxygen
ফ্লোরিন	F	Fluorine
লোহা	Fe	Ferrum

পাঠ ৭ ও ৮ : অণু ও সংকেত

আমরা শিখেছি যে, দুই বা ততোধিক পরমাণু একত্রে যুক্ত হয়ে অণু তৈরি করে। একটি অণুতে কী কী পরমাণু আছে সেটা জানা যায় সংকেত থেকে। আসলে অণুর সংক্ষিপ্ত প্রকাশই হলো সংকেত । একটি অণু যে যে মৌলের পরমাণু দিয়ে গঠিত সেসব মৌলের প্রতীক দিয়ে সংকেত লেখা হয় । আমরা এখন সংকেত লেখার নিয়ম ও সংকেত থেকে কী বোঝা যায় সে সম্পর্কে জানবো ।

মৌলিক পদার্থের সংকেত :

কঠিন বা তরল মৌলিক পদার্থের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ দেখা যায় অনেক পরমাণু একসাথে থাকে, কোন অণু গঠন করে না । তাই এ ধরনের মৌলের ক্ষেত্রে অণুর সংকেত লেখা হয় না । যেমন- সোডিয়াম, লোহা, কপার ইত্যাদি । তবে গ্যাসীয় মৌলসমূহের ক্ষেত্রে সাধারণত দুটি পরমাণু যুক্ত হয়ে অণু গঠন করে । এজন্য তাদের সংকেত লেখা হয় প্রতীকের নিচে ডানপাশে ছোট করে ২ লিখে । যেমন অক্সিজেনের সংকেত O_2, নাইট্রোজেনের সংকেত N_2 । তবে কিছু কিছু তরল ও কঠিন মৌলের ক্ষেত্রেও দুটি পরমাণু যুক্ত হয়ে অণু গঠন করে । তাদেরও সংকেত লেখা হয় প্রতীকের নিচে ডানপাশে ছোট করে ২ লিখে । যেমন-ব্রোমিন (তরল) এর সংকেত Br_2 । নিচে কিছু মৌলের সংকেত দেয়া হলো

মৌল	প্রতীক	সংকেত
হাইড্রোজেন	H	H_2
নাইট্রোজেন	N	N_2
অক্সিজেন	O	O_2
ফ্লোরিন	F	F_2
ক্লোরিন	C1	$C1_2$
ব্রোমিন	Br	Br_2
আয়োডিন	I	I_2

যৌগিক পদার্থের সংকেত :

যৌগিক পদার্থের সংকেত থেকে বোঝা যায় যৌগটি কী কী মৌল ও পরমাণুগুচ্ছ দিয়ে এবং কী অনুপাতে তৈরি। যেমন পানির সংকেত H_2O থেকে বোঝা যায় একটি পানির অণু দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটি অক্সিজেন পরমাণু থেকে তৈরি। নিচের ছক থেকে আমরা দেখবো কীভাবে সংকেত থেকে বোঝা যায় যৌগটি কী কী দিয়ে তৈরি।

যৌগের নামের বৈশিষ্ট্য	সংকেত	নাম	যে যে মৌলের পরমাণু ও পরমাণুগুচ্ছ দিয়ে তৈরি
ধাতুর (কিছু ক্ষেত্রে অধাতু) সাথে একটি অধাতু যুক্ত হলে যৌগের নামের শেষে আইড থাকে।	$NaCl$ CaO KI SO_2 CO_2	সোডিয়াম ক্লোরাইড ক্যালসিয়াম অক্সাইড পটাশিয়াম আয়োডাইড সালফার ডাইঅক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড	সোডিয়াম ও ক্লোরিন ক্যালসিয়াম ও অক্সিজেন পটাশিয়াম ও আয়োডিন সালফার ও অক্সিজেন কার্বন ও অক্সিজেন
একটি অধাতু ও কয়েকটি অক্সিজেন মিলে একটি পরমাণুগুচ্ছ তৈরি করে যা একটিমাত্র পরমাণুর মত কাজ করে। ঐ পরমাণুগুচ্ছ ধাতুর সাথে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করলে তাদের নামের শেষে আইট বা এট থাকে।	$CaSO_4$ $CaSO_3$ KNO_3 KNO_2 $Na_2(CO_3)$ $AlPO_4$	ক্যালসিয়াম সালফেট ক্যালসিয়াম সালফাইট পটাশিয়াম নাইট্রেট পটাশিয়াম নাইট্রাইট সোডিয়াম কার্বনেট অ্যালুমিনিয়াম ফসফেট	ক্যালসিয়াম ও সালফেট ক্যালসিয়াম ও সালফাইট পটাশিয়াম ও নাইট্রাট পটাশিয়াম ও নাইট্রাইট সোডিয়াম ও কার্বনেট অ্যালুমিনিয়াম ও ফসফেট

পরবর্তী শ্রেণিতে তোমরা যৌগিক পদার্থের সংকেত লেখার নিয়ম সম্পর্কে জানবে।

পাঠ ৯ : পরমাণুর কণা

পরমাণু আকারে খুবই ছোট। এতই ছোট যে, খালি চোখে এদের দেখা যায় না। এমনকি সাধারণ মাইক্রোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যেও না। তবে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে পরমাণু দেখা যায়। এখানে উল্লেখ্য যে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে কোনো জিনিসকে তার আকারের তুলনায় কয়েক মিলিয়ন গুণ বড় দেখা যায়।

এখন প্রশ্ন হলো, এত ছোট পরমাণুকে ভেঙে কি আরও ক্ষুদ্রতর কোনো কণা পাওয়া যায়?

ডাল্টনের পরমাণুবাদ অনুযায়ী, পরমাণু অবিভাজ্য অর্থাৎ একে আর ভাঙা যায় না। ডাল্টনের এই মতটি অনেকদিন পর্যন্ত সবাই সমর্থন করলেও এখন এটি প্রমাণিত সত্য যে, পরমাণুকে ভেঙে আরও ক্ষুদ্র কণায়

পরিণত করা যায়। পরমাণু ভেঙে যে তিনটি কণা পাওয়া যায় তা হলো ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন। আধুনিক গবেষণায় এটি প্রমাণিত যে, পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউট্রন ও প্রোটন আর কেন্দ্রের চারদিকে বৃত্তাকার কক্ষপথে ইলেকট্রন ঘুরতে থাকে। সাধারণত একই ধরনের একটি পরমাণুতে সমানসংখ্যক ইলেকট্রন ও প্রোটন থাকে ।

এখানে উল্লেখ্য যে একমাত্র হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রে কোনো নিউট্রন থাকে না, অর্থাৎ হাইড্রোজেন পরমাণু ভাঙলে এর কেন্দ্রে একটি প্রোটন ও বাইরে একটি ইলেকট্রন পাওয়া যায়। অন্যদিকে হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে ২টি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন আর বাইরে থাকে ২টি ইলেকট্রন। আবার অক্সিজেন পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে ৮টি প্রোটন ও ৮টি নিউট্রন আর বাইরে থাকে ৮টি ইলেকট্রন।

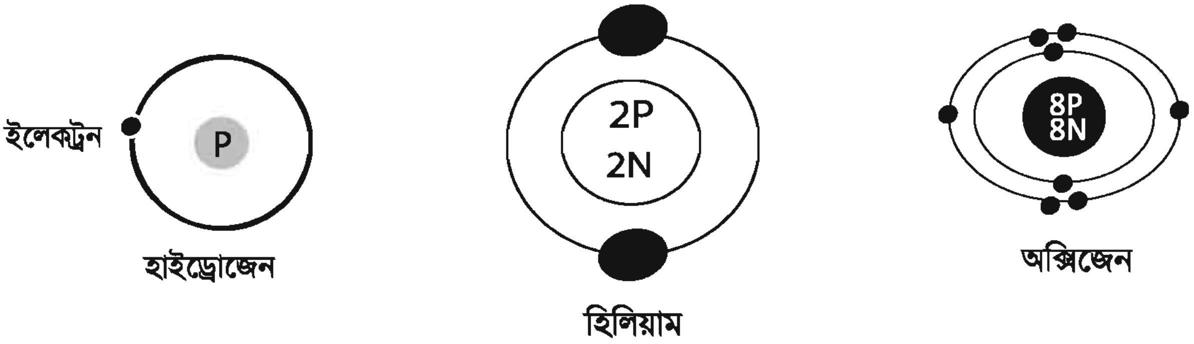

চিত্র-৬.৮ : পরমাণুর গঠন

পাঠ ১০ ও ১১: সার্বজনীন দ্রাবক হিসেবে পানির ব্যবহার

ষষ্ঠ শ্রেণীতে তোমরা জেনেছ যে, পানি একটি সার্বজনীন দ্রাবক। কারণ, এটি জৈব ও অজৈব অনেক দ্রবকে দ্রবীভূত করে যা অন্য দ্রাবকের পক্ষে সম্ভব নয়। এবার তাহলে দেখা যাক পানি সত্যিকার অর্থেই সার্বজনীন দ্রাবক কিনা।

কাজ: সার্বজনীন দ্রাবক হিসেবে পানির ব্যবহার প্রদর্শন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ: পানি, টেস্টটিউব, নানা রকম পদার্থ (যেমন– খাবার লবণ, খাবার সোডা, টেস্টিং সল্ট, বিট লবণ, ফিটকিরি, চিনি, ভিনেগার, স্পিরিট, ভিটামিন সি ট্যাবলেট, গ্লুকোজ ইত্যাদি)

পদ্ধতি: টেস্টটিউবে ৫ মিলিলিটারের মতো পানি নাও। কিছু খাবার লবণ যোগ করে ভালোভাবে ঝাকাও। লবণ কি পানিতে দ্রবীভূত হয়ে গেল? হ্যাঁ, ঠিক তাই। একই ভাবে একে একে উপরে উল্লেখিত প্রতিটি দ্রব নিয়ে দেখ এরা পানিতে দ্রবীভূত হয় কিনা। প্রতিটি দ্রব বা পদার্থই পানিতে দ্রবীভূত হচ্ছে। উল্লেখিত পদার্থের মধ্যে খাবার লবণ, খাওয়ার সোডা, টেস্টিং সল্ট, বিট লবণ, ফিটকিরি হলো অজৈব পদার্থ কিন্তু চিনি, ভিনেগার, স্পিরিট, ভিটামিন সি ট্যাবলেট, গ্লুকোজ হলো জৈব পদার্থ। তাহলে এটি প্রমাণিত হলো যে, পানি জৈব ও অজৈব অনেক পদার্থকে দ্রবীভূত করতে পারে অর্থাৎ পানি একটি সার্বজনীন দ্রাবক।

এবার তোমরা পানির বদলে অন্য একটি দ্রাবক যেমন–স্পিরিট নিয়ে উপরে উল্লেখিত প্রতিটি দ্রব নিয়ে পরীক্ষা করে দেখ এগুলো স্পিরিটে দ্রবীভূত হয় কিনা। সবগুলো দ্রব কি স্পিরিটে দ্রবীভূত হচ্ছে?

না, হচ্ছে না। পানি ছাড়া বেশির ভাগ দ্রাবকই স্পিরিটের মতো কমসংখ্যক দ্রবকে দ্রবীভূত করে। তাই সেগুলো সার্বজনীন দ্রাবক নয়।

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের গঠন ভিন্ন ভিন্ন হয় আর তাই এদের ধর্মও ভিন্ন ভিন্ন হয়।
- মৌলিক পদার্থসমূহ একই ধরনের উপাদান দিয়ে তৈরি হয়।
- যৌগিক পদার্থসমূহ একের অধিক মৌলিক পদার্থ দিয়ে তৈরি হয়।
- মৌলিক পদার্থসমূহ পরমাণু নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দিয়ে গঠিত।
- ভিন্ন ভিন্ন মৌলের পরমাণুর আকার, ভর ও ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন।
- বিভিন্ন মৌলের পরমাণুসমূহ সরল অণুপাতে যুক্ত হয়ে যৌগিক পদার্থ বা যৌগ তৈরি করে।
- যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণাকে অণু বলা হয় ।
- পরমাণু ভাঙ্গলে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন পাওয়া যায় ।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. মৌলিক পদার্থ ___________ উপাদান দিয়ে তৈরি।
২. লবণ ও চিনি ____________ পদার্থ।
৩. মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণার নাম ____________।
৪. _____________ হলো যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা।
৫. পরমাণুর কেন্দ্রে ___________ থাকে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ বলতে কী বোঝ?
২. অণু ও পরমাণুর মধ্যে পার্থক্য উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
৩. ডাল্টনের পরমাণুবাদের মূল বক্তব্য কী?
৪. পরমাণু ভেঙে কী কী কণা পাওয়া যায়? এরা পরমাণুর কোথায় অবস্থান করে?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি মৌলিক অণু?

ক. Na খ. Ne গ. N_2 ঘ. NO

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

পদার্থ	প্রতীক	সংকেত
১		Cl_2
২	Al	
৩		O_3
৪	F	
৫		NH_3
৬		NaOH
৭	Cu	

২. উপরের ছকে প্রতীক ও সংকেতের মাধ্যমে প্রকাশিত একই ধর্মের মৌল কোনগুলো?

ক. ২, ৪

খ. ১, ৩

গ. ১, ৪

ঘ. ২, ৬

৩. কোন পদার্থগুলোর পরমাণুর সংখ্যা সমান?

ক. ২, ৩

খ. ৩, ৪

গ. ৪, ৫

ঘ. ৩, ৬

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের ছকে তিনটি পদার্থ এবং তাদের গঠনকারী পরমাণু সংখ্যা উল্লেখ করা হলো।

পদার্থ	পরমাণুর সংখ্যা
১	Na –২টি Cl– ১টি
২	F – ২টি
৩	C – ১টি O –২টি

ক. হিলিয়ামের প্রতীক কী?

খ. কার্বন কেন মৌলিক পদার্থ? বর্ণনা কর।

গ. ১নং পদার্থটির সংকেতসহ রাসায়নিক নাম লেখ এবং গঠন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ছকের ২নং পদার্থ মৌলিক এবং ৩নং পদার্থ যৌগিক– ব্যাখ্যা কর।

২.

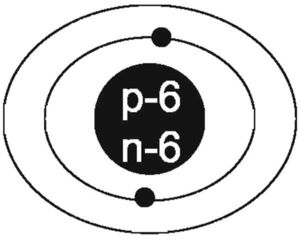

ক. পরমাণু কী?

খ. O এবং O_2 এর মধ্যে পার্থক্য কী?

গ. দ্বিতীয় কক্ষ পথে যে কয়টি ইলেকট্রন থাকবে তা বসিয়ে চিত্রটি আঁক।

ঘ. তোমার আঁকা চিত্রটির স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

সপ্তম অধ্যায়

শক্তির ব্যবহার

দৈনন্দিন জীবনে আমরা বিভিন্ন কাজের সাথে জড়িত। কাজের সাথে সম্পর্ক রয়েছে শক্তি ও ক্ষমতার। এছাড়া রয়েছে শক্তির বিভিন্ন রূপ এবং এদের এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরের প্রক্রিয়া। পাশাপাশি রয়েছে নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য শক্তির ব্যাপার। তেমনিভাবে শক্তির সংকট নিরসনে আমাদের শক্তির সংরক্ষণের পাশাপাশি বিকল্প শক্তির সন্ধান করতে হচ্ছে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- শক্তি ও কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শক্তির বিভিন্ন রূপ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শক্তির রূপান্তরের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারব।
- নবায়নযোগ্য শক্তির সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অনবায়নযোগ্য শক্তির সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শক্তির সংরক্ষণশীলতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শক্তির সংকট নিরসনের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আমাদের জীবনে শক্তির প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব।
- শক্তি ব্যবহারে নিজে সচেতন হবো এবং অন্যদের সচেতন করব।

পাঠ–১ : কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি

আমরা প্রথমে নিচের চিত্রগুলোর দিকে লক্ষ করি।

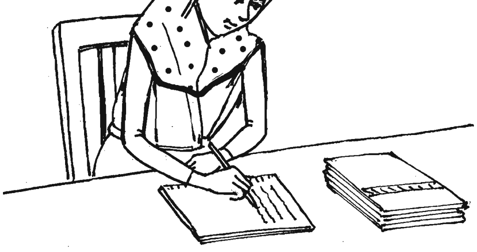
চিত্র-৭.১ : একজন শিক্ষার্থী পড়ছে

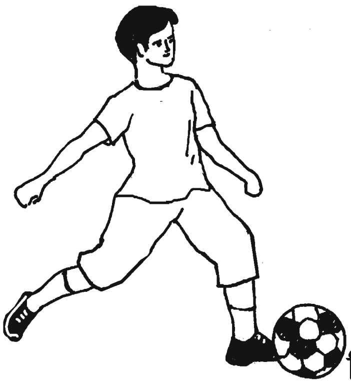
চিত্র-৭.২ : একজন ফুটবল খেলছে

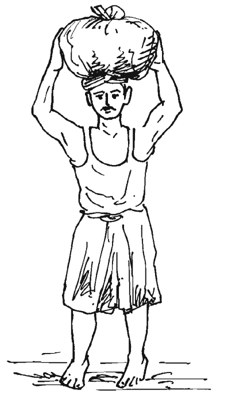
চিত্র-৭.৩ : একজন মাথায় একটি বোঝা নিয়ে দাড়িয়ে আছে

উপরের চিত্রগুলো দেখে কী মনে হচ্ছে? প্রথম ছবিতে যে শিক্ষার্থী পড়ছে, আসলে সে কি কোনো কাজ করছে? দ্বিতীয় ছবিতে যে ফুটবল খেলছে, সে কি কোনো কাজ করছে? আর তৃতীয় ছবিতে যে মাথায় বোঝা নিয়ে দাঁড়িয়ে সে কি কোনো কাজ করছে? সাধারণ অর্থে আমাদের কাছে উপরের প্রত্যেকটি উদাহরণকেই কাজ করা মনে হচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষায় কাজের একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ আছে। সহজ কথায়, কাজ তখনই হবে যখন কোন বস্তুর উপর বল প্রয়োগে তার অবস্থানের পরিবর্তন হবে। তাহলে উপরের উদাহরণ থেকে দেখা যায়, যে শিক্ষার্থী পড়ছে তার কোনো অবস্থান পরিবর্তন হচ্ছে না বা যে মাথায় বোঝা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারও কোনো অবস্থানের পরিবর্তন হচ্ছে না। ফলে বিজ্ঞানের ভাষায় এই দুই ক্ষেত্রে কোনো কাজ সংঘটিত হচ্ছে না। এখানে যে ফুটবল খেলছে তার অবস্থান পরিবর্তন হচ্ছে, ফলে সে কাজ করছে। বিজ্ঞানের ভাষায় আমরা বলতে পারি কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করে বস্তুটিকে বলের দিকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরানো হলে কাজ সম্পন্ন হয়। কাজের সাথে দুটি বিষয় সম্পর্কযুক্ত, একটি হলো বল এবং অপরটি হল বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন। বিজ্ঞানের ভাষায় কাজ হলো বল ও বস্তু কর্তৃক বলের দিকে অতিক্রান্ত দূরত্বের গুণফল।

একজন রিকশাচালককে রিক্সা চালিয়ে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যেতে কাজ করতে হয়। ধরা যাক, একই দূরত্ব যেতে একজন রিকশাচালকের ১০ মিনিট লেগেছে, আবার অন্যজনের লেগেছে ১৫ মিনিট । এখানে দুইজনের মধ্যে কাজ করার হার বেশি কার? তাড়াতাড়ি কাজ করার সাথে 'ক্ষমতা' ব্যাপারটি জড়িত। কোনো কাজ কে কত তাড়াতাড়ি করতে পারে তা দিয়ে তার ক্ষমতা বুঝা যায়। যে রিকশাচালকের কোন জায়গায় যেতে সময় কম লাগে, তার ক্ষমতা বেশি। অর্থাৎ আমরা ক্ষমতা পাই মোট কাজকে মোট সময় দিয়ে ভাগ করে।

কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটি ব্যাপার দেখা যাক । দুইজন শিক্ষার্থী সিদ্ধান্ত নিল যে তারা স্কুলের খেলার মাঠটিকে মোট পাঁচবার প্রদক্ষিণ করবে। শুরু করার কিছুক্ষণ পর দেখা গেল একজন দুবার প্রদক্ষিণ করে বসে পড়ল, আরেকজন পাঁচবারই প্রদক্ষিণ করল। এখানে আমরা কাজ করার সামর্থ্যকে বিবেচনা করব। এদের মধ্যে যে দুবার প্রদক্ষিণ করার পর বসে পড়ল, সে কাজ করার সামর্থ্য ফুরিয়ে ফেলল। আর যে পাঁচবারই প্রদক্ষিণ করল, তার কাজ করার সামর্থ্য বেশি। বিজ্ঞানের ভাষায় কাজ করার এই সামর্থ্যই হল শক্তি। এখানে দেখা যাচ্ছে যে কাজের সাথে শক্তি সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। শক্তি ও কাজ মূলত ভিন্ন কিছু নয়। কাজ করার জন্যই প্রয়োজন হয় শক্তির। যার যত বেশি শক্তি সে তত বেশি কাজ করতে পারে। এই কাজ এর পরিমাণ দিয়েই শক্তিকে পরিমাপ করা হয়। কাজের এককই হল শক্তির একক। শক্তির একক হলো জুল।

পাঠ–২ ও ৩ : শক্তির রূপ

আমাদের কাজ কারার সামর্থ্যের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয় তা আমরা কোথা থেকে পাই? এটা আমরা সকলেই হয়তো জানি যে পৃথিবীতে সকল শক্তির উৎসই হল সূর্য। তাছাড়া আমাদের চারপাশে রয়েছে শক্তির বিভিন্ন উৎস। যেমন তোমরা নিশ্চয় গ্যাস দিয়ে রান্না করতে দেখেছ। আবার দেখেছ কিভাবে তেলকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করছে। মূলত উভয় ক্ষেত্রেই আমরা গ্যাস বা তেলকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে শক্তির জোগান দিয়েছি। এখন আমরা বিভিন্ন প্রকার শক্তির রূপ নিয়ে কথা বলব।

যান্ত্রিক শক্তি

মনে কর তুমি দৌড়াচ্ছ বা একটি গাড়ি চলছে। এই দুই ক্ষেত্রেই গতি আনতে কাজ করতে হচ্ছে। আবার তুমি একটি ইট নিচ থেকে উপরে উঠিয়ে ছেড়ে দিলে অথবা গুলতি দিয়ে একটি আম পাড়ার চেষ্টা করছ। এখানে তুমি ইটটিকে উপরে উঠানোর পর এতে যে শক্তি সঞ্চিত হয়েছে, তার দ্বারা ইটটি আপনা আপনি নিচে পড়ে গেল। আবার গুলতিকে প্রথমে পিছনে টানার পর যে শক্তি সঞ্চিত হয়েছে, তা দিয়েই গুলতির পাথরটি দ্রুত গিয়ে আমটিকে আঘাত করে। এই যে দৌড়ানো, গাড়ি চলা, ইট উঠানো বা গুলতি দিয়ে আম পাড়া এর প্রত্যেকটির সাথেই এক ধরনের শক্তির সম্পর্ক রয়েছে। এই বিশেষ ধরনের শক্তিই হল যান্ত্রিক শক্তি। যদিও এতে স্থিতি শক্তি ও গতি শক্তি ব্যাপারটি আলাদাভাবে জড়িত। গতির জন্য কাজ করার সামর্থ্য হল গতি শক্তি। যেমন, দৌড়ানো বা গাড়ি চালানো। আবার কোনো বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তনের জন্য সঞ্চিত শক্তি হল স্থিতি শক্তি। যেমন ইট উপরে উঠানো বা গুলতি দিয়ে আম পাড়া।

রাসায়নিক শক্তি

খাদ্যে বা জ্বালানিতে যে শক্তি জমা থাকে তাকে রাসায়নিক শক্তি বলে। আমাদের দেহের জন্য প্রয়োজনীয় তাপ ও গতি শক্তি আমরা খাদ্যে সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তি থেকে শ্বসনের মাধ্যমে পাই। পেট্রোল, গ্যাস,

কাঠ, কয়লা ইত্যাদি সব কিছুরই রয়েছে রাসায়নিক শক্তি। আমরা টর্চ বাতি বা রেডিওতে যে ব্যাটারি ব্যবহার করি তার মধ্যেও রয়েছে রাসায়নিক শক্তি।

তাপ শক্তি

রান্না করতে, মোটর গাড়ি বা রেলগাড়ির ইঞ্জিন চালাতে যে শক্তি ব্যবহার করা হয় তাকে বলে তাপ শক্তি। কয়লা, গ্যাস, কাঠ, পেট্রোল বা ডিজেল পুড়িয়ে এই শক্তি পাওয়া যায়। আবার সূর্য থেকেও সরাসরি তাপ আসে। এই তাপ শক্তি পৃথিবীকে উষ্ণ রাখে। তাপ শক্তি ছাড়া কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ বেঁচে থাকতে পারতো না।

চুম্বক শক্তি

শক্তির আরেক রূপ হচ্ছে চুম্বক শক্তি। এই শক্তি দিয়েই কোনো চুম্বক একটি লোহার বস্তুকে আকর্ষণ করে।

আলোক শক্তি

তাপ শক্তির সাথে সূর্য থেকে সরাসরি আর যে শক্তিটি আসে তা হচ্ছে আলোক শক্তি। আলোক শক্তি ছাড়া আমরা কিছুই দেখতে পারি না। সূর্য আলোক শক্তির প্রধান উৎস। আগুন ও বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালালেও আমরা আলোক শক্তি পাই।

শব্দ শক্তি

আমরা যখন কথা বলি, গান করি বা বাঁশি বাজাই, তখন এক ধরনের শক্তি উৎপন্ন করি। এর নাম শব্দ শক্তি। শব্দ শক্তির সাহায্যেই আমরা একে অপরের কথা শুনতে পাই। টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশনে শব্দ শক্তি ব্যবহার করা হয়। পদার্থের কম্পন থেকে শব্দের উৎপত্তি হয়।

বিদ্যুৎ শক্তি

শক্তির একটি অতি পরিচিত এবং প্রয়োজনীয় রূপ হচ্ছে বিদ্যুৎ শক্তি। বিদ্যুৎ শক্তি দিয়ে আমরা বাতি জ্বালাই, পাখা চালাই। কল–কারখানা বিদ্যুৎ শক্তি দিয়ে চলে। অনেক দেশে রেলগাড়িও বিদ্যুৎ দিয়ে চালে। বিদ্যুৎ শক্তি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় তারের সাহায্যে নিয়ে যাওয়া যায়।

পারমাণবিক শক্তি

আমরা জানি যে, পদার্থ পরমাণু দিয়ে গঠিত। পরমাণুর কেন্দ্রে কণিকাসমূহ অত্যন্ত শক্তিশালী বল দ্বারা একত্রে অবস্থান করে। শক্তি প্রয়োগে কণিকাসমূহকে বিচ্ছিন্ন করে পাওয়া যায় পারমাণবিক শক্তি। এরা পরমাণুর অভ্যন্তরে অত্যন্ত শক্তিশালী বল দিয়ে একত্রে বাঁধা রয়েছে। এই শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে আমাদের কাজে লাগানো যায়।

পাঠ–৪ ও ৫ : শক্তির রূপান্তর

আমরা আগেই জেনেছি মহাবিশ্বে শক্তি বিভিন্ন রূপে বিরাজ করে এবং এই বিভিন্ন রূপ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। আমরা নিচের চিত্রটি খেয়াল করি।

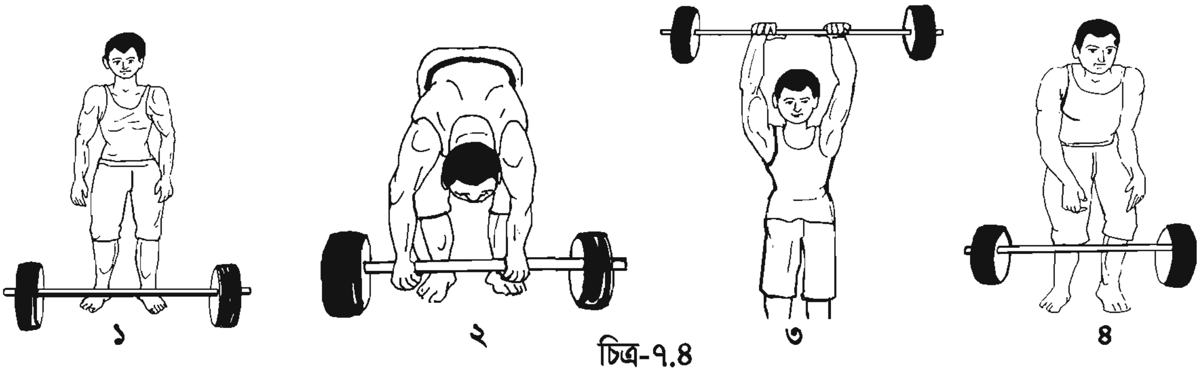

চিত্র-৭.৪

উপরের চিত্রানুসারে একজন ভার উত্তোলক বিভিন্ন খাবার গ্রহণের ফলে তার খাবারগুলো প্রথমে রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত হয়। পরবর্তীতে তিনি যখন ভারটিকে উঠাতে চেষ্টা করছেন তখন সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তি গতি শক্তিতে পরিবর্তিত হতে থাকে। এরপর তিনি যখন ক্রমশ ভারটিকে মাথায় তুলছেন তার গতিশক্তি ক্রমশ: স্থিতি শক্তিতে পরিণত হতে থাকে। আবার যখন তিনি ভারটিকে নিচে ফেলে দিচ্ছেন তখন স্থিতি শক্তি গতি, শব্দ ও তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। কারণ ভার মাটিতে পড়ার সাথে শব্দ উৎপন্ন হয় এবং ভারটিতে হাত দিয়ে স্পর্শ করলে দেখা যাবে সেটি গরম লাগছে। অর্থাৎ আমাদের শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রমে নানাবিধ শক্তির রূপান্তর ঘটছে।

এভাবেই শক্তির বিভিন্ন রূপ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত থাকে।

নিম্নে শক্তির রূপান্তরের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল:

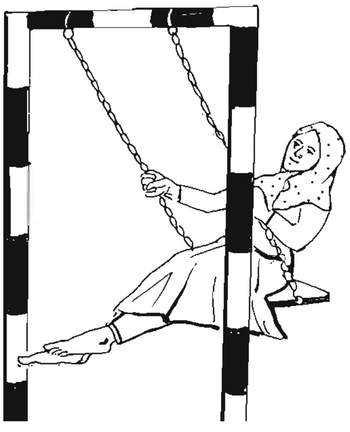

চিত্র-৭.৫ : দোলনায় দোল খাওয়া

যান্ত্রিক শক্তির রূপান্তর

হাত দিয়ে শরীরের অন্য কোনো অংশ ঘষলে গরম অনুভূত হয়। এতে যান্ত্রিক শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। বাঁশি বাজালে

যান্ত্রিক শক্তি শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এক খন্ড পাথরের উপর একটি ধাতব দন্ড দ্বারা জোরে আঘাত করলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হতে দেখা যায় এবং এক ধরনের শব্দেরও সৃষ্টি হয়। ধাতব দন্ড ও পাথর খন্ডটি খানিকটা উত্তপ্ত হয়। এক্ষেত্রে যান্ত্রিক শক্তি তাপ, শব্দ ও আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। ঢেঁকি দিয়ে ধান ভানার সময় এতে যান্ত্রিক শক্তি শব্দ ও তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। একইভাবে দোলনার স্থিতি ও গতিশক্তির রূপান্তর ঘটে থাকে।

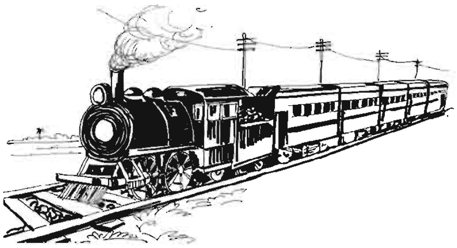

চিত্র-৭.৬ : ইঞ্জিনসহ রেলগাড়ি

তাপ শক্তির রূপান্তর

বাষ্পীয় ইঞ্জিনে তাপের সাহায্যে উৎপন্ন শক্তি ব্যবহার করে রেলগাড়ি চালানো হয়। এখানে তাপ শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

আলোক শক্তির রূপান্তর

ফটোগ্রাফিক কাগজের উপর আলোর ক্রিয়ার ফলে আলোকশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সূর্যের আলোকে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি যেমন পকেট ক্যালকুলেটর, রেডিও ও ইলেকট্রনিক ঘড়িতে সৌর শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে ব্যবহার করা হয়।

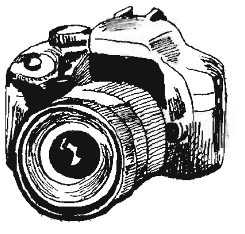

চিত্র-৭.৭ : ডিজিটাল ক্যামেরা

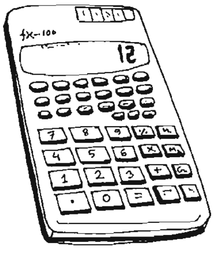

চিত্র-৭.৮: ক্যালকুলেটর

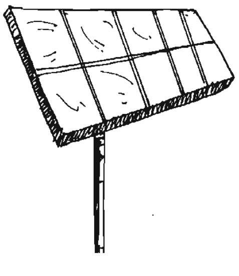

চিত্র-৭.৯: সোলার প্যানেল

শব্দ শক্তির রূপান্তর

শব্দোত্তর তরঙ্গ দ্বারা জামা কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করা হয়। এসব ক্ষেত্রে শব্দ শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। অনুনাদের সময় শব্দ শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। আবার টেলিফোন ও রেডিওর প্রেরক যন্ত্রে শব্দ শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে পরিণত করে।

চিত্র-৭.১০ : একজন টেলিফোন করছে অন্যজন শুনছে

চৌম্বক শক্তির রূপান্তর

লোহাকে দ্রুত ও বারবার চুম্বক এবং বিচুম্বকরনকালে তাপ উৎপন্ন হয়। এতে চৌম্বক শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। তাছাড়া তড়িৎ চুম্বকের সাহায্যে ভারী জিনিসপত্র উঠানো যায়। এতে চৌম্বক শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

বিদ্যুৎ শক্তির রূপান্তর

বৈদ্যুতিক ইস্ত্রিতে বিদ্যুৎ চালনা করলে তাপ উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে বিদ্যুৎ শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। বৈদ্যুতিক পাখার মধ্যদিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে পাখা ঘুরতে থাকে। এক্ষেত্রে বিদ্যুৎ শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। বিদ্যুৎ শক্তি হতে আমরা আলো পাই।

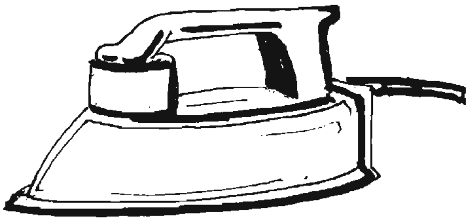

চিত্র-৭.১১ : ইস্ত্রি

রাসায়নিক শক্তির রূপান্তর

কয়লা পোড়ালে তাপ উৎপন্ন হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলেও তা ঘটে। এক্ষেত্রে রাসায়নিক শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সাধারণত বিদ্যুৎ কোষে রাসায়নিক দ্রব্যের বিক্রিয়ার ফলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে রাসায়নিক শক্তি বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এছাড়া কয়লা, পেট্রোল, কেরোসিন, গ্যাস পুড়িয়ে রাসায়নিক শক্তিকে তাপ ও আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়।

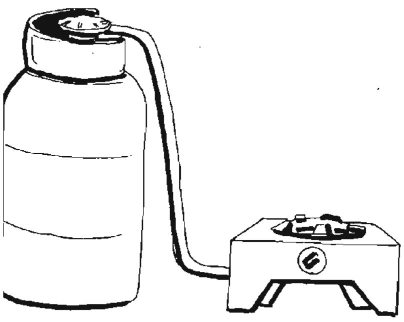

চিত্র- ৭.১২ : গ্যাস চুল্লি

পারমাণবিক শক্তির রূপান্তর

পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে পারমাণবিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়।

পাঠ–৬ : শক্তির সংরক্ষণশীলতা

মনে কর তুমি স্কুলের মাঠে দাঁড়িয়ে একটি টেনিস বলকে উপরের দিকে ছুড়ে মারলে। কী দেখছ? টেনিস বলটি একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় উঠার পর এটি আবার নিচে নামতে থাকে। এখানে টেনিস বলটি উপরে উঠতে থাকার সময় এর গতিশক্তি কমতে থাকে এবং স্থিতিশক্তি বাড়তে থাকে। যখন এর গতিশক্তি শূন্য হয়ে যায় তখন এটি পুনরায় এর মধ্যে স্থিতিশক্তির কারণে নিচে নামতে থাকে। দেখা যাবে, বস্তু যতই নিচের দিকে নামতে থাকে ততই এর স্থিতিশক্তি কমে গতিশক্তি বাড়তে থাকে এবং স্থিতিশক্তি গতি শক্তিতে পরিণত হয়। টেনিস বলটি যখন মাটি স্পর্শ করে এবং স্থির হয় তখন তার সমস্ত গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তি শব্দ, তাপ, আলোক ইত্যাদি শক্তিতে পরিণত হয়। আমরা তাপ বা আলোকের তেমন প্রমাণ বুঝতে না পারলেও বলটি মাটিতে স্পর্শ করায় যে শব্দ উৎপন্ন হয় তা শুনতে পাই। তবে কোন কোনো

ক্ষেত্রে টেনিস বলের পরিবর্তে একটি পাথর উপরে ছুড়ে মারলে এটি যদি কোনো মাঠে পড়ে তবে কোনো না কোনো ক্ষেত্রে পাথরটি গরম অনুভূত হতে পারে।

এতক্ষণ তোমরা জেনেছ যে শক্তি কিভাবে একরূপ থেকে অন্যরূপে পরিবর্তিত হয়। তোমাদের মনে একটা প্রশ্ন জাগতেই পারে যে, এই রূপান্তরের সময় শক্তির কি কোনো অপচয় হয় না? বিস্ময়কর হলেও এটা সত্য যে শক্তির রূপান্তরের পুর্বে বা পরে মোট শক্তির পরিমাণ সমান থাকে। প্রকৃতপক্ষে আমরা কোনো নতুন শক্তি সৃষ্টি করতে পারিনা, এমনকি শক্তি ধ্বংস করতেও পারিনা। অর্থাৎ বিশ্বের সামগ্রিক শক্তির কোনো তারতম্য ঘটে না। এই বিশ্ব সৃষ্টির প্রথম মুহূর্তে যে পরিমাণ শক্তি ছিল,
বর্তমান। এটাই হলো শক্তির নিত্যতা বা সংরক্ষণশীলতা।

পাঠ–৭, ৮ ও ৯ : নবায়নযোগ্য শক্তি

আমরা বিভিন্ন শক্তির উৎস থেকে শক্তি পাই। এসব শক্তির উৎস দু'ধরনের: নবায়রযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য। নবায়নযোগ্য নাম থেকে তোমরা সহজেই বুঝতে পারবে এর অর্থ কী বুঝায়। যা কিছু নবায়ন করা যায়। এক্ষেত্রে কোনো জিনিস ব্যবহার করে শক্তি উৎপাদন করে পুনরায় ঐ জিনিসটি দ্বারা আবার শক্তি উৎপাদন করা যায়। অর্থাৎ যে শক্তির উৎসকে বারবার ব্যবহার করা যায় তাই হলো নবায়নযোগ্য শক্তি। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো সূর্যরশ্মি, বায়োগ্যাস, পানি, বায়ুপ্রবাহ, পানির জোয়ার ভাটা ইত্যাদি।

নিম্নে আমরা বায়োগ্যাস, সৌর শক্তি, পানির জোয়ার–ভাটা এবং বায়ুপ্রবাহ হতে নবায়নযোগ্য শক্তির উপাদান সম্পর্কে ধারণা লাভ করব।

বায়োগ্যাস (উদ্ভিজ ও প্রাণীজ)

গরু, ছাগল, ঘোড়া ও মহিষের বিষ্ঠা জ্বালানি হিসাবে বহু প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রাণীর এসব বিষ্টা শক্তির এক প্রকার উৎস। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শুকনো গোবর পুড়িয়ে তাপশক্তি উৎপন্ন করা হয়। বায়োগ্যাসে যে সকল উপাদান বা বর্জ্য পদার্থ ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে অন্যতম হলো গরু, শূকর এবং মুরগী হতে প্রাপ্ত বর্জ্য, শস্য পরিত্যক্ত উদ্ভিদ ইত্যাদি। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র প্রাণিজ বা কেবলমাত্র উদ্ভিদজ উপকরণ অথবা উভয় প্রকারের মিশ্রণও ব্যবহার করতে পার। শূকর বা মুরগি রাখার জায়গা থেকে মলমিশ্রিত যে কাঁচা খড় পাওয়া যায়, সেগুলো বয়োগ্যাস তৈরির উপযুক্ত প্রাণিজ সার ও উদ্ভিজ্জ উপকরণের ভালো মিশ্রণ। তবে এগুলো ব্যবহারের সময় ছোট ছোট টুকরা করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে আরম্ভ করার সময় ব্যবহারের আগে শুকনো উদ্ভিজ্জ উপকরণগুলো খুব ছোট ছোট করে কেটে অথবা পিষে খোসা বের করে নিতে হয়। আর টাটকা উদ্ভিজ্জগুলো অন্তত দশদিন বাইরে পঁচতে দিতে হবে।

বায়ুপ্রবাহ

আদিম মানুষ ভয় পেত বায়ুপ্রবাহ। সভ্যতার বিকাশ ও বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ফলে এই বায়ু প্রবাহকে মানুষ বর্তমানে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করছে। আদিম মানুষ চার–পাঁচটা পাখার সাহায্যে চক্র বানিয়ে বাতাসের সাহায্যে চক্র ঘুরাত। চক্রের ঘর্ষণ কাজে লাগিয়ে মানুষ কুয়া থেকে পানি তোলা, কৃষিসেচ, যব অথবা গম ভাঙানো, আখ মাড়াই, ধানকাটা, খড় কাটা ইত্যাদি কাজ করত। পরে মানুষ বাতাসকে কাজে লাগিয়ে কাঠ চেরাইয়ের মত কঠিন কাজও সম্পন্ন করেছে। পৃথিবীর বহু অঞ্চলের মানুষ আগে এ ধরনের কাজে বড় বড় চক্রাকার এক ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করত। যা বর্তমানে হাওয়া বা বায়ুকল বা উইন্ডমিল নামে পরিচিত। উইন্ডমিল চালিয়ে বহুদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে।

পানির জোয়ার ভাটা

নদী বা সমুদ্রের পানির জোয়ার–ভাটার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন যন্ত্র চালনার ব্যাপারটি অনেক দিন আগেই উদ্ভাবিত হয়েছে। কিন্তু জোয়ার–ভাটার শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরের ব্যাপারটি খুব বেশি দিনের নয়। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জোয়ার–ভাটার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তড়িৎ উৎপাদনের চেষ্টা চলছে।

সৌরশক্তি

সূর্য থেকে যে শক্তি পাওয়া যায় তাকে বলা হয় সৌরশক্তি। আমরা জানি সূর্য সকল শক্তির উৎস। পৃথিবীতে যত শক্তি আছে তার সবই কোনো না কোনোভাবে সূর্য থেকে আসা বা সূর্য কিরণ ব্যবহৃত হয়েই তৈরি হয়েছে। যেমন আধুনিক সভ্যতার ধারক জীবাশ্ম জ্বালানি আসলে বহুদিনের সঞ্চিত সৌরশক্তি।

কাজ: সৌরশক্তি থেকে তাপ শক্তি উৎপন্ন করা

প্রয়োজনীয় উপকরণ: আতশি কাচ/ধাতব চাকতি

পদ্ধতি: প্রথমে একটি আতশি কাচ নাও। আতশী কাচে সাধারণত একটি উত্তল লেন্স থাকে। লেন্সের সাহায্যে সূর্যরশ্মিকে কাগজের টুকরার উপর ফোকাস কর। দেখবে যথাযথ ফোকাস করলে আগুন জ্বলে উঠবে।

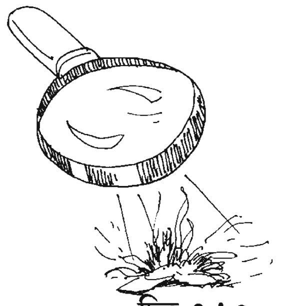

চিত্র-৭.১৩

এছাড়া সৌর শক্তিকে শীতের দেশে ঘরবাড়ি গরম রাখার কাজে ব্যবহার করা হয়। শস্য, মাছ, সবজি ইত্যাদি শুকানোর কাজে সৌরশক্তি ব্যবহৃত হয়। মাছ শুকিয়ে শুটকি তৈরি করে তা বহুদিন সংরক্ষণ করা যায়। সৌর শক্তি দ্বারা বয়লারে বাষ্প তৈরি করে তার দ্বারা তড়িৎ উৎপাদনের জন্য টার্বাইন ঘুরানো হয়। আধুনিক কৌশল ব্যবহার করে তৈরি হয়েছে সৌরকোষ। সৌরকোষের বৈশিষ্ট্য হলো

এর উপর সূর্যের আলো পড়লে তা থেকে সরাসরি তড়িৎ পাওয়া যায়। এছাড়া সৌরকোষের রয়েছে নানা রকমের ব্যবহার। যেমন: কৃত্রিম উপগ্রহে তড়িৎশক্তি সরবরাহের জন্য সৌরকোষ ব্যবহৃত হয়।

নবায়নযোগ্য শক্তির সুবিধা–বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

নবায়নযোগ্য শক্তির অনেক রকম সুবিধা পাওয়া যায়। বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শক্তির চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় এই শক্তি এখন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে বায়োগ্যাস পরিচ্ছন্ন জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি উন্নতমানের জৈব সার পেতে সাহায্য করে। দূষণমুক্ত পরিবেশের সহায়ক হয়। স্বাস্থ্যকর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখতে সাহায্য করে। বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি যেমন: পকেট ক্যালকুলেটর, পকেট রেডিও, ইলেকট্রনিক ঘড়ি ইত্যাদি সৌরশক্তির সাহায্যে চালানো যায়। মূলত নবায়নযোগ্য শক্তির প্রধান সুবিধা হলো এটি নবায়নযোগ্য, এটি কখনো শেষ হয়ে যাবে না। নিচে এর সুবিধাসমূহ উল্লেখ করা হলো।

- বায়ুপ্রবাহ ও সৌরশক্তি একটি অফুরন্ত শক্তির উৎস। কারণ বায়ু ও সূর্য সর্বদাই বিদ্যমান।
- পানির স্রোতকে ব্যবহার করে বেশি পরিমাণে শক্তির উৎপাদন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে স্রোতকে বাধা দেওয়ার জন্য তৈরি ব্রিজ বা ব্যারেজ সড়ক যোগাযোগকে উন্নত করে। চাঁদ যেহেতু পানির জোয়ার–ভাটাকে প্রভাবিত করে এবং এটি সর্বদাই বিদ্যমান তাই পানির জোয়ার–ভাটা থেকে প্রাপ্ত শক্তি সর্বদাই ব্যবহার সম্ভব।
- নবায়নযোগ্য শক্তি সাধারণত পরিবেশবান্ধব, কারণ এরা বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়ায় না।

নবায়নযোগ্য শক্তির প্রয়োজনীয়তা যেমন আমাদের দেশে অনস্বীকার্য, তেমনি এর প্রাপ্যতা অনেকটা সহজ। আমাদের দেশের অনেক অঞ্চল আছে যেখানে এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছেনি। সেখানে আমরা সহজেই সৌরশক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ পেতে পারি। তাছাড়া বায়োগ্যাস উৎপাদনে রয়েছে আমাদের বিপুল সম্ভাবনা। আমাদের দেশে প্রাকৃতিক গ্যাস সীমিত থাকায় আমাদের এই বিকল্প শক্তির সন্ধান অবশ্যই করতে হবে। প্রাকৃতিক গ্যাসকে আমাদের এক স্থান থেকে অন্যস্থানে সরবরাহ করাতে প্রচুর খরচ হয়। তবে আমরা যদি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট গড়ে তুলতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা দ্বৈত সুবিধা পাব। প্রয়োজনীয় শক্তির চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি আমরা জমির চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সারের চাহিদাও মেটাতে সক্ষম হব। এছাড়া কৃষিনির্ভর এই দেশে নিঃসন্দেহে বায়োগ্যাসের উপাদান খুবই সহজলভ্য। সুতরাং আমাদেরকে ভবিষ্যৎ চিন্তায় এখনই এই শক্তির যথাযথ ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

নবায়নযোগ্য শক্তি : সীমাবদ্ধতা

বর্তমানে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যাপক চাহিদা আছে। তবে কিছুক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহারে অসুবিধা দেখা যায়। নিচে তা আলোচনা করা হলো।

- বায়োগ্যাস থেকে যে বিদ্যুৎ পাওয়া যায় তার পরিমাণ কম এবং সীমিত।

- বায়ুপ্রবাহ ও স্রোত থেকে যে নবায়নযোগ্য শক্তি পাওয়া যায় তার উৎস সীমিত। কারণ এর জন্য যে প্লান্ট তৈরি করতে হয়, তার জন্য সুবিধাজনক জায়গা লাগে। বায়ুর মাধ্যমে উৎপাদনের অন্যতম সমস্যা হলো সবসময় বায়ু প্রবাহ থাকে না।
- সূর্যের আলো থাকলে সৌরশক্তিনির্ভর নবায়নযোগ্য শক্তি পাওয়া যায় কিন্তু বৃষ্টির জন্য এর উৎপাদন ব্যহত হতে পারে।
- অনেক সময় পানির জোয়ার–ভাটাকে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহারের ফলে নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়ে যায়। এছাড়া নদীর উপর ব্রিজ বা ব্যারেজ নির্মাণে জাহাজ চলাচলও বাধাগ্রস্ত হয়।
- সৌর, বায়ু ও পানির স্রোত থেকে উৎপন্ন নবায়নযোগ্য শক্তি সাধারণত ব্যয়বহুল।

পাঠ–১০ : অনবায়নযোগ্য শক্তি

অনবায়নযোগ্য মানেই হলো, যে শক্তি একবার ব্যবহার করা হলে তা থেকে পুনরায় শক্তি উৎপন্ন করা যায় না। এটি হলো মূলত প্রাকৃতিক সম্পদ, যা পুনরায় উৎপন্ন করা যায় না। প্রকৃতিতে এদের তৈরি করতে যত সময় লাগে, তার চেয়ে কম সময়ে ব্যয়িত হয়। অনবায়নযোগ্য শক্তির মধ্যে অন্যতম হলো কয়লা, তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, ইউরেনিয়াম ইত্যাদি।

অনবায়নযোগ্য শক্তির সুবিধা

অনবায়নযোগ্য শক্তির সুবিধা মূলত দুটি দিক থেকে বিবেচনা করা হয়–দাম ও প্রাচুর্য। বেশির ভাগ যন্ত্রপাতি বা যানবাহন অনবায়নযোগ্য শক্তির সাহায্যে চলে, এদের নবায়নযোগ্য শক্তির সাহায্যে চালাতে অনেক বেশি খরচ লাগে। যেমন: সাধারণ গ্যাস বা তেলে কম খরচে এসব যানবাহনে বা যন্ত্রপাতি চলে। অপরপক্ষে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস যেমন সৌরশক্তি দ্বারা কোনো যানবাহন চালানো কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল। অনবায়নযোগ্য জ্বালানি সস্তা, এদের অল্প পরিমাণ থেকে বেশি শক্তি পাওয়া যায়, যেমন অল্প ইউরেনিয়াম থেকে অনেক বিদ্যুৎ শক্তি পাওয়া যায়।

অনবায়নযোগ্য শক্তির সীমাবদ্ধতা

অনবায়নযোগ্য জ্বালানির অসুবিধা হলো –

- এটি অনবায়নযোগ্য ও দ্রুত ফুরিয়ে যায়; এরা মূলত নিঃশেষ হয়ে যায়।
- পরিবেশকে বেশ উচ্চমাত্রায় দূষিত করে।
- এদের দহনে কার্বন ডাইঅক্সাইড বাতাসে ছড়ায়, ফলে গ্লোবাল ওয়ার্মিং তৈরি করে।

পাঠ–১১ : শক্তির ব্যবহার ও সংকট

মানুষ জীবন ধারণে ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য যা কিছু করে তাতেই শক্তির প্রয়োজন হয়। দিন দিন বেড়েই চলছে শক্তির ব্যবহার, ফলে তৈরি হচ্ছে শক্তির সংকট। নিম্নোক্ত কারণগুলোর জন্য শক্তির সংকট ঘটে —

- ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটানোর জন্য অধিক হারে শক্তির প্রয়োজন হচ্ছে।
- উন্নয়নশীল দেশসমূহ ব্যাপক হারে দালান–কোঠা, রাস্তা–ঘাট, কলকারখানা ইত্যাদি নির্মাণ করছে এবং যানবাহন ব্যবহার করে। এ সকল নির্মাণ কাজে ও যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণে অধিক শক্তি ব্যয় করছে।
- মানুষ উন্নত জীবনযাপনের জন্য বিলাসবহুল বাড়িঘর নির্মাণ করে। রেডিও, টিভি, ভিসিআর, কম্পিউটার, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রপাতি অধিক হারে ব্যবহার করার ফলে শক্তির সংকট বাড়ছে।
- মানুষের ব্যবসা–বাণিজ্য, কাজকর্ম ও যোগাযোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে অধিক শক্তির ব্যয় হচ্ছে।

উপরোক্ত কারণসমূহের পেছনে প্রয়োজনীয় শক্তির জোগান দিতে ব্যর্থ হলে তৈরি হয় শক্তির সংকট। তাই আমাদেরকে বিকল্প শক্তির সন্ধান করতে হচ্ছে ।

পাঠ–১২ : শক্তির বিকল্প উৎসের সন্ধানে

এ যাবৎ প্রাপ্ত প্রাকৃতিক শক্তির মধ্যে তেল, গ্যাস, কয়লা, বিদ্যুৎ প্রভৃতি অবিরত ব্যবহারের ফলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। পারমাণবিক শক্তি সম্ভাবনাময় উৎস হিসেবে আবির্ভূত হলেও এর প্রারম্ভিক খরচ বেশি। শক্তি সরবরাহে রয়েছে অনিশ্চয়তা ও বিপদের ঝুঁকি।

আমাদের প্রাকৃতিক গ্যাস অমূল্য সম্পদ, কিন্তু এটা নবায়নযোগ্য নয়। নবায়নযোগ্য নয় এমন কোনো শক্তির উৎসের উপর আর নির্ভর করা যায় না। আমাদের দেশের প্রায় ১৬ কোটি লোকের খাদ্য প্রস্তুতের জন্য রান্না–বান্নার কাজে বছরে প্রচুর জ্বালানি ব্যবহৃত হচ্ছে। এ সব জ্বালানির মধ্যে রয়েছে কাঠ, খড়কুটো, গোবর প্রভৃতি পচনশীল পদার্থ। এগুলো মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির সহায়ক। কিন্তু রান্নার কাজে ব্যয় হয়ে যাওয়ায় জৈব সার হিসেবে ব্যবহার সীমিত হচ্ছে। ফলে মাটির উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে। রান্নার কাজে প্রচলিত জ্বালানি হিসেবে কাঠের ব্যবহার সর্বাধিক। ফলে দেশের শুধু বনজ সম্পদই ধ্বংস হচ্ছে না, আমাদের পরিবেশেও নেমে আসছে বড় ধরনের বিপর্যয়।

এ সকল বিষয় বিবেচনা করে জ্বালানির এ বিরাট খাতে বিকল্প উৎসের সন্ধান করা হচ্ছে অবিরত। ইতোমধ্যে বিজ্ঞানীরা বায়োগ্যাস প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন। সৌরশক্তিকে আংশিকভাবে হলেও কাজে লাগাতে সমর্থ হয়েছেন। সৌরশক্তি, সমুদ্রস্রোত ও বায়ুশক্তিও এক একটা উৎস হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

জৈব গ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে পারলে সুদূর পল্লীঅঞ্চলে জ্বালানি, ঘর আলোকিত করার এবং টিভি চালানোর মতো বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। এ প্রযুক্তি গ্রহণ করলে প্রাকৃতিক বনজ সম্পদের উপর চাপ কমবে। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হবে। জমির উর্বরতা সংরক্ষণ করে অধিক ফসল ফলানো যাবে।

সর্বোপরি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আমরা একটা সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ রেখে যেতে পারব। সুতরাং বায়োগ্যাস প্রযুক্তি অবলম্বন, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

পাঠ–১৩ আমাদের জীবনে শক্তির প্রভাব ও এর সাশ্রয়ী ব্যবহার

প্রায় পনের কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত আমাদের বাংলাদেশ। প্রতিবছর রান্না–বান্নার কাজে প্রচুর জ্বালানি ব্যবহৃত হচ্ছে। এর প্রায় সবটাই কাঠ, খড়কুটা, নাড়া, শুকনো গোবর ইত্যাদি। প্রচলিত জ্বালানি হিসেবে এগুলো ব্যবহারের ফলে দেশের বনজ সম্পদ কমছে, মাটি উর্বরতা হারাচ্ছে এবং পরিবেশ বিপন্ন হচ্ছে। আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি। ফলে আগামী দিনে বর্ধিত জনসংখ্যার জ্বালানি চাহিদা পূরণে আমাদেরকে হিমশিম খেতে হবে। জ্বালানি সংকট মোকাবিলার বিষয় আমাদেরকে অবশ্যই ভাবতে হবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা শক্তির ব্যবহার করছি। আমাদের বাঁচার জন্য যেমন শক্তির প্রয়োজন, তেমনি জীবনমান উন্নয়নের জন্যও শক্তির প্রয়োজন। শক্তি না হলে আমাদের জীবন চলে না। তাই শক্তি আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আমরা দেখেছি যে, জীবাশ্ম জ্বালানি আমাদের শক্তির এক বিরাট উৎস। কিন্তু এ শক্তি সীমিত এবং এক সময়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই মানুষ শক্তির বিকল্প উৎসের সন্ধানে সচেষ্ট। নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস কিছুটা সম্ভাবনাময় বলে মনে হচ্ছে। যতক্ষণ আমরা অফুরন্ত শক্তির কোনো উৎস হাতের কাছে না পাচ্ছি ততক্ষণ প্রাপ্ত শক্তি ব্যবহারে আমাদের অবশ্যই সচেতন ও মিতব্যয়ী হতে হবে। দৈনন্দিন জীবনে শক্তির অপব্যবহার বা অপচয় রোধ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। এ জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন:

- শক্তিকে ব্যক্তিগত সম্পদ না ভেবে সমষ্টিগত সম্পদ বিবেচনা হিসেবে করার মানসিকতা সৃষ্টি।
- রেডিও, টিভি, বাতি, এয়ারকন্ডিশন প্রভৃতি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম প্রয়োজনে ব্যবহার করে অন্য সময় বন্ধ রাখা।
- ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন বা যন্ত্রপাতি বেশি শক্তি ব্যয় করে। এ জন্য এ সকল সরঞ্জামাদির সঠিক সংরক্ষণ অপরিহার্য।
- বিনা কারণে/অপ্রয়োজনে যানবাহনের ইঞ্জিন চালু না রাখা।
- শক্তির সংরক্ষণ আমাদের ব্যক্তিগত খরচ কমায়।

নতুন শব্দ :

কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি, সৌরশক্তি, বায়ু শক্তি, শক্তির রূপান্তর, নবায়নযোগ্য শক্তি, অনবায়নযোগ্য শক্তি, বায়োগ্যাস, শক্তির সংকট ও বিকল্প শক্তির উৎস।

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- কাজ করার সামর্থ্যই হলে শক্তি।
- আমাদের চারপাশে রয়েছে শক্তির বিভিন্ন উৎস।

- শক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ নেই, শক্তি কেবল এক রূপ থেকে অপর এক বা একাধিক রূপে পরিবর্তিত হতে পারে।
- নবায়নযোগ্য শক্তির প্রয়োজনীয়তা যেমন আমাদের দেশে অনস্বীকার্য, তেমনি এর প্রাপ্যতা অনেকটা সহজ।
- দিন দিন বেড়েই চলছে শক্তির ব্যবহার, ফলে তৈরি হচ্ছে শক্তির সংকট।
- দৈনন্দিন জীবনে শক্তির অপব্যবহার বা অপচয় রোধ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. কাজ করার ______________ হলো শক্তি।

২. জেনারেটর মূলত ______________ শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে।

৩. বায়োগ্যাস উৎপন্ন করা যায় ____________________ ও ______________ উপাদান থেকে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ক্ষমতা ও শক্তির মধ্যে পার্থক্য কী?

২. শক্তির নিত্যতা ব্যাখ্যা কর।

৩. শক্তির সংকট সৃষ্টির কারণগুলো উল্লেখ কর।

৪. অনবায়নযোগ্য শক্তির সুবিধা কীভাবে পাওয়া যায়?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি শক্তির অনবায়নযোগ্য উৎস?

ক. বায়ু   খ. পানির স্রোত   গ. সৌর শক্তি   ঘ. কয়লা

২. অতীশ কখনও কখনও রাতে লাইটযুক্ত চার্জার ফ্যানের সাহায্যে পড়ালেখা করে। এ ক্ষেত্রে সে ব্যবহার করে–

i. আলোক শক্তি
ii. বিদ্যুৎ শক্তি
iii. রাসায়নিক শক্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii   খ. ii ও iii   গ. i ও iii   ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
একজন ব্যায়ামবিদ ২০০ কেজির ভার উত্তোলন করেন এবং ভারটি নিচে নামান। এরপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে খাবার খেতে খেতে গান শুনতে লাগলেন।

৩. ভার উত্তোলন থেকে ভার নিচে নামানো পর্যন্ত শক্তির রূপান্তরের সঠিক ক্রম কোনটি?

ক. রাসায়নিক শক্তি ⟶ যান্ত্রিক শক্তি ⟶ স্থিতি শক্তি ⟶ যান্ত্রিক শক্তি
খ. যান্ত্রিক শক্তি ⟶ স্থিতি শক্তি ⟶ যান্ত্রিক শক্তি ⟶ শব্দ শক্তি
গ. স্থিতি শক্তি ⟶ যান্ত্রিক শক্তি ⟶ শব্দ শক্তি ⟶ তাপ শক্তি
ঘ. যান্ত্রিক শক্তি ⟶ স্থিতি শক্তি ⟶ যান্ত্রিক শক্তি ⟶ স্থিতি শক্তি

৪. ভার উত্তোলকের খাদ্য গ্রহণ ও গান শোনার সাথে কোন শক্তি দুইটির সম্পর্ক রয়েছে।

ক. তাপ ও শব্দ
খ. তাপ ও বিদ্যুৎ
গ. রাসায়নিক ও শব্দ
ঘ. স্থিতি ও তাপ

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সামিহার গ্রামের বাড়ি বিজয়নগরে এখন পর্যন্ত বিদ্যুৎ পৌছায়নি। তাই গ্রামবাসির অনেকেই সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন। আবার গত ঈদের ছুটিতে মামার সাথে সে কাপ্তাই বেড়াতে গিয়ে দেখে পানি থেকেও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে।

ক. শক্তির প্রধান উৎস কী?
খ. প্রাকৃতিক গ্যাস অনবায়নযোগ্য শক্তি কেন? ব্যাখ্যা কর।
গ. সামিহার দেখা কাপ্তাইয়ের পানিবিদ্যুৎ উৎপাদনের কৌশল ব্যাখ্যা কর।
ঘ. সামিহার গ্রামে ব্যবহৃত উদ্দীপকে উল্লিখিত শক্তির উপযোগিতা আলোচনা কর।

২. মুমিন সাহেব ইদানীং তাঁর হাঁস–মুরগী ও গরুর খামারের বিষ্ঠা আবর্জনা থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় এক ধরনের গ্যাস উৎপন্ন করছেন। এতে খামারের বিভিন্ন কাজে শক্তি ও গ্যাসের চাহিদা মিটিয়ে অতিরিক্ত গ্যাস বিক্রি করতে পারছেন।

ক. ক্ষমতা কী?

খ. শক্তি রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

গ. উদ্দীপকে উৎপন্ন গ্যাস কোন ধরনের শক্তির উৎস ব্যাখ্যা কর।

ঘ. শক্তি সংরক্ষণে মুমিন সাহেবের কার্যক্রমের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

অষ্টম অধ্যায়

শব্দের কথা

তোমার ঘরের দরজায় ঠক্‌ঠক্ শব্দ হলে তুমি বুঝতে পার তোমার দরজায় কেউ অপেক্ষা করছে। দরজার কলিংবেল বাজলেও আমরা বুঝতে পারি কেউ এসছে। কারও পায়ের শব্দ শুনে তুমি বুঝতে পার যে, কেউ আসছে। আমরা যা কিছু শুনি, তাই হলো শব্দ। শব্দ আমাদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটা অন্যের সাথে যোগাযোগে সহায়তা করে। আমরা আমাদের চারপাশে নানা রকম শব্দ শুনতে পাই। বাঁশির সুর, গাড়ির হর্ন, কুকুরের ঘেউ ঘেউ, ছাগলের ব্যা ব্যা, মুরগির কুকুরুকু, পাখির কলতান ইত্যাদি। শব্দ এক প্রকার শক্তি, যা আমাদের শুনার অনুভূতি জন্মায়। শব্দ কীভাবে উৎপন্ন হয়, কীভাবে সঞ্চালিত হয়, কীভাবে আমরা বিভিন্ন রকম শব্দ চিনতে পারি ইত্যাদি নিয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- শব্দের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব।
- শব্দ সঞ্চালন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কঠিন, তরল ও বায়বীয় মাধ্যমে শব্দের বেগের তুলনা করতে পারব।
- প্রাণী কীভাবে শব্দ শুনতে পায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শ্রাব্যতার সীমা ও নয়েজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শব্দ উৎপাদনকারী যন্ত্রে শব্দ সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- দৈনন্দিন জীবনে (নয়েজ ও দূষণ) শব্দের ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে নিজে সচেতন হব এবং অন্যদেরে সচেতন করব।
- দলগত কাজে সহপাঠিদের বক্তব্য শুনব, সক্রিয় অংশগ্রহণ করব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহযোগিতা করব।

পাঠ–১ : শব্দ ও এর ধরন

আমরা যা কিছু শুনি তাই হলো শব্দ। একটি স্টিলের বাটিকে মেঝেতে ফেল, শব্দ শুনতে পাবে। তুমি যখন কথা বল তখন মুখ থেকে শব্দ শুনতে পাও। আরিয়ান তার ঘড়ির এলার্মের শব্দে ঘুম থেকে উঠে। সে তার স্কুলে যাবার পথে নানা রকম শব্দ শুনতে পায়। পাখির কাকলি, রাস্তায় রিকশার বেলের টুংটাং শব্দ, গাড়ির হর্ন, মানুষের হৈচৈ ইত্যাদি নানা রকম শব্দ। বন্ধুরা যখন কথা বলে তখন গলার স্বর থেকে সব রকম শব্দই তুমি চিনতে পার এবং বলতে পার কে কথা বলছে। আমরা যে সকল শব্দ শুনতে পাই তার মধ্যে কিছু আছে যা শ্রুতিমধুর। এদের মধ্যে সুর আছে এবং শুনতে ভাল লাগে। এরকম শব্দ হলো বাঁশির সুর ও হারমোনিয়ামের শব্দ। কিছু আছে গোলমেলে, সুরহীন ও বিরক্তিকর। এ–রকম শব্দ হলো গাড়ির হর্নের শব্দ, লোহা কাটার শব্দ, কুকুরের ঘেউ ঘেউ ইত্যাদি।

কাজ : সুরযুক্ত ও সুরহীন শব্দ শনাক্ত করা।

পদ্ধতি: ৫/৬ জন করে কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে যাও। তোমরা যে নানা রকম শব্দ শুনতে পাও, তাদের মধ্যে কোনগুলো সুরযুক্ত ও কোনগুলো সুরহীন তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করো। আলোচনা থেকে পাওয়া সুরযুক্ত ও সুরহীন শব্দের একটি তালিকা তৈরি কর। দলের একজন শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

শব্দ সুরযুক্ত বা সুরহীন যাই হোকনা কেন সকল শব্দেরই একটি উৎস আছে। শব্দ কোনো না কোনো উৎসে উৎপন্ন হয়। শব্দের ধরন থেকে আমরা বুঝতে পারি শব্দের উৎস কী? যেমন ঘেউ ঘেউ শব্দ শুনলে না দেখেই আমরা বুঝতে পারি কুকুর ডাকছে, টেলিফোন উঠালেই আমরা কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারি অপর প্রান্তে কে কথা বলছে?

পাঠ–২ ও ৩ : শব্দের উৎপত্তি

শব্দ এক প্রকার শক্তি, যা আমাদের শ্রবণের অনুভূতি জন্মায়। এখানে আমরা কিছু কাজ করবো যা থেকে বোঝা যাবে শব্দ কীভাবে উৎপন্ন হয়। তোমাদের স্কুলের ঘণ্টা যখন বাজানো হয়, তখন তা স্পর্শ করে দেখ। ঘণ্টাটি যে কাঁপে তা কি অনুভব করতে পার?

কাজ : শব্দের উৎপত্তির কারণ জানা।
প্রয়োজনীয় উপকরণ : একটি ধাতব পাত্র, কিছু দড়ি ও একটি লাঠি।

পদ্ধতি : ধাতব পাত্রটি (স্টিল বা অ্যালুমিনিয়ামের কোনো পাত্র হতে পারে) দড়ির সাহায্যে সুবিধাজনক স্থানে ঝুলিয়ে দাও। খেয়াল রাখতে হবে, এটা যেন কোনো কিছুকে স্পর্শ না করে। এবার লাঠি দিয়ে পাত্রটিকে আঘাত কর। তোমার হাতের আঙুল দিয়ে পাত্রটি আলতোভাবে স্পর্শ কর। তুমি কি পাত্রের কম্পন টের পাচ্ছ? লাঠি দিয়ে পাত্রটিকে আবার আঘাত করো এবং সাথে সাথে তোমার হাত দিয়ে পাত্রটি শক্ত করে ধরে রাখ। এখনও কি শব্দ শুনতে পাচ্ছ? না, শব্দ শোনা যায় না।

পাত্রটিকে আবার আঘাত কর, শব্দ শুনতে পাবে। শব্দ বন্ধ হয়ে গেলে পাত্রটি স্পর্শ কর। এখনও কি পাত্রটি কাঁপছে? না, কাঁপছে না।

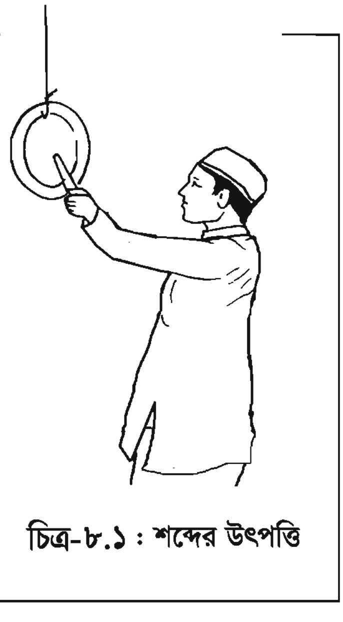

চিত্র-৮.১ : শব্দের উৎপত্তি

কাজ : শব্দের উৎপত্তির কারণ জানা

প্রয়োজনীয় উপকরণ : একটি ধাতব (স্টিলের থালা), একটি চামচ ও কিছু পরিমাণ পানি।

পদ্ধতি : থালায় পানি ঢালো। চামচ দিয়ে থালার এক প্রান্তে আঘাত কর।

তুমি কি শব্দ শুনতে পাচ্ছ? থালাটিকে আবার আঘাত কর এবং সাথে সাথে তোমার হাত দিয়ে থালাটি স্পর্শ কর। থালাটি যে কাঁপছে, তা কি তুমি টের পাচ্ছ?

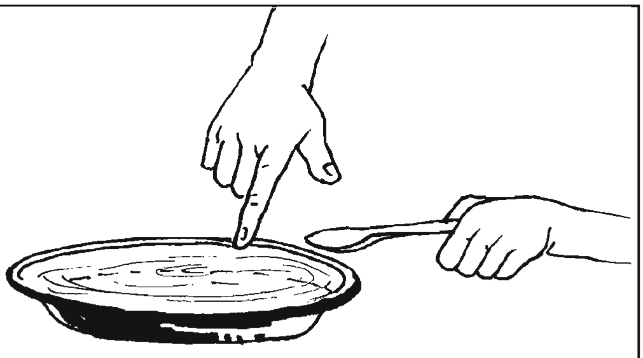

চিত্র-৮.২: থালায় শব্দের উৎপত্তি

এখনও কি শব্দ শুনতে পাচ্ছ? না, শব্দ শোনা যায় না। থালাটিকে আবার আঘাত কর এবং পানির দিকে তাকাও। পানিতে কি কোনো ঢেউ দেখছ? থালা কাঁপার ফলে পানি কাঁপছে এবং পানিতে ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়েছে।

উপরের কাজগুলো থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, কোনো বস্তুর কম্পনের ফলে শব্দ সৃষ্টি হয়। কম্পনশীল যে বস্তু শব্দ সৃষ্টি করে, তাই হলো শব্দের উৎস।

পাঠ– ৪: শব্দের সঞ্চালন

আমরা জানি কম্পনশীল বস্তু শব্দ সৃষ্টি করে। শ্রোতার নিকট এ শব্দ কী করে পৌঁছায়? একটি উদাহরণ বিবেচনা করা যাক। কোনো বাদ্যযন্ত্রের কম্পনশীল তার বা কোনো সুরশলাকার কম্পনশীল বাহু এদের চারপাশের বায়ুর অণুগুলোকে কম্পিত করে। বায়ুর এই কম্পিত অণুগুলো এদের কম্পনকে পার্শ্ববর্তী বায়ুর অণুগুলোতে স্থানান্তর করে দেয়। পর্যায়ক্রমে এভাবেই শব্দ ঢেউয়ের মতো উৎস থেকে শ্রোতার নিকট পৌঁছায়। কোনো মাধ্যমের কণাগুলোর কম্পনের ফলে সৃষ্ট যে আন্দোলন মাধ্যমের মধ্য দিয়ে চলে বা সঞ্চালিত হয়, তাকে ঢেউ বলে। একটি লম্বা স্প্রিং নিয়ে এর এক প্রান্তে আঘাত করলে দেখবে স্প্রিংটির সংকোচন ও প্রসারণের ফলে শক্তি সঞ্চালিত হচ্ছে। শব্দের ঢেউ ঠিক এভাবেই সঞ্চালিত হয়। শব্দের এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াতকে শব্দ সঞ্চালন বলে।

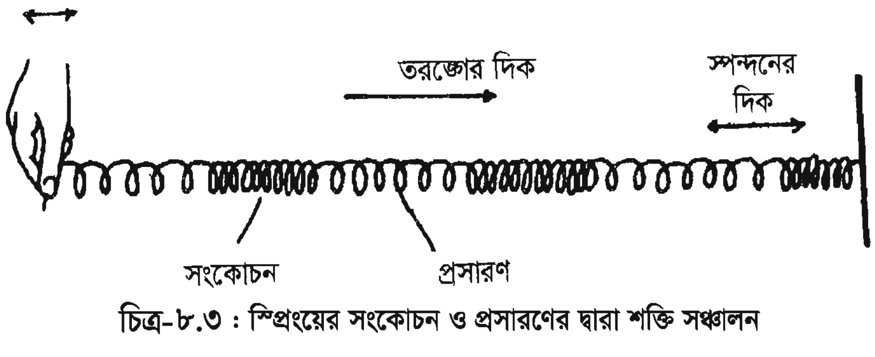

চিত্র-৮.৩ : স্প্রিংয়ের সংকোচন ও প্রসারণের দ্বারা শক্তি সঞ্চালন

শব্দ সঞ্চালনের জন্য মাধ্যম প্রয়োজন। এই মাধ্যম হতে পারে কঠিন, তরল ও বায়বীয়। শব্দ সবচেয়ে দ্রুত চলে কঠিন মাধ্যমে, তারপর তরল মাধ্যমে, এরপর বায়ু মাধ্যমে। পরবর্তীতে কাজের মাধ্যমে আমরা তা প্রমাণ করব।

শব্দ কি মাধ্যম ছাড়া চলতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমরা একটি কাজ করব।

কাজ : মাধ্যম ছাড়া শব্দ সঞ্চালিত হয় না তা জানা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : একটি ধাতব ঝুনঝুনি, একটি সরু কাঠি একটি বড় মুখওয়ালা বোতল ও একটি কর্ক।

পদ্ধতি : কাঠির এক মাথায় ঝুনঝুনিটিকে সুতা দিয়ে বাঁধ। কাঠির অপর মাথাটি কর্কের ভিতরের মুখে ঢুকাও। এবার পুরো ব্যবস্থাটিকে বোতলের ভিতর এমনভাবে ঢুকাও কর্কটি যেন ছিপির কাজ করে। ভালো করে ছিপিটি বন্ধ কর এবং বোতলটি ঝাঁকাও। খেয়াল রাখবে ঝুনঝুনি যেন বোতলের দেয়াল স্পর্শ না করে।

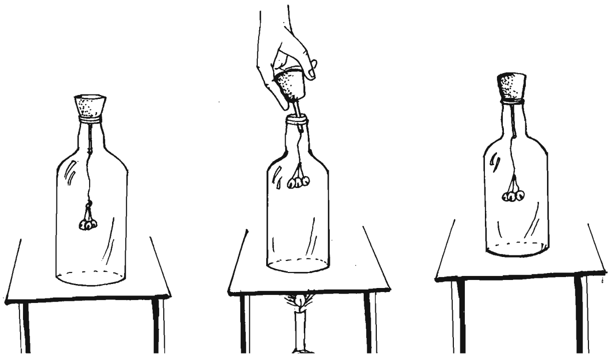

চিত্র-৮.৪ : মাধ্যম ছাড়া শব্দ সঞ্চালিত হয় না তা জানা

বাইরে থেকে ঝুনঝুনির মব্দ শুনতে পাবে। এবার কর্কটি খুলে একটু উঁচু করে রেখে বোতলের নিচে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি দিয়ে তাপ দাও। গরমে বোতলের সব বাতাস বেরিয়ে যাবে। বোতলের ছিপিটি বন্ধ কর।

বোতলটি ঠাণ্ডা হওয়ার পর আবার ঝাঁকাও। কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছ কি?
না, কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না বা খুব ক্ষীণ শব্দ শোনা যাচ্ছে। এর অর্থ কী? এর অর্থ শব্দ মাধ্যম ছাড়া সঞ্চালিত হয় না।

পাঠ– ৫ : তরল পদার্থে শব্দের সঞ্চালন ও শব্দের বেগ

আমরা আগেই বলেছি যে, শব্দ সঞ্চালনের জন্য মাধ্যম দরকার। মাধ্যম ছাড়া শব্দ সঞ্চালিত হয় না। শব্দ সবচেয়ে দ্রুত চলে কঠিন মাধ্যমে, তারপর তরল মাধ্যমে, এরপর বায়বীয় মাধ্যমে। পরবর্তীতে কাজের মাধ্যমে আমরা তা প্রমাণ করব।

কাজ: তরল পদার্থে শব্দের সঞ্চালন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ: একটি বেলুন ও কিছু পরিমাণ পানি।

পদ্ধতি: বেলুনটিতে পানি ভর্তি কর। বেলুনের একদিক তোমার কানের সাথে ধর এবং অপর দিকে আস্তে করে বেলুনে আঁচড় কাট।

তুমি কি আঁচড়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছো?

তুমি আঁচড়ের শব্দ জোরে ও স্পষ্ট শুনতে পাবে।

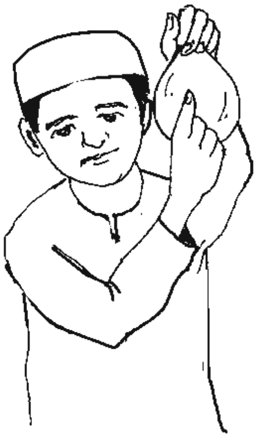

চিত্র-৮.৫ : তরল পদার্থে শব্দের সঞ্চালন

পাঠ– ৬ : কঠিন পদার্থে শব্দের সঞ্চালন ও শব্দের বেগ

কঠিন মাধ্যমে শব্দ বায়ু ও তরল মাধ্যমের চেয়ে দ্রুত ও ভালভাবে সঞ্চালিত হয়।

কাজ: কঠিন পদার্থে শব্দের সঞ্চালন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ: একটি ধাতব স্কেল বা লম্বা ধাতব দণ্ড।

পদ্ধতি: স্কেল বা দণ্ডের এক প্রান্ত তোমার কানের সাথে ধর এবং অন্য প্রান্তে তোমার কোনো বন্ধুকে আস্তে আস্তে আঁচড় কাটতে বলো। তুমি কি আঁচড়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছো? তোমার আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকা বন্ধুদের জিজ্ঞাসা কর তারা কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছ কি না?

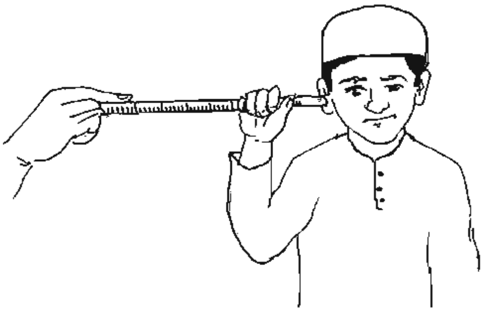

চিত্র-৮.৬ : কঠিন পদার্থে শব্দের সঞ্চালন

এরকম একটি পরিক্ষা তোমরা একটি কাঠের বা ধাতব টেবিল নিয়ে করতে পার। কাজটি করে দেখ এবং কাজটি থেকে কী পেলে তা তোমাদের খাতায় লিখ। কাজটি থেকে জানতে পারবে যে, শব্দ কোনো ধাতু বা কাঠ দিয়েও চলাচল করে বা সঞ্চালিত হয়। বিভিন্ন কঠিন পদার্থে শব্দের বেগ বিভিন্ন রকম।

ছক : বায়বীয়, তরল ও কঠিন মাধ্যমে শব্দের বেগের তুলনা

বায়ুতে শব্দের বেগ ৩৪৩ মিটার/সেকেন্ড
পানিতে শব্দের বেগ ১৪৯৬ মিটার/সেকেন্ড
এলুমিনিয়ামে শব্দের বেগ ৬৪২০ মিটার/সেকেন্ড

সুতরাং বিভিন্ন মাধ্যমে শব্দ বিভিন্ন বেগে সঞ্চালিত হয়। কঠিন মাধ্যমে শব্দ বায়ু ও তরল মাধ্যমের চেয়ে দ্রুত ও ভালোভাবে সঞ্চালিত হয়। আবার শব্দ বায়ু মাধ্যমের চেয়ে দ্রুত ও ভালোভাবে তরল মাধ্যমে সঞ্চালিত হয়।

পাঠ– ৭ : প্রাণীরা কীভাবে শব্দ শনতে পায়

আমরা জানি কম্পনশীল বস্তু শব্দ উৎপন্ন করে এবং সেই শব্দ মাধ্যম দিয়ে সকল দিকে সঞ্চালিত হয়। এখন প্রশ্ন হলো, আমরা কী করে শব্দ শুনতে পাই?

আমাদের কানের বাইরের অংশের আকৃতি দেখতে অনেকটা ফানেলের মতো। শব্দ যখন এর ভিতর প্রবেশ করে; তখন শব্দ একটি ছিদ্রপথে যায় যার শেষ প্রান্তে একটি টানটান পাতলা পর্দা থাকে। একে বলা হয় কানের পর্দা। এই পর্দা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। কাজটি হলো, শব্দের কম্পন কানের পর্দাকে কাঁপায়।

পর্দা এই কম্পনকে কানের ভিতরের অংশে পৌঁছে দেয়। সেখান থেকে শব্দ মস্তিষ্কে পৌঁছায়। এভাবেই আমরা শব্দ শুনতে পাই। কানের পর্দা যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে, তা জানার জন্য আমরা একটি পরিক্ষা করব।

কাজ : শব্দের কম্পন কীভাবে কানের পর্দায় কম্পন সৃষ্টি করে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : টিনের একটি পাত্র (সফ্ট ড্রিঙ্কের ক্যান নিতে পার) ও একটি রবারের বেলুন।

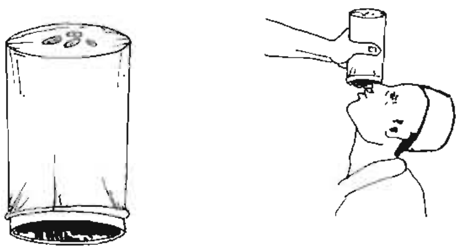

চিত্র-৮.৭ : শব্দের কম্পন কানের পর্দায় কম্পন সৃষ্টি করে

পদ্ধতি: ক্যানের দুই মাথা কেটে নাও। বেলুনটি টানটান করে লাগিয়ে রাবার ব্যান্ড বা সুতা দিয়ে বেঁধে ক্যানের এক মাথা বন্ধ করে দাও। টানটান করা বেলুনের উপর ৪/৫ টা গমের দানা বা চাউল রাখ। তোমার কোনো বন্ধুকে ক্যানের খোলা মুখের সামনে ‘হুররে’ ‘হুররে’ শব্দ করতে বলো। খেয়াল করে দেখ গম বা চাল এর কী ঘটছে? গম বা চাল উপরে নিচে লাফাচ্ছে কেন? তোমার বন্ধুর সৃষ্ট শব্দের কম্পন বেলুনে কম্পন সৃষ্টি করছে, তাই গম বা চাল লাফাচ্ছে।

পাঠ ৮ ও ৯ : শ্রাব্যতার সীমা ও নয়েজ

আমরা জানি যে, কোনো বস্তুর কম্পনের ফলে শব্দের উৎপত্তি হয়। সকল কম্পনশীল বস্তুর শব্দ কি আমরা শুনতে পাই? না, সকল কম্পনশীল বস্তুর শব্দ আমরা শুনতে পাই না। যে শব্দ প্রতি সেকেন্ডে ২০ টির কম কম্পন দিয়ে সৃষ্টি হয়, তা আমরা মানুষেরা শুনতে পাই না। এরকম শব্দ শ্রবণ উপযোগী নয়। এরকম শব্দকে শ্রুতিপূর্ব শব্দ বলা হয়। আবার অনেক বেশি কম্পনের ফলে সৃষ্ট শব্দকে আমরা শুনতে পাইনা। প্রতি সেকেন্ডে ২০,০০০–এর বেশি কম্পনের ফলে সৃষ্ট শব্দকেও শুনতে পাই না। একে শ্রুতি–উত্তর শব্দ বলা হয়। সুতরাং মানুষের জন্য শ্রাব্যতার সীমা হলো ২০ তেকে ২০,০০০ কম্পন দিয়ে সৃষ্ট শব্দ। প্রতি সেকেন্ডে কোনো বস্তু যতটা কম্পন দেয় তাকে বলা হয় ঐ বস্তুর কম্পাঙ্ক। এই কম্পাঙ্ক প্রকাশের একক হলো হার্জ। কোনো বস্তু সেকেন্ডে ২০ বার কাঁপলে তার কম্পাঙ্ক ২০ হার্জ, ২০,০০০ বার কাঁপলে ২০,০০০ হার্জ। সুতরাং মানুষের কানের শ্রাব্য কম্পাঙ্কের সীমা ২০ থেকে ২০,০০০ হার্জ। এই সীমার মধ্যে কম্পাঙ্কের শব্দকে শ্রাব্য শব্দ বলে।

কোনো কোনো প্রাণী ২০,০০০ হার্জ কম্পাঙ্কের চেয়ে বেশি কম্পাঙ্কের শব্দ শুনতে পায়। কুকুরের এই ক্ষমতা আছে। পুলিশ অতি উচ্চ কম্পাঙ্কের হুইসেল ব্যবহার করে যা কুকুর শুনতে পায় কিন্তু মানুষ শুনতে পায় না। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক অতিশব্দ (শ্রুতি–উত্তর শব্দ ব্যবহারকারী) যন্ত্রের সাথে আমরা পরিচিত।এরকম যন্ত্রের একটি হলো আলট্রাসনোগ্রাম। এ যন্ত্র ২০,০০০ হার্জের চেয়ে বেশি কম্পাঙ্কের শব্দের সাহায্যে কাজ করে।

সুশ্রাব্য শব্দ ও নয়েজ: আমাদের চারপাশে আমরা নানারকম শব্দ শুনতে পাই। এদের মধ্যে অনেক শব্দ শুনতে ভালো লাগে, সুখকর ও আনন্দদায়ক। এরকম শব্দ হলো গানের সুর, বাঁশির সুর, হারমোনিয়ামের শব্দ, সেতারের বাজনা ইত্যাদি।এরকম শব্দ সুশ্রাব্য বা সুরেলা। অনেক শব্দ শুনতে কস্ট লাগে, যন্ত্রণাদায়ক ও বিরক্তিকর। এরকম শব্দ হলো পেরেক ঠোকার শব্দ, নির্মাণ কাজের শব্দ, বোর্ডে লেখার সময় চকের কিচ্‌কিচ্‌ শব্দ ইত্যাদি । যে শব্দ শুনতে ভাল লাগে, সুখকর, মধুর ও আনন্দদায়ক তাদের সুশ্রাব্য বা সুরেলা শব্দ বলে। বস্তুর নিয়মিত বা সুষম কম্পনের ফলে সুশ্রাব্য শব্দ উৎপন্ন হয়। যে শব্দ শুনতে কস্ট লাগে, যন্ত্রনাদায়ক ও বিরক্তিকর তাদের নয়েজ বা গোলমাল বলে।

শব্দ দূষণ: আমরা সবাই পানি দূষণ ও বায়ু দূষণের সাথে পরিচিত। পানিতে যা যা থাকা উচিত তা না থেকে যদি অন্য কিছু থাকে, তা হলে তাকে আমরা পানি দূষণ বলি। বায়ুতে যা যা থাকা উচিত তা না থেকে যদি অন্য কিছু থাকে তা হলে তাকে আমরা বায়ু দূষণ বলি। এরকম আমাদের পরিবেশে যদি অতিরিক্ত বা অবাঞ্ছিত শব্দ থাকে, তখন তাকে বলি শব্দ দূষণ। শব্দ দূষণের প্রধান প্রধান কারণ হলো গাড়ির শব্দ, কোনো বিস্ফোরণের শব্দ (পটকা বা বোমা ফাটার শব্দ), কোনো যন্ত্রের শব্দ, মাইকের শব্দ, নির্মাণ কাজের শব্দ। এছাড়া টেলিভিশন ও রেডিও জোরে বাজানোর শব্দ, রান্নাঘরের জিনিসপত্রের শব্দ, এয়ারকুলারের শব্দ ইত্যাদি শব্দ দূষণের কারণ।

কাজ : তোমার এলাকায় শব্দদূষণের কারণগুলো চিহ্নিত কর এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে কারণগুলো খাতায় লেখ। ৫/৬ জনের দল করে এ কাজটি করতে পার।

শব্দ দূষণের ফলে কী ক্ষতি হয়?

তোমরা কি জান, চারপাশের অতিরিক্ত শব্দ নানা রকম স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি করে। এসব সমস্যা হলো, অনিদ্রা, মাথা ব্যথা, উচ্চ রক্তচাপ, বিরক্তি, দুর্ভাবনা ও আরো অনেক রকম সমস্যা। কোন মানুষ অনেক দিন অতিরিক্ত জোরালো শব্দ শুনলে কানে কম শুনতে পারে বা নাও শুনতে পারে।

শব্দ দূষণ কীভাবে রোধ করা যায়?

শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে হলে শব্দের উৎসকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এটা কীভাবে করা যায়? কোনো আবাসিক এলাকায় শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে হলে–

- নয়েজ সৃষ্টিকারী সব কিছুকে এলাকার বাইরে রাখতে হবে।
- নয়েজ সৃষ্টিকারী কোনো কলকারখানা আবাসিক এলাকায় স্থাপন করা যাবে না।
- যানবাহনের হর্ন যতটা সম্ভব কম বাজাতে হবে।
- রেডিও, টেলিভিশন ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র উচ্চ শব্দে বাজানো যাবে না।
- রাস্তার পাশে, ঘরবাড়ির চার দিকে গাছপালা লাগাতে হবে, যাতে ঘরবাড়িতে শব্দ কম পৌঁছায়।

এছাড়া শব্দ দূষণ রোধ করতে বিমানের ইঞ্জিন, যানবাহনের ইঞ্জিন ও কলকারখানার মেশিনে সাইলেনসার লাগাতে হবে। সাইলেনসার হলো এমন একটি ব্যবস্থা, যা উৎপন্ন শব্দকে বাইরে যেতে দেয় না।

পাঠ– ১০ ও ১১: শব্দ সৃষ্টিকারি যন্ত্র

শব্দ সৃষ্টিকারী যন্ত্র দুরকমের–সুরেলা যন্ত্র ও বেসুরো যন্ত্র। সুরেলা যন্ত্র হলো, বাঁশি, হারমোনিয়াম, একতারা, দোতারা, সেতার ইত্যাদি। বেসুরো যন্ত্র অনেক তবে আমাদের অতি পরিচিত দুটি হলো, গাড়ির হর্ন ও সাইকেল বা রিকশার বেল।

বাঁশি : বাঁশির ভিতরকার বাতাসের কম্পনের ফলে সুর সৃষ্টি হয়। ফুঁ দিয়ে বাঁশির নলে বাতাস ঢুকানো হয়। বাঁশির দৈর্ঘ্য ও ছিদ্র সংখ্যার উপর শব্দের তীক্ষ্ণতা নির্ভর করে।

কাজ : একটি খোলা নলের দৈর্ঘ্যের সাথে শব্দের তীক্ষ্ণতার পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : একটি পান করার নল ও একটি কাঁচি।

পদ্ধতি : নলটির এক প্রান্ত চেপ্টা করে নাও।

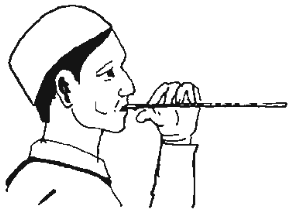

চিত্র- ৮.৮ : নলের দৈর্ঘ্যের সাথে শব্দের তীক্ষ্ণতার পরিবর্তন দেখা

এখন চেপ্টা প্রান্তটি চিত্রের মতো সরু করে কাট। কাটা প্রান্তটি মুখে নিয়ে ফুঁ দাও। কী রকম শব্দ হয় লক্ষ কর। এবার নলের অপর মাথাটি কেটে খাটো কর। উৎপন্ন শব্দের তীক্ষ্ণতার কোনো পার্থক্য শুনতে পাচ্ছ কি?

খাটো নলে শব্দের তীক্ষ্ণতা বেশি।

একতারা ও দোতারা : এগুলো তারবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র। এসব যন্ত্রে তারের কম্পনের ফলে সুশ্রাব্য বা সুরেলা শব্দ সৃষ্টি করা যায়। এসব বাদ্যযন্ত্রের তারকে টেনে ছেড়ে দিলে বা কোনো কিছু দিয়ে নাড়াচাড়া করলে তা কাঁপে এবং সুরেলা শব্দ উৎপন্ন করা যায়। তারের দৈর্ঘ্য ও পুরুত্ব বাড়িয়ে বা কমিয়ে এবং বেশি শক্ত করে টানটান করে শব্দের তীক্ষ্ণতা পরিবর্তন করা যায়।

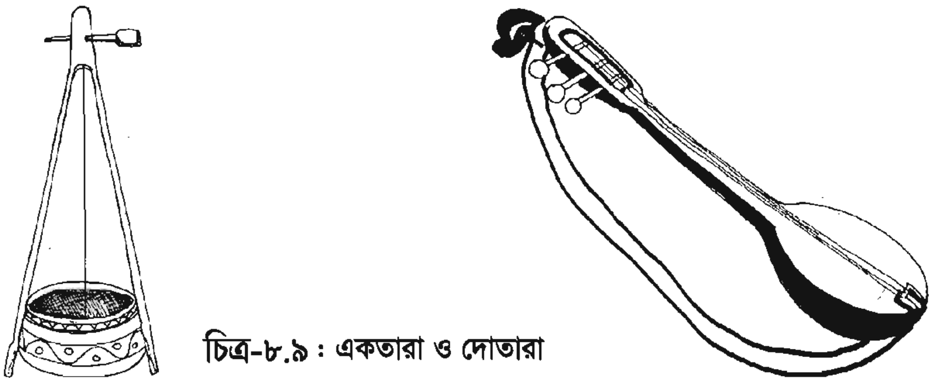

চিত্র-৮.৯ : একতারা ও দোতারা

সাইকেল বা রিকশার বেল : আমরা সাইকেল বা রিকশার বেলের টুংটাং শব্দের সাথে পরিচিত। কিন্তু এই বেল কী করে শব্দ উৎপন্ন করে তা তোমরা জান কি? এই বেলে গোলাকার একটি ধাতব বাটি উপুর করে রাখা হয়। বাটির নিচে একটি ধাতব হাতুড়ি লাগানো হয়। একটি হাতলের সাহায্যে হাতুড়ি নাড়াচাড়া করলে তা বাটিতে আঘাত করে। বাটির কম্পনের ফলে টুংটাং ঘণ্টা বাজে।

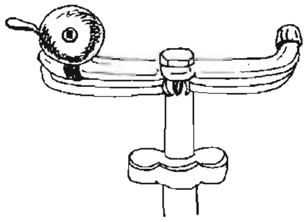

চিত্র-৮.১০ : সাইকেলের বেল

এই অধ্যায়ে শেখা নতুন শব্দ

শ্রাব্য, অশ্রাব্য, কানের পর্দা, শ্রুতি–পূর্ব শব্দ, শ্রুতি–উত্তর শব্দ, সুশ্রাব্য শব্দ, নয়েজ ও শব্দ দূষণ।

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- বস্তুর কম্পনের ফলে শব্দ উৎপন্ন হয়।
- শব্দ সঞ্চালনের জন্য মাধ্যম প্রয়োজন। ভ্যাকুয়াম বা শূন্য মাধ্যমে শব্দ চলতে পারে না।
- মানুষের কানের শ্রাব্যতার সীমা ২০–২০,০০০ হার্জ।
- কুকুর ২০,০০০ হার্জের চেয়ে বেশি কম্পাঙ্কের শব্দ শুনতে পায়।
- ২০ হার্জ কম্পাঙ্কের নিচের শব্দকে শ্রুতি–পূর্ব শব্দ বলে।
- ২০,০০০ হার্জের বেশি কম্পাঙ্কের শব্দকে শ্রুতি–উত্তর শব্দ বলে।
- শব্দের বেগ কঠিন পদার্থে সবচেয়ে বেশি এবং বায়বীয় পদার্থে সবচেয়ে কম।
- বিরক্তিকর শব্দ হলো নয়েজ।
- পরিবেশে অতিরিক্ত বা অবাঞ্ছিত শব্দের উপস্থিতি হলো শব্দ দূষণ। শব্দ দূষণ স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর। শব্দ দূষণ থেকে অনিদ্রা, মাথাব্যথা, উচ্চ রক্তচাপ, কানে কম শোনা, বিরক্তি ইত্যাদি রোগ হতে পারে।
- রাস্তা বা বাড়ির আশেপাশে গাছ লাগিয়ে শব্দ দূষণ কমানো যায়।

অনুশীলনী-৮

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. শব্দ কোনো ———— ছাড়া সঞ্চালিত হয় না।

২. মানুষের কানের শ্রাব্যতার সীমা ———— হার্জ থেকে ২০,০০০ হার্জ।

৩. অবাঞ্চিত ও বিরক্তিকর শব্দ হলো ————।

৪. শব্দের বেগ বায়বীয় পদার্থে সবচেয়ে ————।

৫. ২০,০০০ হার্জের বেশি কম্পাঙ্কের শব্দকে ———— শব্দ বলে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. শ্রার্ব ও অশ্রাব্য শব্দের মধ্যে পার্থক্য কী?

২. শ্রুতি–পূর্ব ও শ্রুতি–উত্তর শব্দ কাকে বলে?

৩. নয়েজ ও সুশ্রাব্য শব্দের পার্থক্য কী?

৫. সকল কম্পাঙ্কের শব্দ কি আমরা শুনতে পাই? আমাদের শ্রার্বতার সীমা কত?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন মাধ্যমে শব্দের বেগ সবচেয়ে বেশি?

ক. শূন্য মাধ্যম খ. কঠিন মাধ্যম গ. বায়বীয় মাধ্যম ঘ. তরল মাধ্যম

নিচের অনুচ্ছেদটি ভালোভাবে পড়ে ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

চন্দ্র পৃষ্ঠে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ এবং পৃথিবীপৃষ্ঠে বড় মাঠের দূরপ্রান্তে বন্দুকের নল থেকে গুলি বের হলো। উভয় ক্ষেত্রে সৃষ্ট আলোর ঝলকানি দেখা গেল।

২. চন্দ্রপৃষ্ঠে বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে হলে পৃথিবী থেকে–

i. চন্দ্রের দূরত্ব কম হতে হবে ii. পৃথিবী ও চন্দ্রের মাঝে মাধ্যম থাকতে হবে
iii. শব্দের কম্পাঙ্ক ২০ থেকে ২০০০০ হার্জ হতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. ii ও iii

৩. উভয় ঘটনা একইসাথে সংঘটিত হয়ে থাকলে কোনটি সবশেষে পর্যক্ষেণ করা যাবে?

ক. বন্দুকের গুলির শব্দ খ. বন্দুকে সৃষ্ট আলো গ. বিস্ফোরণের শব্দ ঘ. বিস্ফোরণের আলো

৪. ভিতরের বাতাসে কম্পনের ফলে সুর সৃষ্টি হয় কোন বাদ্যযন্ত্রে?

ক. সেতার খ. একতারা গ. গিটার ঘ. বাঁশি

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. শব্দের বেগ ৩৩০ মি/সে (বায়ুতে) সমুদ্রের পানিতে শব্দের বেগ ১৫০০ মি/সে তীরে দাঁড়ানো লোকটি ও ডুবুরি বোমা ফাটার স্থান থেকে ৩৩০০ মিটার দূরে আছে।

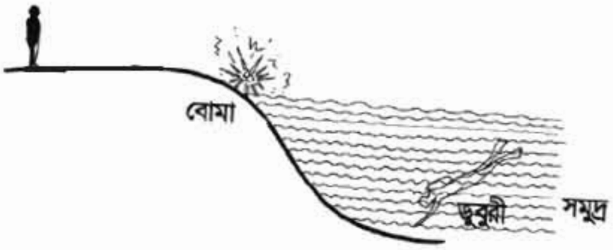

ক. শব্দ কী?

খ. রেল লাইনের পাতে কান রাখলে দূর থেকে রেলগাড়ি চলার শব্দ শুনা যায় কেন?

গ. বোমা ফাটার স্থান থেকে তীরে অবস্থিত লোকটি কতক্ষণ পর শব্দ শুনবে।

ঘ. বোমা ফাটার শব্দ ডুবুরিও কি একই সময়ে শুনতে পারবে? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

২. এতদিন যাবৎ তপনের বাসা থেকে স্কুলের ঘণ্টা ধ্বনির শব্দ শোনা যেত না। সম্প্রতি ঘণ্টাটির ওজন ঠিক রেখে গঠনে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। ফলে এখন সে বাসা থেকেই ঘণ্টাধ্বনির শব্দ শুনতে পারে।

ক. সুশ্রাব্য শব্দ কী?

খ. বাঁশের বাঁশির নলের দৈর্ঘ্য কম হলে শব্দের তীক্ষ্ণতার কীরূপ পরিবর্তন আসবে?

গ. স্কুলের ঘণ্টা ধ্বনি তপনের কানে পৌঁছার কৌশল বর্ণনা কর।

ঘ. ঘণ্টায় কোন ধরনের পরিবর্তনের কারণে তপন বাসা থেকেই এখন ঘণ্টার শব্দ শুনতে পায়। উপযুক্ত কারণসহ ব্যাখ্যা কর।

নবম অধ্যায়

তাপ ও তাপমাত্রা

তাপ মানুষের জন্য অপরিহার্য একটি শক্তি। তাপ আমাদের গরমের অনুভূতি জন্মায়। আর কতটুকু গরম অনুভব করছি তা প্রকাশ করা হয় তাপমাত্রা দিয়ে। বেশি তাপমাত্রার স্থান থেকে কম তাপমাত্রার স্থানে তাপ তিনটি প্রক্রিয়ায় সঞ্চালিত হয়। তাপ দিলে বা সরিয়ে নিলে অর্থাৎ তাপমাত্রা পরিবর্তনের ফলে বায়ুর চাপ ও আর্দ্রতার পরিবর্তন হয়, বিভিন্ন পদার্থ সম্প্রসারিত হয়। তাপের এমন প্রভাব আমাদেরকে নানা ভাবে প্রভাবিত করে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- তাপ ও তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্য করতে পারব।
- ফারেনহাইট ও সেলসিয়াস স্কেলের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারব।
- থার্মোমিটার ব্যবহার করে সূক্ষ্মভাবে তাপমাত্রা পরিমাপ করতে পারব।
- বায়ুর চাপ ও আর্দ্রতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বায়ুর চাপ ও আর্দ্রতার উপর তাপমাত্রা পরিবর্তনের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- পদার্থের তাপীয় সম্প্রসারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- তাপ সঞ্চালনের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব ।
- চারপাশে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনার তাপ সঞ্চালন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিকিরক ও শোষকের মধ্যে পার্থক্য করতে পারব।

পাঠ ১ : তাপ

এ মহাবিশ্বে যা কিছু আছে তাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একটি ভাগে আছে পদার্থ যাদের ওজন বা ভর আছে, জায়গা দখল করে এবং বল প্রয়োগে বাধা দেয়। অন্যভাগে আছে শক্তি। এদের কোনো ওজন নেই, জায়গা দখল করে না বা বল প্রয়োগে কোনো বাধা দেয় না। এদের আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করতে পারি। তাপ এমন এক ধরনের শক্তি। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে তাপকে কেবল ত্বক দ্বারা অনুভব করা যায়।

কাজ : প্রথমে দুটি গ্লাস নাও। গ্লাস দুটিকে ধরে দেখ কেমন ঠান্ডা বা গরম। এবার একটি গ্লাসে গরম পানি ও অন্যটিতে বরফের টুকরা নাও। দুই মিনিট অপেক্ষা কর। গ্লাস দুটি থেকে পানি ও বরফ ফেলে দাও। এবার পালা করে দুটি গ্লাস ধর। কোন গ্লাসটি কেমন অনুভব করলে? একটি গ্লাস গরম অন্যটি ঠান্ডা। এবার তোমরা আলোচনা কর, গরম গ্লাসটিতে কী এমন আছে যার কারণে গরম লাগল? অন্য গ্লাসটি কেন ঠান্ডা লাগল? এটাতে কী আছে বা নেই?

সাবধানতা: গরম পানি এমনভাবে ঢালবে, যাতে গায়ে না পড়ে। গরম পানির পাত্র বা গ্লাস খালি হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করবে না।

আমরা বলতে পারি, কোন কিছু ঠান্ডা না গরম তার পেছনে রয়েছে তাপ। তাপের কারণে কোন কিছুকে আমাদের ঠান্ডা বা গরম লাগে। বস্তু যখন তাপ গ্রহণ করে তখন তা গরম হয়। আবার বস্তু যখন তাপ বর্জন করে তখন সেটি ঠান্ডা হয়। গরম গ্লাসটি গরম পানি থেকে তাপ গ্রহন করেছে। তাই এটাকে গরম লাগছে। আবার অন্য গ্লাসটি বরফকে কিছু তাপ দিয়ে দিয়েছে। তাই এটাকে ঠান্ডা মনে হয়েছে।

পাঠ ২ : তাপমাত্রা

তোমরা জানলে তাপ হলো এক ধরনের শক্তি যার কারণে কোনো বস্তুকে গরম বা ঠান্ডা লাগে। এবার আরেকটি কাজ করা যাক

কাজ : একটি স্টিলের গ্লাস হাত দিয়ে ধরে দেখ। এটা কি ঠান্ডা না গরম তা মনে রাখ। এবার গ্লাসটিতে গরম পানি ঢেলে পূর্ণ কর। এবার দুই মিনিট পর পর কয়েকবার গ্লাসটি ধর। অনুভব করছ কি গ্লাসটি আস্তে আস্তে গরম হয়ে যাচ্ছে? এবার পানি ফেলে দিয়ে এক মিনিট পর পর গ্লাসটি ধর, গ্লাসটি ঠান্ডা হচ্ছে।

সাবধানতা: গরম পানি এমনভাবে ঢালবে যাতে গায়ে না পড়ে। গরম পানির পাত্র বা গ্লাস খালি হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করবে না। হাত দিয়ে গরম পানিপূর্ণ গ্লাস বেশিক্ষণ ধরে রাখবে না।

তোমরা দেখলে গরম পানিভর্তি গ্লাসটি ধীরে ধীরে গরম হয়েছে। আবার গরম পানি ফেলে দেওয়ার পর ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়েছে। কতটুকু গরম বা ঠান্ডা তা বোঝাতে তাপমাত্রা বা উষ্ণতা ব্যবহার করা হয়।

বেশি গরম হলে তাপমাত্রা বেশি, কম গরম হলে তাপমাত্রা কম। এভাবে তাপমাত্রা কোনো কিছুর তাপীয় অবস্থাকে প্রকাশ করে।

তাহলে তাপ ও তাপমাত্রার পার্থক্য কী বুঝলে?

তাপ হলো এক ধরনের শক্তি, যার কারণে কোনো কিছুকে ঠান্ডা বা গরম লাগে। অন্যদিকে কতটুকু ঠান্ডা বা গরম লাগছে তা প্রকাশ করার মাত্রাকে তাপমাত্রা বলে।

পাঠ ৩– ৫ : তাপমাত্রার পরিমাপ

আমরা আগের কাজটিতে দেখেছি গরম পানিপূর্ণ গ্লাসটি দুই মিনিট পরপর হাত দিয়ে ধরলে গরম ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। কোনোদিন সকালে কম গরম থাকে কিন্তু দুপুরে গরম বেশি থাকে। আমরা কোনো কিছু ধরলে বা আমাদের ত্বকের স্পর্শে কিছুটা বুঝতে পারি গরম বেড়েছে না কমেছে। কিন্তু একেবারে সঠিকভাবে বলা যায় না কতটা গরম বেড়েছে। সঠিকভাবে বলার জন্য আমরা যন্ত্রের সাহায্যে তাপমাত্রা মেপে থাকি। তাপমাত্রা পরিমাপের যন্ত্রের নাম হলো থার্মোমিটার। থার্মোমিটার ব্যবহার করে মানুষের শরীরের তাপমাত্রা মাপা হয়। আবহাওয়াবিদগণ বায়ুর তাপমাত্রা মাপার জন্য থার্মোমিটার ব্যবহার করেন। শিল্পকারখানায় নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রাখতে হয়। সেজন্য কলকারখানায়ও থার্মোমিটার ব্যবহার করে তাপমাত্রা মাপা হয়।

তাপমাত্রার পরিবর্তন হলে তরল পদার্থের আয়তন বাড়ে বা কমে। তরল পদার্থের আয়তন কতটুকু বাড়ে বা কমে তা মেপে তাপমাত্রা কতটুকু বাড়ে বা কমে গেল তা বের করা হয়। থার্মোমিটারে পারদ, অ্যালকোহল ইত্যাদি তরল ব্যবহার করে তাপমাত্রা মাপা হয়। নিচে একটি পারদ থার্মোমিটারের বর্ণনা দেওয়া হলো।

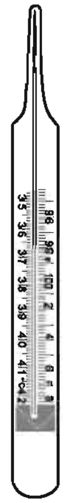

চিত্র- ৯.১ : থার্মোমিটার

পারদ থার্মোমিটার : যে থার্মোমিটারে পারদ ব্যবহার করে তাপমাত্রা মাপা হয়, তাই পারদ থার্মোমিটার। আমরা সবাই জ্বর মাপার থার্মোমিটার দেখেছি? এটি একটি পারদ থার্মোমিটার। নিচের চিত্রের মতো এ থার্মোমিটারে সরু ও সুষম ছিদ্রযুক্ত একটি সরু কাঁচনল থাকে। নলটির একপ্রান্তে পাতলা দেয়ালসহ একটি বাল্ব থাকে। বাল্বটি পূর্ণ করে ফাঁপা নলটির কিছু অংশে পারদ ভরা হয়। নলের বাকি অংশে শুধু খুব সামান্য পরিমান পারদ বাষ্প থাকে। নলটির গায়ে তাপমাত্রা পরিমাপের নির্দিষ্ট স্কেল অনুযায়ী দাগ কাটা হয়। থার্মোমিটারের নলে ছিদ্রটি খুব সরু। তাই বাল্বের তাপমাত্রা একটু বাড়লেই সরু ছিদ্র দিয়ে পারদ অনেকখানি উপরে উঠে যায়। পারদ নলের কোন দাগ পর্যন্ত উঠল তা দেখে বোঝা যায় তাপমাত্রা কতটুকু বেড়েছে।

নিজেরা কর : থার্মোমিটারের সাহায্যে জ্বর নির্ণয়।

মানুষের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৯৮.৪ ডিগ্রী ফারেনহাইট। এর চেয়ে তাপমাত্রা বেশি হলে জ্বর হয়েছে বলে ধরা হয়। একটি ডাক্তারি থার্মোমিটার ব্যবহার করে তোমার শ্রেণির পাঁচজন শিক্ষার্থীর শরীরের তাপমাত্রা মেপে খাতায় লিখ। এ থেকে সিদ্ধান্ত নাও কার জ্বর হয়েছে কিনা?

তাপমাত্রা পরিমাপের স্কেল

কোনো কিছু পরিমাপের জন্য একটি নির্দিষ্ট আদর্শমান ঠিক করে নেওয়া হয়। তারপর সেই আদর্শ মানের সাথে তুলনা করে নতুন কোনো কিছুর পরিমাপ বের করা হয়। তাপমাত্রা পরিমাপের এ রকম আদর্শ মান আছে। এক্ষেত্রে দুটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ব্যবধানের একটি অংশকে আদর্শমান ধরে নেওয়া হয়। এই দুটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রাকে স্থিরাঙ্ক বলে। একটিকে নিম্ন স্থিরাঙ্ক ও অন্যটিকে উর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক বলে।

নিম্ন স্থিরাঙ্ক: স্বাভাবিক চাপে যে তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ বরফ গলে পানিতে পরিণত হয়, সেই তাপমাত্রাকে নিম্ন স্থিরাঙ্ক বলে।

উর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক: স্বাভাবিক চাপে যে তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ পানি ফুটে বাষ্পে পরিণত হয়, সেই তাপমাত্রাকে উর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক বলে।

উর্ধ্ব ও নিম্ন স্থিরাঙ্কের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে বিভিন্ন সংখ্যক সমান অংশে ভাগ করা যায়। এ ব্যবধানকে কয়টি সমান অংশে ভাগ করা হলো তার ভিত্তিতে বিভিন্ন স্কেল পাওয়া যায়। তাপমাত্রা পরিমাপের দুইটি স্কেল প্রচলিত। নিচে এ দুটি স্কেল ব্যাখ্যা করা হলো।

সেলসিয়াস স্কেল: এ স্কেলে নিম্ন স্থিরাঙ্ককে ০ ডিগ্রি (০°) এবং উর্ধ্ব স্থিরাঙ্ককে ১০০ ডিগ্রি (১০০°) ধরা হয়। মধ্যবর্তী ব্যবধানকে সমান একশত ভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক ভাগকে এক ডিগ্রি সেলসিয়াস (১° সে.) বলা হয়।

বিজ্ঞানী সেলসিয়াস এ স্কেল উদ্ভাবন করেন বলে তার নাম অনুসারে এ স্কেলটিকে সেলসিয়াস স্কেল বলা হয়। বৈজ্ঞানিক কাজে এ স্কেল ব্যবহার করা হয়। এছাড়া অন্যান্য কাজেও বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ স্কেল ব্যবহার করা হয়। যেমন আবহাওয়ার খবরে বলা হয়, দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মধ্যবর্তী দূরত্বকে ১০০ ভাগে ভাগ করা হয় বলে একে সেন্টিগ্রেড (Centi অর্থ একশত এবং grade অর্থ ভাগ) স্কেলও বলা হয়।

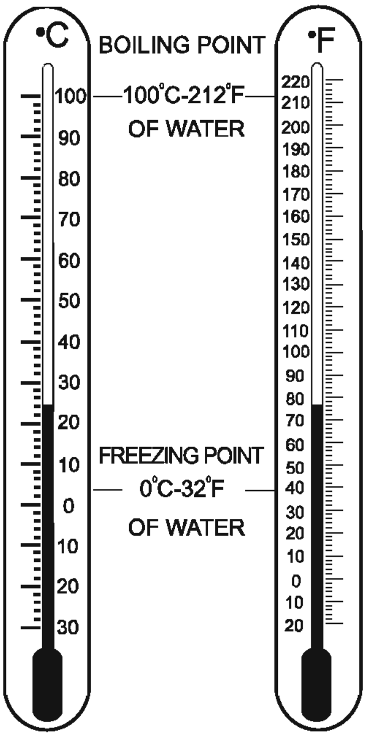
°C
BOILING POINT
°F
100°C-212°F
OF WATER
FREEZING POINT
0°C-32°F
OF WATER
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
10
20
30
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
10
20

চিত্র-৯.২ : সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট স্কেল

ফারেনহাইট স্কেল : এ স্কেলে নিম্ন স্থিরাঙ্ককে ৩২ ডিগ্রি (৩২°) এবং উর্ধ্ব স্থিরাঙ্ককে ২১২ ডিগ্রি (২১২°) ধরা হয়। মধ্যবর্তী ব্যবধানকে সমান ১৮০ ভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক ভাগকে এক ডিগ্রী ফারেনহাইট (১° ফা.) বলা হয়।

বিজ্ঞানী ফারেনহাইট এ স্কেল উদ্ভাবন করেন বলে তার নাম অনুসারে এ স্কেলকে ফারেনহাইট স্কেল বলা হয়। যেমন জ্বর হলে কেউ হয়তো বলে থাকেন যে, জ্বর ১০১ ডিগ্রি। আসলে গায়ের তাপমাত্রা ছিল ১০১ ডিগ্রি ফারেনহাইট।

সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট স্কেলের সম্পর্ক

সেলসিয়াস স্কেলে তাপমাত্রা জানা থাকলে আমরা তাকে ফারেনহাইট স্কেলে রূপান্তর করতে পারি। আবার উল্টোটাও করা যায়। এর জন্য আমাদের একটি সমীকরণ জানতে হবে। সমীকরণটি হল $\frac{C}{5} = \frac{F-32}{9}$ যেখানে C হলো সেলসিয়াস স্কেলে তাপমাত্রা এবং F হলো ফারেনহাইট স্কেলে তাপমাত্রা।

এবার একটি উদাহরণ দেখা যাক।

উদাহরণ : বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের একজন খেলোয়াড় অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লো। সেখানকার ডাক্তার তার গায়ের তাপমাত্রা মেপে বললো তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ফারেনহাইট স্কেলে ঐ খেলোয়াড়ের তাপমাত্রা কত?

আমরা জানি $\frac{C}{5} = \frac{F-32}{9}$

এখানে $C = 38$

সুতরাং $\frac{38}{5} = \frac{F-32}{9}$

বা, $5 \times (F-32) = 9 \times 38$

বা, $F-32 = 342/5$

বা, $F = 68.4+32=100.4$

অর্থাৎ ফারেহাইট স্কেলে ঐ খেলোয়াড়ের তাপমাত্রা ১০০.৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট ।

কাজ : একটি সেলসিয়াস স্কেল ও সাধারণ জ্বর মাপার একটি ফারেন হাইট স্কেল নাও। ক্লাসের ৫জন বন্ধুর গায়ের তাপমাত্রা ফারেনহাইট স্কেল ব্যবহার করে পরিমাপ কর। পরিমাপকৃত তাপমাত্রা সূত্র ব্যবহার করে সেলসিয়াস স্কেলে রূপান্তর করে নিচের ছক (নিজের খাতায় ছকটি করে নিতে হবে) পূরণ কর।

শিক্ষার্থীর নাম	ফারেনহাইট স্কেলে তাপমাত্রা	সেলসিয়াস স্কেলে তাপমাত্রা	মন্তব্য
১।			
২।			

পাঠ ৬, ৭ : তাপের প্রভাবে পদার্থের প্রসারণ

তাপ প্রয়োগ করলে অধিকাংশ পদার্থের আয়তন বাড়ে। কঠিন পদার্থ খুব অল্প পরিমাণে বাড়ে । বেশিরভাগ তরল পদার্থকে তাপ দিলে তা খুব বেশি প্রসারিত হয় না। তবে বায়বীয় পদার্থকে তাপ দিলে তা অনেকটা প্রসারিত হয়।

কঠিন পদার্থের প্রসারণ:

কাজ : কঠিন পদার্থের প্রসারণের প্রমাণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : পিতলের তৈরি বল ও রিং, মোমবাতি, দিয়াশলাই, চিমটা ও স্ট্যান্ড।

পিতলের একটি বল ও রিং এমনভাবে তৈরি করা হয়, যাতে বলটি কোনো রকমে রিং-এর ভিতর দিয়ে চলে যায়। চিত্রের মতো করে স্ট্যান্ডে রিং ও বল যুক্ত কর। এবার বলটি স্বাভাবিক অবস্থায় রিং-এর ভেতর দিয়ে নিয়ে যেতে চেস্টা কর। দেখবে বলটি রিং এর ভিতর দিয়ে চলে গেছে। এবার বলটি বের করে নিয়ে আস। মোমবাতি জ্বালিয়ে বলটিকে গরম করো। সাবধানে চিমটার সাহায্যে উত্তপ্ত বলটিকে রিং-এর ভিতরে নেয়ার চেস্টা কর। বলটি কি রিং-এর ভিতর দিয়ে চলে যাচ্ছে? যাচ্ছে না, আটকে গেছে।

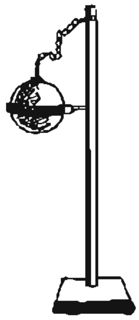

চিত্র-৯.৩: কঠিন পদার্থের প্রসারণ

সতর্কতা : উত্তপ্ত বস্তু নিয়ে কাজ করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

গরম করার ফলে পিতলের বলটি কেন রিং এর ভিতরে ঢুকছে না? এর কারণ বলটি কিছুটা বড় হয়েছে। তাপ পাওয়ার ফলে বলটি কিছুটা বড় হয়ে গেছে। এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, তাপ প্রয়োগে কঠিন পদার্থ প্রসারিত হয়। কিন্তু এ প্রসারণ খুব বেশি নয় বলে আমরা সহজে বুঝতে পারি না। কঠিন পদার্থের মধ্যে তাপ প্রয়োগে সাধারণত ধাতব পদার্থ বেশি পরিমাণে প্রসারিত হয়।

দৈনন্দিন জীবনে কঠিন পদার্থের প্রসারণের প্রভাব

নিচের উদাহরণগুলো থেকে বোঝা যাবে আমরা দৈনন্দিন জীবনে পদার্থের প্রসারণকে কীভাবে কাজে লাগাই।

(১) কখনো কি দেখেছ জ্যামের, সসের বা অন্য কোনো কিছুর কাচের বোতলের বা শিশির ধাতব মুখটি খোলা যাচ্ছে না? এরকম অবস্থায় সাধারণত বোতলের ধাতব মুখটি গরম করা হয়। তারপর তা মোচড় দিলে সহজেই খুলে আসে। কেন সহজে মুখটি খুলে আসে? কারণ ধাতব মুখটি তাপ পেয়ে প্রসারিত হয়ে বোতল থেকে কিছুটা আলগা হয়ে যায়। তাই এটি সহজে খুলে আসে।

(২) তোমরা কী রেল লাইন দেখেছ? দুটি সমান্তরাল লোহার পাতের উপর দিয়ে রেল চলে। খেয়াল করবে, দুটি লোহার পাতই কিছু দূর পরপর কাটা। আসলে ইচ্ছে করেই লোহার পাতের অংশের মধ্যে কিছুটা ফাঁক

রাখা হয়েছে। রেলগাড়ি চলার সময় রেলের লোহার চাকার সাথে ঘর্ষণে লোহার পাত গরম হয়ে যায়। এতে লোহার পাত কিছুটা বেড়ে যায়। লোহার পাতের সংযোগস্থানে ফাঁক না থাকলে তা বেঁকে যেত। ফাঁক থাকায় লোহার পাত বেড়ে ফাঁকটুকু পূরণ করে। এতে লোহার পাত বেঁকে যায় না।

তরল পদার্থের প্রসারণ : কঠিন পদার্থের তুলনায় তরল আয়তনে বেশি বাড়ে। তরল ধাতু পারদের প্রসারণকে কাজে লাগিয়ে থার্মোমিটার তৈরি করা হয়। তোমরা এ সম্পর্কে ইতোমধ্যেই জেনেছ। তোমরা জলবায়ু পরিবর্তন অধ্যায়ে জানবে যে, পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। ফলে সমুদ্রের পানির আয়তন বেড়ে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে।

বায়বীয় পদার্থের প্রসারণ :

উপকরণ : একটি কাচের বোতল, দুটি পানির পাত্র, গরম ও ঠান্ডা পানি, বেলুন, সুতা।

কাজ : একটি শক্ত ও খালি কাচের বোতল নাও। বেলুনটি না ফুলিয়ে বোতলের মুখে লাগিয়ে দিয়ে সুতা দিয়ে বেঁধে দাও। একটি পাত্রে ফুটন্ত গরম পানি এবং অপরটিতে ঠান্ডা পানি নাও। এবার বোতলটি সাবধানে গরম পানিতে ডুবাও। কী দেখছো? বেলুনটি কিছুটা ফুলে উঠেছে? এবার বোতলটি ধরে ঠান্ডা পানিতে ডুবাও। বেলুনটি কি চুপসে গেছে? কেন এমন হচ্ছে?

সতর্কতা : ফুটন্ত পানি ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হবে।

বায়বীয় পদার্থ তাপ পেলে সবচেয়ে বেশি বাড়ে। বোতলটি গরম পানিতে ডুবালে বোতলের ভেতরের বায়ু তাপ পেয়ে প্রসারিত হচ্ছে। ফলে বোতলের বায়ু বেলুনে প্রবেশ করে কিছুটা ফুলে উঠছে। আবার যখন বোতলটি ঠান্ডা পানিতে ডুবানো হলে বোতলের ভেতরের বায়ু সংকুচিত হচ্ছে। ফলে বেলুনের বায়ু বোতলের ভেতরে ফিরে আসছে। তাই বেলুনটি চুপসে যাচ্ছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাপ পেলে বায়বীয় পদার্থ প্রসারিত হয়।

বায়বীয় পদার্থের প্রসারণের প্রভাব: বায়বীয় পদার্থের প্রসারণের প্রভাব প্রকৃতিতে এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বেশ দেখতে পাওয়া যায়। তোমরা কি রুটি সেঁকতে দেখেছ? এক পর্যায়ে রুটি বেশ ফুলে উঠে। রুটিটি একটু ছিদ্র করে দিলে শব্দ করে কিছু বেরিয়ে আসে। কেন এরকম হয়? তোমরা জানো আটার সাথে পানি মিশিয়ে রুটি তৈরি করা হয়। রুটির ভিতরের পানি গরম হয়ে জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। জলীয় বাষ্প আরও তাপ পেয়ে প্রসারিত হয়। ফলে রুটিটি ফুলে উঠে।

তাপের ফলে গ্যাসের প্রসারণকে কাজে লাগিয়ে ইঞ্জিন চালানো হয়। তোমরা বড় হয়ে আরও ভালোভাবে বুঝবে। ইঞ্জিন চালানোর জন্য জ্বালানি পুড়িয়ে তাপ দিয়ে বায়ুকে প্রসারিত করা হয়। প্রসারিত বায়ু যে ধাক্কা দেয় তাকে ব্যবহার করে ইঞ্জিন চালানো হয়।

তাপের ফলে বায়ু প্রসারিত হওয়ার কারণে বায়ুমন্ডলে অনেক পরিবর্তন হয়। নিচে এ সম্পর্কে আমরা জানবো।

পাঠ–৮ : আর্দ্রতা ও বায়ুচাপের উপর তাপমাত্রার প্রভাব

বায়ুতে বায়ুকণাগুলো ছুটোছুটি করতে থাকে। তাই তারা কোনো কিছুতে বাধা পেলে তাতে ধাক্কা দেয় বা বল প্রয়োগ করে। ফলে বায়ুর চাপ রয়েছে। একক ক্ষেত্রফলের উপর বায়ু যে বল প্রয়োগ করে তাই

বায়ুচাপ। বায়ু সবদিকে চাপ দেয়। কোনো স্থানের বায়ুচাপ নির্ভর করে সেখানকার তাপমাত্রার উপর। তাপমাত্রা বাড়লে কোনো বদ্ধ পাত্রে বায়বীয় পদার্থের চাপ বেড়ে যায়। কিন্তু বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা বাড়লে বায়ুচাপ কমে যায়। এর কারণ বায়ুমণ্ডল বদ্ধ পাত্র নয়; এটি খোলা। তাপ পেলে বায়ু হালকা হয়ে উপরে উঠে যায়। ফলে বায়ুর ঘনত্ব কমে যায় ও বায়ুচাপ কমে যায়। তাই কোনো স্থানে তাপমাত্রা বেড়ে গেলে বায়ুচাপ কমে যায় অর্থাৎ নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। আর যেখানে তাপমাত্রা কম, সেখানে উচ্চচাপের সৃষ্টি হয়। তোমরা জলবায়ু পরিবর্তন অধ্যায়ে দেখবে কীভাবে নিম্নচাপ ও উচ্চচাপের ফলে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়।

জলীয় বাষ্প, বায়ুর আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা : তোমরা জান যে, ভূপৃষ্ঠের পানি বাষ্প হয়ে বায়ুতে মিশে। বায়ুতে সব সময়ই এভাবে কিছু পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকে। বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণকে বায়ুর আর্দ্রতা দিয়ে প্রকাশ করা হয়। বায়ুতে জলীয় বাষ্প বেশি থাকলে বায়ুর আর্দ্রতা বেশি হয়। জলীয় বাষ্প কম থাকলে বায়ুর আর্দ্রতা কম। তাপমাত্রা বাড়লে পানি বেশি করে বাষ্পে পরিণত হয়। আবার তাপমাত্রা বাড়লে বায়ুও বেশি করে জলীয় বাষ্প ধারণ করতে পারে। আমাদের দেশে শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে ভ্যাপসা গরম পড়ে। কারণ তখন মৌসুমী বায়ু বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প উড়িয়ে নিয়ে আসে। জলীয় বাষ্প বা আর্দ্রতা বেশি থাকলে আমাদের গায়ে ঘাম হয়। বায়ুতে জলীয় বাষ্প বেড়ে গেলে এক পর্যায়ে তা ঘনীভূত হয়ে মেঘ এবং শেষে বৃষ্টি হয়।

পাঠ ৯–১০ : তাপ সঞ্চালন

তোমরা কী কখনো খেয়াল করেছ, গরম তরকারির বাটিতে স্টিলের চামচ রাখা থাকলে তা গরম হয়ে যায়? তরকারি থেকে তাপ কীভাবে তোমার হাত পর্যন্ত এলো? তাপ বেশি তাপমাত্রার স্থান থেকে কম তাপমাত্রার স্থানে যেতে পারে। তাপের এই স্থান পরিবর্তনকে তাপ সঞ্চালন বলে। তাপ সঞ্চালন তিন ভাবে হয়–পরিবহন, পরিচলন ও বিকিরণ।

তাপ পরিবহন : গরম তরকারির বাটি থেকে চামচের মাধ্যমে তাপ পরিবহন পদ্ধতিতে সঞ্চালিত হয়। এ পদ্ধতিতে কঠিন পদার্থে তাপ সঞ্চালিত হয়। তোমরা জান, কঠিন পদার্থের কণাগুলো নিজেরা স্থান পরিবর্তন করতে পারে না। তারা কেবল নিজেদের স্থানে থেকে দোল খেতে পারে। কঠিন পদার্থে গরম কণাগুলো দোল খেয়ে পাশের ঠান্ডা কণাকে তাপ দিয়ে দেয়। পাশের ঠান্ডা কণাটি গরম হয়ে তার পাশের ঠান্ডা কণাকে তাপ দেয়। এভাবে কণাগুলো নিজেরা স্থান পরিবর্তন না করে তাপকে গরম প্রান্ত থেকে ঠান্ডা প্রান্তে নিয়ে যায়।

কঠিন পদার্থের মধ্যে ধাতব পদার্থগুলো যেমন লোহা, তামা, পিতল, অ্যালুমিনিয়াম, দস্তা এগুলো দ্রুত তাপ পরিবহন করে। তাই রান্নার জন্য ধাতুর তৈরি হাঁড়ি ব্যবহার করা হয়। অধাতু যেমন কাঠ, সুতি কাপড়, মাটি এসব তাপ পরিবহন করে খুবই কম। তাই গরম হাড়ি ধরার জন্য আমরা কাপড়ের টুকরা ব্যবহার করি। একই কারণে রান্নার জন্য কাঠের নাড়ানি ব্যবহার সুবিধাজনক।

তাপ পরিচলন : তরল ও বায়বীয় পদার্থে এ প্রক্রিয়ায় তাপ সঞ্চালিত হয়। একটি পাত্রে পানি নিয়ে চুলার উপরে বসিয়ে তাপ দিলে পুরো পাত্রের পানিই গরম হতে থাকে। এক্ষেত্রে পানির কণাগুলো তাপ গ্রহণ করে শক্তি অর্জন করে। শক্তি অর্জন করে গরম পানিকণা হালকা হয়ে উপরে উঠে যায়। উপরের ঠাণ্ডা পানি কণাগুলো নিচে নেমে এসে তাপ গ্রহণ করে। এভাবে পর্যায়ক্রমে সকল কণা তাপ গ্রহণ করে উত্তপ্ত হয়, তাপ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সঞ্চালিত হয়। এভাবে কণাদের স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে তাপ সঞ্চালনের প্রক্রিয়ার নাম পরিচলন। তরল পদার্থের কণার মতো বায়বীয় পদার্থের কণারাও উত্তপ্ত হয়ে সহজেই স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে তাপ সঞ্চালন করে। তোমরা কি কখনো শীতে আগুনের পাশে দাঁড়িয়েছ? শীতের সময়ে গ্রামে মানুষ কাঠ বা ডালপালা জ্বেলে আগুন পোহায়। আগুনের পাশে দাঁড়ালে আমাদের কিছুটা গরম লাগে। কিন্তু তুমি যদি তোমার হাতটা সাবধানে আগুনের ঠিক উপরে নাও, তাহলে দেখবে বেশি তাপ লাগছে। কারণ পরিচলন পদ্ধতিতে বায়ুর কণা উত্তপ্ত হয়ে উপরের দিকে উঠে, পাশে আসে না। তাই আগুনের পাশের থেকে উপরে তাপ বেশি অনুভূত হয়।

তাপ বিকিরণ : সূর্য তাপের মূল উৎস। সূর্য আর পৃথিবীর মাঝখানে প্রায় সবটুকুই ফাঁকা। কোনো বায়বীয় পদার্থও নেই। তাহলে সূর্য থেকে তাপ কীভাবে আমাদের কাছে এসে পৌছায়? সূর্য থেকে তাপ আসে বিকিরণের মাধ্যমে। যেখানে কোনো জড় মাধ্যম নেই সেখানে তাপ বিকিরণের মাধ্যমে সঞ্চালিত হয়। তোমরা উপরের শ্রেণিতে জানবে যে তাপ এক রকমের তরঙ্গ, যা কোনো মাধ্যম ছাড়া উত্তপ্ত স্থান থেকে শীতল স্থানে যেতে পারে। বিকিরণের সময় তাপ তরঙ্গাকারে সঞ্চালিত হয়। আসলে মাধ্যম থাকুক বা না থাকুক, উত্তপ্ত বস্তু বিকিরণ পদ্ধতিতে তাপ নির্গত করে।

কিছু পদার্থ সহজে তাপ বিকিরণ করে, এদেরকে বলে বিকিরক। বিকিরক পদার্থ তাপ বিকিরণ করে ঠাণ্ডা হয়ে যেতে চায়। বিকিরক পদার্থ তাপ শোষণও করে। আবার কিছু পদার্থ তাপ শোষণ করে নেয়, তাদেরকে বলে শোষক। শোষক তাপ শোষণ করে উত্তপ্ত হয়। তরল পানি, জলীয় বাষ্প, কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, কাঁচ, প্লাস্টিক এসব পদার্থ তাপ শোষণ করে নেয়।

সূর্য তাপ বিকিরণ করে, তাই একে আমরা বিকিরক বলতে পারি। পৃথিবী সূর্যের তাপ শোষণ করে উত্তপ্ত হয়। পৃথিবীকে শোষক বলতে পারি। কিন্তু পৃথিবী একইসাথে বিকিরক। রাতের বেলায় উত্তপ্ত পৃথিবী তাপ বিকিরণ করে শীতল হয়। তোমরা জলবায়ু পরিবর্তন অধ্যায়ে জানবে বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইড, জলীয় বাষ্প, মিথেন–এসব গ্যাস বিকিরিত তাপের শোষক হিসেবে কাজ করে আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করছে।

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- তাপ হলো এক ধরনের শক্তি যার কারণে কোনো কিছুকে ঠাণ্ডা বা গরম লাগে। অন্যদিকে, তাপমাত্রা প্রকাশ করে কতটুকু গরম বা ঠাণ্ডা লাগছে।

- সাধারণ কাজে তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য পারদ থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয়। তাপমাত্রার দুটি স্কেল বেশি প্রচলিত – সেলসিয়াস স্কেল ও ফারেনহাইট স্কেল।
- তাপ প্রয়োগে পদার্থ সাধারণত প্রসারিত হয়। কঠিন ও তরল পদার্থ কম পরিমাণে প্রসারিত হয়, কিন্তু বায়বীয় পদার্থ তাপে বেশি প্রসারিত হয়।
- তাপমাত্রার পরিবর্তনে বায়ুর চাপ ও আর্দ্রতার পরিবর্তন হয়, যা আবহাওয়ার পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে।
- তাপ তিন প্রক্রিয়ায় সঞ্চালিত হয়- পরিবহন, পরিচলন ও বিকিরণের মাধ্যমে।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. তরল ও বায়বীয় মাধ্যমে তাপ ———————— প্রক্রিয়ায় সঞ্চালিত হয়।

২. স্বাভাবিক চাপে যে তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ পানি ফুটে বাষ্পে পরিণত হয়, সেই তাপমাত্রাকে ———————— স্থিরাঙ্ক বলে।

৩. সেলসিয়াম স্কেলের নিম্ন স্থিরাঙ্ক ———————— ডিগ্রি সেলসিয়াম।

৪. ফারেনহাইট স্কেলে নিম্ন স্থিরাঙ্ক ———————— ডিগ্রি ফারেনহাইট।

৫. জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকলে বায়ুর ———————— কম থাকে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. তাপ ও তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্য কী?

২. রেললাইনের পাতের সংযোগস্থলে কিছুটা ফাঁকা রাখা হয় কেন?

৩. আগুনের পাশে দাঁড়ালে যতটা গরম লাগে, আগুনের ঠিক উপরে হাত রাখলে তার চেয়ে অনেক বেশি গরম লাগে। এ রকম হয় কেন?

৪. রান্না করার গরম হাড়ি খালি হাতে না ধরে কাপড়ের টুকরা দিয়ে ধরা হয় কেন?

৫. তাপমাত্রা বাড়লে বায়ুমন্ডলের চাপ কমে যায় কেন?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি বায়ুমন্ডলে ভালো শোষক হিসেবে কাজ করে?

ক. নাইট্রোজেন খ. জলীয় বাষ্প গ. অক্সিজেন ঘ. ধূলিকণা

২. তাপমাত্রার বৈশিষ্ট্য হলো, এটি–

ক. অনুভব করা যায় খ. পরিমাপ যোগ্য গ. এক ধরনের শক্তি ঘ. বল প্রয়োগে বাঁধা দেয়

নিচের ছবিটি ভালোভাবে লক্ষ্য কর এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

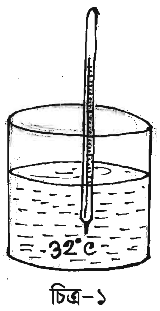

চিত্র–১

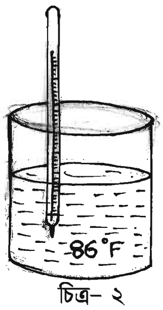

চিত্র– ২

৩. ২ নম্বর চিত্রের থার্মোমিটারের–

i. নিম্নস্থিরাঙ্ক ৩২° F   ii. মৌলিক ভাগ ২০০
iii. উর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক ২৩২° F

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i   খ. ii   গ. i ও ii   ঘ. i, ii ও iii

৪. চিত্র–১ ও চিত্র–২ এর তরলকে তাপীয় সংস্পর্শে রাখলে কী ঘটবে?

ক. তাপের প্রবাহ চিত্র ১ থেকে ২ এর দিকে হবে   খ. তাপের প্রবাহ চিত্র ২ থেকে ১ এর দিকে হবে
গ. তাপের প্রবাহ চলতেই থাকবে   ঘ. উভয়ের তাপমাত্রা কক্ষ তাপমাত্রায় পৌঁছবে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. শারমিন ৭ম শ্রেণিতে পড়ে। একদিন সন্ধ্যায় সে জ্বর জ্বর বোধ করল। অতঃপর তার বাসায় রক্ষিত সেলসিয়াস থার্মোমিটার দিয়ে গায়ের তাপমাত্রা মেপে দেখল ৩৭° সেলসিয়াস। শারমিন ফারেনহাইট স্কেলে জ্বরের তাপমাত্রা বুঝতে পারলেও সেন্টিগ্রেড স্কেলে এ তাপমাত্রা বুঝতে পারল না। তাই চিন্তিত হয়ে ডাক্তারের কাছে গেল। ডাক্তার থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা মেপে বলল যে তার জ্বর নেই।

ক. তাপমাত্রা কী?
খ. পারদ থার্মোমিটারে পারদ ব্যবহারের সুবিধা ব্যাখ্যা কর।
গ. শারমিনের গায়ের তাপমাত্রা ফারেনহাইট স্কেলে কত ছিল?
ঘ. ফারেনহাইট ও সেন্টিগ্রেড স্কেলের সম্পর্ক জানা থাকলে শারমিনের কী ডাক্তারের কাছে যেতে হতো? যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা কর।

২. আনিকা অল্পবয়সের হলেও দৈনন্দিন জীবনে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা সে মনোযোগসহকারে পর্যবেক্ষণ করে। একদিন সে ভাত রান্নার সময় পাতিলের বুদবুদের ধাক্কায় ঢাকনাটি পড়ে যেতে দেখলো। অন্যদিকে তাদের কাঠের দরজায় গ্রীষ্মকালে কোনো ফাঁক না থাকলেও শীতকালে কিছু ফাঁক লক্ষ করল। উল্লিখিত দুটো ঘটনাই তাকে ভাবিয়ে তুলল।

ক. কোন পদার্থ তাপে সবচেয়ে বেশি প্রসারিত হয়?
খ. রেললাইনের সংযোগ স্থলে ফাঁক রাখা হয় কেন?
গ. ভাত রান্নার সময় আনিকার পর্যবেক্ষণকৃত ঘটনাটির কারণ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. আনিকার পর্যবেক্ষণকৃত কাঠের দরজার শীত ও গ্রীষ্মে দৈত হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ কর।

দশম অধ্যায়

বিদ্যুৎ ও চুম্বকের ঘটনা

বিদ্যুৎ আমাদের বাড়ি, স্কুল বা অফিসকে আলোকিত করছে। চালাচ্ছে ফ্যান, রেডিও-টেলিভিশন, ইস্ত্রি, হিটার, মোটর, কম্পিউটার ও আরও অনেক কিছু। বিদ্যুতের পাশাপাশি চুম্বকের ব্যবহারও আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা বিদ্যুৎ ও চুম্বক-সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোকপাত করব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- চার্জের ধর্ম ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবাহী, অপরিবাহী ও অর্ধপরিবাহী ব্যাখ্যা করতে পারব।
- স্থির বিদ্যুৎ সৃষ্টির মাধ্যমে চার্জের ধর্ম প্রদর্শন করতে পারব।
- স্থির বিদ্যুৎ হতে চল বিদ্যুৎ সৃষ্টির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- একটি সরল বর্তনী তৈরি করতে পারব।
- নিত্য ব্যবহার্য যন্ত্রপাতিতে বিদ্যুৎতের ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব।
- চুম্বকের ধর্ম প্রদর্শনের মাধ্যমে চৌম্বক ও অচৌম্বক পদার্থের মধ্যে পার্থক্য করতে পারব।
- চৌম্বক পদার্থকে চুম্বকে পরিণত করার প্রক্রিয়া প্রদর্শন করতে পারব।
- বৈদ্যুতিক চুম্বক ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ – ১ ও ২ : আধান বা চার্জের উৎপত্তি

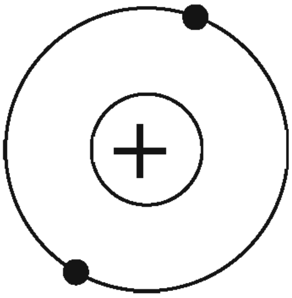

চিত্র-১০.১

আমরা জানি পদার্থ কতগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সমন্বয়ে গঠিত, যার নাম পরমাণু। ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের সমন্বয়ে পরমাণু গঠিত। পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস, যা প্রোটন ও নিউট্রনের সমন্বয়ে গঠিত। ইলেকট্রন এই নিউক্লিয়াসের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে। প্রোটন ধনাত্বক (+) আধানযুক্ত, ইলেকট্রন ঋণাত্বক (–) আধানযুক্ত এবং নিউট্রন হলো নিরপেক্ষ কণা।

কিন্তু মজার ব্যাপার হলো পরমাণু নিজে কিন্তু নিরপেক্ষ আচরণ করে। পরমাণু ধনাত্বক বা ঋণাত্বক কোনোটাই নয়। পরমাণুতে কোনো চার্জ থাকে না। এর কারণ কী? কারণ হলো একটি পরমাণুতে যে কয়টি প্রোটন থাকে, সেই কয়টিই ইলেকট্রন থাকে। যার ফলে পরমাণু চার্জ বা আধান নিরপেক্ষ হয়। কিন্তু যখনই দুটো পদার্থকে ঘর্ষণ করা হয়, তখন একটি পদার্থের ইলেকট্রন অন্য একটি পদার্থে চলে যেতে পারে। ফলে একটি পদার্থে ইলেকট্রনের আধিক্য দেখা দিতে পারে। এবার একটি উদাহরণ দেয়া যাক। একটি কাঁচের বোতলকে এক টুকরা সিল্কের কাপড় দ্বারা ঘর্ষণ করা হলো। এতে দেখা যাবে সিল্কের কাপড় কাঁচ থেকে ইলেকট্রনকে আকর্ষণ করে তার দিকে নিয়ে গেছে। এতে বোতলটি ধনাত্বক আধানযুক্ত এবং সিল্কের কাপড়টি ঋণাত্বক আধানযুক্ত হয়েছে। তাহলে একটা ব্যাপার এখানে স্পষ্ট যে ঘর্ষণের ফলে নতুন কোনো আধানের সৃষ্টি হয় না বরং পদার্থের মধ্যে বিদ্যমান আধান এক পদার্থ থেকে অন্য পদার্থে চলে যায়।

আধান বা চার্জের ধর্ম

আমরা এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছি, কীভাবে আধানের উৎপত্তি হয়। এবার আমরা দেখব এই আধানগুলো (ধনাত্বক ও ঋণাত্বক) কিরূপ ধর্ম প্রদর্শন করে। এর জন্য আমরা নিচের কাজগুলো করবো।

কাজ: চার্জের ধর্ম জানা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ: দুটি চিরুনি ও পশমি কাপড়।

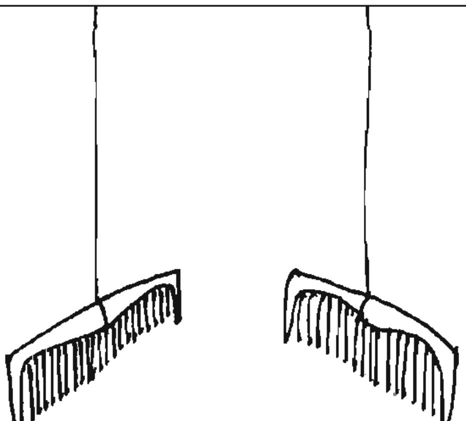

চিত্র-১০.২ : চার্জের ধর্ম জানা

পদ্ধতি: একটি ছোট প্লাস্টিকের চিরুনিকে সুতা দিয়ে বেধে একটি শুকনো কাঠির মাথায় ঝুলিয়ে দাও। এটি এমনভাবে ঝুলতে হবে যাতে আশেপাশে কোনো কিছু স্পর্শ না করে। এবার আরেকটি শুকনো কাঠির মাথায় অন্য একটি প্লাস্টিকের চিরুনি ঝুলাও যাতে এটা মুক্তভাবে ঝুলতে থাকে। এবার উভয় চিরুনিকে কিছুক্ষণ পশমি কাপড় দিয়ে ঘষ। এখন চিরুনি দুটিকে কাছাকাছি আন। কী লক্ষ করছ? চিরুনি দুটি পরস্পরকে বিকর্ষণ করছে। এবার পশমি কাপড়টি চিরুনির কাছে এনে দেখ এটি চিরুনির কাছে চলে আসবে।

কাজ: চার্জের ধর্মের প্রদর্শন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ: দুটি বেলুন, সুতা, উলের কাপড় অথবা গায়ের সোয়েটার ও কাগজের টুকরা।

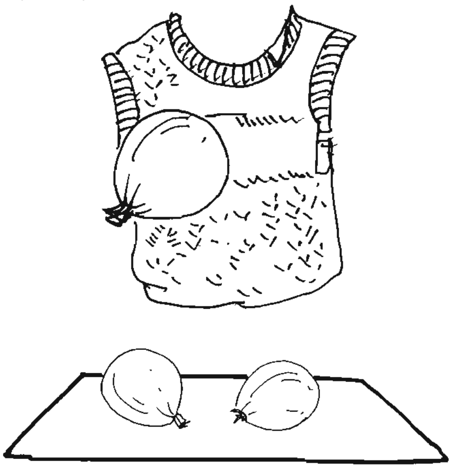

চিত্র-১০.৩ : চার্জের ধর্মের প্রদর্শন

পদ্ধতি: দুটি বেলুনকে ফুলিয়ে সুতো দিয়ে ভালোভাবে বেঁধে নাও। এবার একটি বেলুনকে উলের কাপড় বা সোয়েটার দিয়ে ঘষে কাগজের টুকরার কাছে ধরলে দেখা যাবে বেলুন কাগজের টুকরোগুলো কাছে টেনে নিচ্ছে। পুনরায় দ্বিতীয় বেলুনটিকে উলের কাপড় বা গায়ের সোয়েটারর সাথে চেপে ধরলে দেখা যাবে বেলুনটি কাপড়ের গায়ে লেগে আছে। এর কারণ কী? কারণ ঘর্ষণের ফলে উলের কাপড় ও বেলুনে বিপরীতধর্মী আধানের সৃষ্টি হয়েছে। এবার যখন দ্বিতীয় বেলুনকে প্রথম বেলুনের কাছে নেওয়া হবে তখন কী দেখবে? দেখবে যে চিত্রের ন্যায় দুটি বেলুন পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কারণ ঘর্ষণের ফলে দুটি বেলুনেই একই ধরনের আধানের সৃষ্টি হয়েছে।

উপরোক্ত কাজগুলো থেকে তুমি কি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পার? হ্যাঁ, এর থেকে দুটি সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়:

ক) সমধর্মী আধান পরস্পরকে বিকর্ষণ করে (দুটি বেলুন অথবা দুটি চিরুনির ক্ষেত্রে)।

খ) বিপরীতধর্মী আধান পরস্পরকে আকর্ষণ করে (উলের কাপড় ও বেলুন)

পাঠ – ৩: চার্জের অস্তিত্ব

এবার আমরা একটি সহজ কাজের মাধ্যমে আধানের অস্তিত্বের প্রমাণ করব।

কাজ: আধানের অস্তিত্বের প্রমাণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ: একটি প্লাস্টিকের চিরুনি ও খবরের কাগজের টুকরো।

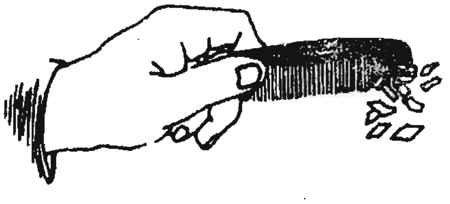

চিত্র-১০.৪ : চার্জের অস্ড়িত্বের প্রমাণ

পদ্ধতি: একটি খবরের কাগজের কিছু অংশ কেটে ছোট ছোট টুকরো কর। এবার কাগজের টুকরোগুলোকে টেবিলের উপর ছড়িয়ে দাও। এবার বলতে পারবে একটি প্লাস্টিকের চিরুনিকে খবরের কাগজের টুকরাগুলোর কাছে আনলে কী ঘটবে? এবার চিরুনিকে পশম বা উলের কাপড় (এমনকি তোমার শুকনো চুলেও ঘষে দেখতে পার) দিয়ে ঘষে আবার কাগজের টুকরোর সামনে ধর। বলতে পারবে কি ঘটবে এবং কেন? দেখবে কাগজের টুকরোগুলো লাফিয়ে চিরুনির কাছে চলে আসবে। এখানে প্লাস্টিকের চিরুনি ঘর্ষণের ফলে পশম বা উলের কাপড়ের পরমাণু থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করে নিজে ঋণাত্মক চার্জিত হয়েছে যার ফলে সহজেই কাগজের টুকরোগুলোকে আকর্ষণ করতে পারছে।

২০১৬

পাঠ–৪ : পরিবাহী, অপরিবাহী ও অর্ধ–পরিবাহী

আমরা পরিবাহী ও অপরিবাহী শব্দ দুটির সাথে পরিচিত। পরিবাহী পদার্থের ইলেকট্রনসমূহ এক পরমাণু থেকে অন্য পরমাণুতে সহজেই চলাচল করতে পারে। যেমন ধাতু বিশেষ করে সিলভার, কপার ও অ্যালুমিনিয়াম। কার্বন অধাতু হলেও এর একটি রূপ গ্রাফাইট বিদ্যুৎ সুপরিবাহী।

অপরিবাহী পদার্থের ক্ষেত্রে এর পরমাণুর ইলেকট্রন সহজে চলাচল করতে পারে না। তবে অপরিবাহী পদার্থকে ঘষে আহিত করা যায়। এছাড়া যদি ইলেকট্রন গৃহীত বা বর্জিত হয়, তাহলেও অপরিবাহী পদার্থ আধানযুক্ত হয়। যেমন: প্লাস্টিক, গ্লাস ও রাবার।

নিম্ন তাপমাত্রায় অর্ধপরিবাহী পদার্থ অপরিবাহীর মত আচরণ করে। তাপমাত্রা বাড়ালে এটি পরিবাহীর মত আচরণ করে। সাধারণত অর্ধপরিবাহী পদার্থ হলো কঠিন। যেমন: সিলিকন, জার্মেনিয়াম, গ্যালিয়াম ইত্যাদি অর্ধপরিবাহী পদার্থের উদাহরণ।

পাঠ – ৫ : স্থির বিদ্যুৎ হতে চল বিদ্যুৎ সৃষ্টি

পূর্বের পরীক্ষার সাহায্যে আমরা দেখেছি, প্লাস্টিকের চিরুনিকে উলের কাপড় দিয়ে ঘষে ছোট কাগজের টুকরোর সামনে ধরলে এটি কাগজের টুকরোকে আকর্ষণ করে। এরপর হাত দিয়ে চিরুনিটি স্পর্শ করলে দেখা যাবে চিরুনিটি আর ছোট কাগজের টুকরোকে আকর্ষণ করছে না। এ থেকে কী বোঝা যায়? বোঝা যায় যে, চিরুনিতে উৎপন্ন স্থির বিদ্যুৎ নেই। এই স্থির বিদ্যুৎ কোথায় গেল? হাতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ঐ বিদ্যুৎ চিরুনি থেকে মাটিতে চলে গেছে। এভাবে যে বিদ্যুৎ কোনো পদার্থের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বা এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে চলে যায় তা হলো চল বিদ্যুৎ।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ঘর্ষণের ফলে কোনো বস্তুতে একটি নির্দিষ্ট ও সামান্য পরিমাণ বিদ্যুৎ বা আধান উৎপন্ন হয়। হাত বা ধাতব পদার্থ দিয়ে স্পর্শ করলে এই আধান সাথে সাথে মাটিতে চলে যায়। আধান ফুরিয়ে যাবার ফলে বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং এভাবে শুধু কিছুক্ষণের জন্য বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি হয়। বিদ্যুৎ প্রবাহ বজায় রাখার জন্য কোনো উৎস থেকে অবিরাম বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকতে হয়। এ বিষয়ে আমরা পরবর্তীতে আরও অধিক ধারণা পাব।

পাঠ – ৬ : সরল বর্তনী ও এর ব্যবহার

মানুষের চলার জন্য যেমন পথের প্রয়োজন, বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্যও প্রয়োজন নির্দিষ্ট পথ। বিদ্যুৎ প্রবাহ চলার এই নির্দিষ্ট পথকে বর্তনী বলে। সাধারণত বিদ্যুৎ উৎসের ধনাত্মক প্রান্ত থেকে ঋণাত্মক প্রান্ত বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য সম্পূর্ণ পথকে বিদ্যুৎ বর্তনী বলে। সাধারণত এই বর্তনীতে বাল্ব ও ব্যাটারি তারের সাহায্যে সংযুক্ত থাকে। এগুলো যখন যুক্ত হয়ে, বর্তনী তৈরি হয়। নিচের চিত্রে একটি সরল বর্তনী দেখানো হলো।

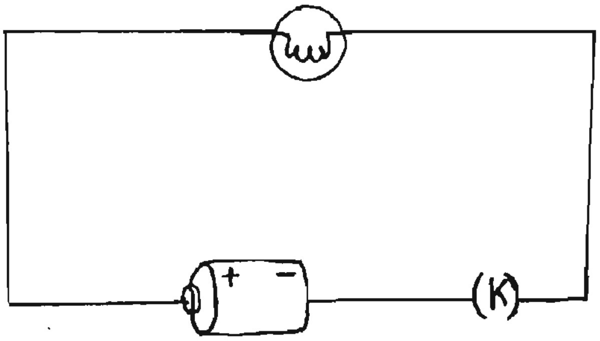

চিত্র-১০.৫ : সরল বর্তনী

পাঠ – ৭ ও ৮

চল বিদ্যুতের ব্যবহার

বিদ্যুৎ প্রবাহ দ্বারা আলো ও তাপ উৎপাদন করা যায়। এমনকি এর দ্বারা যান্ত্রিক কাজ করে বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করা যায়। এবার আমরা উদাহরণ হিসাবে বৈদ্যুতিক বাল্ব, টর্চ লাইট, ইস্ত্রি, হিটার, বৈদ্যুতিক পাখা ও ফটোকপি মেশিনে কিভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার হয় তার সাথে পরিচিত হব।

বৈদ্যুতিক বাল্ব

আমরা সবাই এই বাল্বের সাথে পরিচিত। দুইটি মোটা তার একটি বায়ুশূন্য বা নিষ্ক্রিয় গ্যাস–পূর্ণ বাল্বের বায়ুনিরুদ্ধ মুখের মধ্য দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করানো থাকে। বাল্বের ভিতরে তারের দুই প্রান্তের সাথে সরু টাংস্টেনের তারের কুণ্ডলী সংযুক্ত থাকে। এটিকে ফিলামেন্ট বলে। এই বাল্বকে বিদ্যুৎ উৎসের সাথে সংযোগ করলে ফিলামেন্ট প্রচুর তাপ উৎপাদন করে এবং বাল্বের এই ফিলামেন্ট প্রজ্জলিত হয়ে আলো বিকিরণ করতে থাকে।

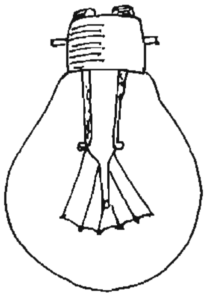

চিত্র-১০.৬ : বৈদ্যুতিক বাল্ব

টর্চ লাইট

আমরা সবাই টর্চ লাইটের সাথে পরিচিত। টর্চ লাইটে মূলত ব্যাটারির সাথে ছোট একটি বাল্ব থাকে। সুইচ টিপলে বাল্ব জ্বলে। এই বাল্বের আলো ছড়িয়ে দেবার জন্য সামনে একটি কাঁচ ব্যবহার করা হয়।

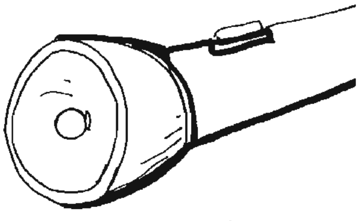

চিত্র-১০.৭ : টর্চ লাইট

বৈদ্যুতিক পাখা

বৈদ্যুতিক পাখাতে বিদ্যুৎ প্রবাহকে ব্যবহার করা মূলত যান্ত্রিক কাজ করার জন্য। এতে বিদ্যুৎ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করে পাখাকে ঘুরানো হয়। পাখার গতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি রেগুলেটর ব্যবহার করা হয়।

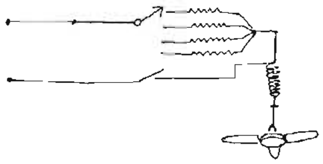

চিত্র-১০.৮ : বৈদ্যুতিক পাখা

বৈদ্যুতিক হিটার

আমরা অনেকেই বৈদ্যুতিক হিটারের সাথে পরিচিত। হিটারের মধ্যে অপরিবাহী পদার্থের একটি গোল চাকতি থাকে। চাকতিতে নাইক্রোম তারের কুণ্ডলী সাজিয়ে রাখা হয়। বিদ্যুৎ প্রবাহ চালনা করলে তারটি

গরম হয় এবং উত্তপ্ত হয়ে তাপ বিকিরণ করে। আমাদের বাসা বাড়িতে বৈদ্যুতিক হিটার চালিয়ে রান্না করা হয়।

বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি

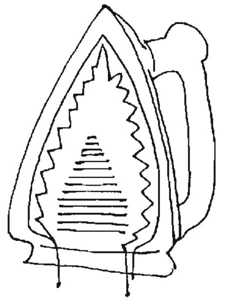

চিত্র-১০.৯ : বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি

বৈদ্যুতিক হিটারের মতই ইস্ত্রির গঠন প্রণালি। এ ক্ষেত্রে নাইক্রোম তারটি ইস্ত্রির নিচের মসৃণ লৌহ নির্মিত তলটিকে উত্তপ্ত করে। এক্ষেত্রে তাপ উৎপাদন বিদ্যুৎ প্রবাহের উপর নির্ভরশীল। প্রবাহ বেশি হলে ইস্ত্রি বেশি উত্তপ্ত হয়।

পাঠ – ৯ ও ১০ : চুম্বক কী?

প্রচলিত আছে যে, প্রাচীন গ্রীসে ম্যাগনেশিয়া নামক প্রদেশে ম্যাগনাস নামে এক রাখাল বালক বাস করত। সে সারা দিন মাঠে মাঠে মেষ চড়াত ও সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরত। একদিন বাড়ি ফেরার সময় ম্যাগনাস তার লাঠিটি মাটি থেকে তুলতে গিয়ে দেখল লাঠিটি উঠানো যাচ্ছে না, লাঠির মাথা একটি পাথরের সাথে আটকে আছে। সে লক্ষ করে দেখলো লাঠির মাথায় লোহাটিকে পাথরটি টেনে ধরে আছে। অর্থাৎ ম্যাগনাস দেখল লোহা এই অচেনা পাথরটিকে আকর্ষণ করছে। ম্যাগনাসের নামানুসারে এই পাথরের নাম করা হল ম্যাগনেট। ম্যাগনেটের বাংলা প্রতিশব্দ হলো চুম্বক। আমরা এও দেখতে পেলাম, চুম্বকের লোহাকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা আছে। আকর্ষণ এক প্রকার বল। বল দিয়ে কাজ করা যায়। অতএব, চুম্বকের কাজ করার সামর্থ্য আছে। সুতরাং চুম্বক এক প্রকার শক্তি।

চুম্বকের ধর্ম

কাজ: চুম্বকের ধর্ম

প্রয়োজনীয় উপকরণ: সাদা কাগজ, লোহার গুড়া, আলপিন ও একটি দন্ড চুম্বক।

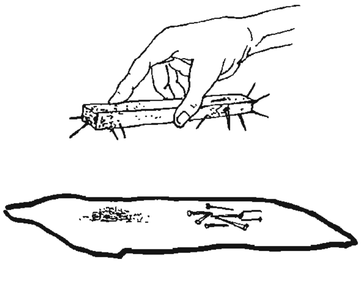

চিত্র-১০.১০

পদ্ধতি: টেবিলের উপর একটি সাদা কাগজে কিছু লোহার গুঁড়া ঘন করে ছিটিয়ে দাও। লোহার গুঁড়া বা আলপিনের উপর এবার দন্ড চুম্বকটিকে কয়েকবার নাড়াচাড়া করে উঠিয়ে ফেল। কী দেখতে পাচ্ছ? দেখা যাচ্ছে, লোহার গুঁড়া বা পিন, চুম্বকের গায়ে লেগে আছে। ভালোভাবে লক্ষ করলে দেখতে পাবে লোহার গুঁড়া বা পিন বেশির ভাগই চুম্বকটির কেবলমাত্র দুই প্রান্তে আটকে আছে। প্রান্ত থেকে যতই মাঝের দিকে যাওয়া যাবে, ততই লোহার গুঁড়া বা পিনের পরিমাণ কমতে থাকে। হয়তো মাঝখানে কোনো পিন বা লোহার গুঁড়াকে দেখছ না। এর থেকে বুঝা যায় চুম্বকের আকর্ষণ ক্ষমতা দুই প্রান্তে সবচেয়ে বেশি।

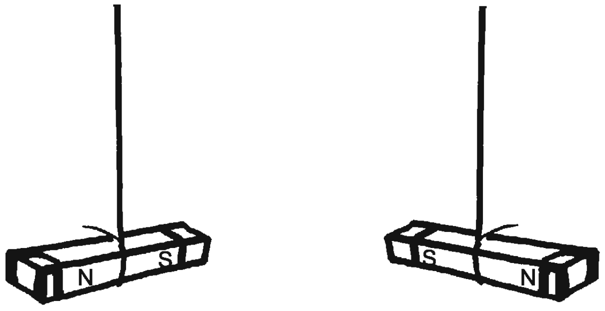

চিত্র-১০.১১ : চুম্বকের ধর্ম

এবার দুটি একই জাতীয় দণ্ড চুম্বককে পরস্পরের কাছাকাছি আন। তুমি জান না কোনটা কোন মেরু। তাদেরকে প্রথমে একটি সুতা দিয়ে মাঝখানে বেঁধে মুক্তভাবে ঝুলিয়ে দাও। কী দেখছ? চুম্বকটি মুক্তভাবে ঝুলন্ত অবস্থায় উত্তর–দক্ষিণ দিক করে স্থির হয়ে আছে। অন্য চুম্বকটিকে একই ভাবে ঝুলিয়ে দাও। দেখবে একই ভাবে চুম্বকটিও মুক্তভাবে উত্তর–দক্ষিণ দিক করে স্থির হয়ে আসবে। এর থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, মুক্তভাবে ঝুলন্ত চুম্বক সর্বদা উত্তর–দক্ষিণমুখী হয়ে স্থির থাকে।

এবার আমরা দণ্ড চুম্বক দুটিকে N এবং S দ্বারা যথাক্রমে উত্তর এবং দক্ষিণ মেরু চিহ্নিত করি। এবার প্রথম চুম্বকটির উত্তর মেরুকে দ্বিতীয় চুম্বকের উত্তর মেরুর কাছে আন। কী দেখছ? বিকর্ষণ করছে। একই ভাবে প্রথম চুম্বকটির দক্ষিণ মেরু দ্বিতীয় চুম্বকের দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি আন। একই ঘটনা ঘটছে? হ্যাঁ, বিকর্ষণ করছে। এর থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, দুটি সমমেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে।

এবার প্রথম চুম্বকের উত্তর মেরুকে দ্বিতীয় চুম্বকের দক্ষিণ মেরুর কাছে আন। কী দেখছ? একই ভাবে দ্বিতীয় চুম্বকের উত্তর মেরুকে প্রথম চুম্বকের দক্ষিণ মেরুর কাছে আন। এরা পরস্পরকে খুব সহজেই কাছে টেনে নিয়েছে। এটা থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, চুম্বকের বিপরীত মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে। সুতরাং চুম্বকের সমমেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং চুম্বকের বিপরীত মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

পাঠ – ১১ : চৌম্বক ও অচৌম্বক পদার্থ

চুম্বক কী সকল পদার্থকেই আকর্ষণ করবে? না, চুম্বক সকল পদার্থকে আকর্ষণ করে না। চুম্বক প্রধানত লোহা, নিকেল, কোবাল্ট এবং অধিকাংশ ইস্পাতকে আকর্ষণ করে। এই পদার্থগুলোকে চৌম্বক পদার্থ বলে। আবার অনেক পদার্থকে চুম্বক আকর্ষণ করে না যেমনঃ কপার, অ্যালুমিনিয়াম, পিতল, কাঠ, সিলভার, প্লাস্টিক ইত্যাদি। এগুলো হলো অচৌম্বক পদার্থ।

কাজ: চৌম্বক ও অচৌম্বক পদার্থ চিহ্নিতকরণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ: একটি চুম্বক ও নিজগৃহের বিভিন্ন বস্তু।

পদ্ধতি: চুম্বকটি আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকটি বস্তুর সামনে ধর। দেখ কোনটিকে চুম্বক আকর্ষণ করে, কোনটিকে করে না। এবার নিচের ছকটি পূরণ কর।

গৃহের বিভিন্ন বস্তুর নাম	চুম্বক আকর্ষণ করে কিনা	কোন ধরনের পদার্থ?

পাঠ – ১২ ও ১৩ : চৌম্বক পদার্থকে চুম্বকে রূপান্তর

কৃত্রিম উপায়ে বিভিন্নভাবে চুম্বক প্রস্তুত করা যায়। নিম্নে ঘর্ষণ পদ্ধতি ও বৈদ্যুতিক পদ্ধতি আলোচনা করা হলো।

ঘর্ষণ পদ্ধতি

এই পরীক্ষাটির জন্য দরকার একটি দণ্ড চুম্বক ও একটি লোহার দণ্ড। দণ্ড চুম্বকটি যে কোনো একটি মেরু দ্বারা লোহার দণ্ডের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঘষে নাও। এভাবে বারবার করতে থাক। একটি পিনকে লোহার দণ্ডের কাছে স্পর্শ করলে এটা পিনকে আকর্ষণ করছে? এভাবেই ঘর্ষণ প্রক্রিয়ায় লোহার দণ্ড চুম্বকে পরিণত করা হয়। যদি চুম্বকটির উত্তর মেরু দ্বারা ঘর্ষণ করা হয় তবে দেখা যাবে, প্রথম যে প্রান্ত থেকে ঘর্ষণ শুরু হবে দণ্ডের সেখানে উত্তর মেরু এবং শেষ প্রান্তে দক্ষিণ মেরুর সৃষ্টি হয়েছে।

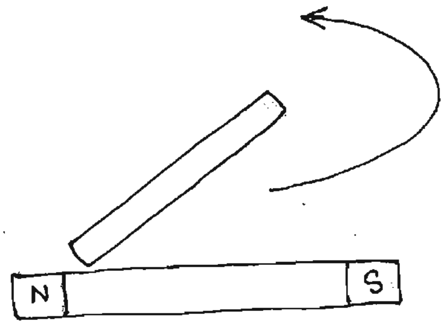

চিত্র-১০.১২ : ঘর্ষণ পদ্ধতি

বৈদ্যুতিক পদ্ধতি

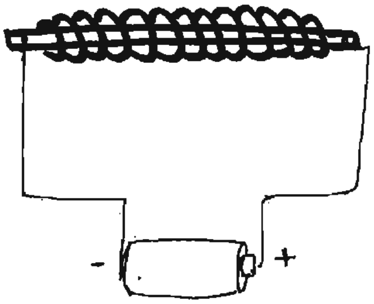

চিত্র-১০.১৩ : বৈদ্যুতিক পদ্ধতি

একটি লোহার পেরেক নাও। এবার বাজারে কিনতে পাওয়া যায় এমন সাধারণ বৈদ্যুতিক তার দিয়ে লোহার পেরেককে পেঁচিয়ে কুণ্ডলী তৈরি কর। এবার তারের দুই প্রান্তকে একটি ব্যাটারির দুই প্রান্তে যুক্ত কর। এবার একটি আলপিন পেরেকের যে কোনো প্রান্তে আনলে দেখা যাবে পেরেকটি আলপিনকে আকর্ষণ করছে। তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ করলে পেরেকটি আলপিনকে আকর্ষণ করে না। এটা থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, পেরেকটি অস্থায়ী চুম্বকে পরিণত হয়েছে।

পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র

একটি দণ্ড চুম্বককে সুতার সাহায্যে ঝুলিয়ে দিলে স্থির অবস্থায় তা সব সময়ই উত্তরদক্ষিণে মুখ করে থাকে। পৃথিবীর চুম্বকত্বের জন্যই এ রকম হয়। পৃথিবীর সব জায়গাতেই ভূচুম্বকের প্রভাব বর্তমান। ঝুলন্ত অবস্থায় দণ্ড চুম্বকের দুই মেরু পৃথিবীর দুই চৌম্বক মেরুকে নির্দেশ করে। এখানে দণ্ড চুম্বকের উত্তর মেরু উত্তর দিককে নির্দেশ করে। কিন্তু একটি উত্তর মেরু সর্বদা দক্ষিণ মেরুকে আকর্ষণ করে। ফলে ভূচুম্বকের দক্ষিণ মেরু আসলে উত্তর মেরু হিসাবে কাজ করে।

নতুন শব্দ

চার্জ, স্থির বিদ্যুৎ, চলবিদ্যুৎ, পরিবাহী, অপরিবাহী, অর্ধপরিবাহী, সরল বর্তনী, চৌম্বক পদার্থ, অচৌম্বক পদার্থ ও ভূচুম্বক।

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- ঘর্ষণের ফলে নতুন কোনো আধানের সৃষ্টি হয় না বরং পদার্থের মধ্যে বিদ্যমান আধান এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে স্থানান্তরিত হয়।
- সমধর্মী আধান পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং বিপরীতধর্মী আধান পরস্পরকে আকর্ষণ করে।
- বিদ্যুৎ প্রবাহ বজায় রাখার জন্য কোনো উৎস থেকে অবিরাম বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকতে হয়।
- একটি সরল বর্তনীতে বিদ্যুৎ সকল অংশে সমভাবে প্রবাহিত হয়।
- চুম্বকের দুই মেরুর আকর্ষণ ক্ষমতা বেশি।
- চুম্বকের সমমেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং বিপরীত মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে।
- একটি দণ্ড চুম্বককে সুতার সাহায্যে ঝুলিয়ে দিলে স্থির অবস্থায় তা সব সময়ই উত্তর–দক্ষিণ মুখী হয়ে থাকে। পৃথিবীর চুম্বকত্বের জন্যই এ রকম হয়।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. ——————— নিউক্লিয়াসের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে।

২. অর্ধপরিবাহী পদার্থ নিম্ন তাপমাত্রায় সাধারণত ——————— মতো আচরণ করে।

৩. পৃথিবীর সব জায়গাতেই ——————— প্রভাব বর্তমান।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আধানের উৎপত্তি হয় কীভাবে?

২. বৈদ্যুতিক বাল্ব কীভাবে আলো ছড়ায়?

৩. চৌম্বক পদার্থকে কীভাবে চুম্বকে রূপান্তর করা যায়?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বৈদ্যুতিক পাখায় রেগুলেটর ব্যবহারের উদ্দেশ্য হলো–

ক. পাখার আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি
খ. শব্দ কমানো
গ. গতি নিয়ন্ত্রণ
ঘ. বিদ্যুৎ খরচ কমানো

২. চৌম্বক ধর্মের উপর ভিত্তি করে নিচের কোন মৌলসমূহ একই দলভুক্ত?

ক. নিকেল, সিলভার, কপার
খ. স্বর্ণ, কোবাল্ট, সিলভার
গ. কোবাল্ট, লোহা, নিকেল
ঘ. লোহা, পারদ, অ্যালুমিনিয়াম

নিচের চিত্র দুটো ভালোভাবে লক্ষ কর এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

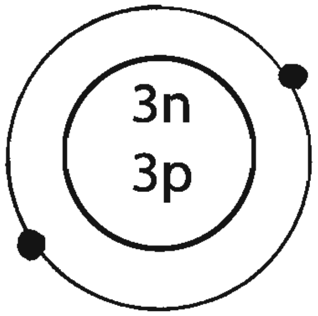

চিত্র– A

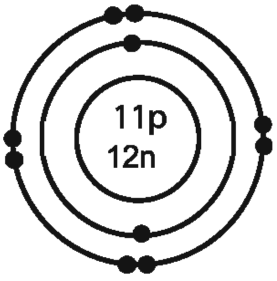

চিত্র– B

n → নিউট্রন
p → প্রোটন
• → ইলেকট্রন

৩. A চিত্রের বৈশিষ্ট্য হলো– এটি

i. চার্জ নিরপেক্ষ ii. ধনাত্মক চার্জযুক্ত iii. চার্জের ভারসাম্যহীন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. ii ও iii

৪. A ও B চিত্রের ক্ষেত্রে–

ক. A ঋনাত্মক চার্জযুক্ত
খ. B ধনাত্মক চার্জযুক্ত
গ. A ও B এর মধ্যে আকর্ষণ হয়
ঘ. A ও B এর মধ্যে বিকর্ষণ হয়

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সামিহার নিকট একটি দণ্ড চুম্বক আছে। সে ঘর্ষণ প্রক্রিয়ায় একটি চুম্বক ও বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে আরেকটি চুম্বক তৈরি করল।

ক. চৌম্বক পদার্থ কাকে বলে?
খ. পৃথিবী একটি বিরাট চুম্বক, ব্যাখ্যা কর।
গ. ১ম চুম্বক তৈরির কৌশল বর্ণনা কর।
ঘ. ২য় প্রকারের চুম্বকটি শক্তিশালী হলেও ক্ষণস্থায়ী– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

২.

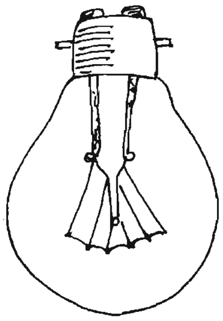

(১)

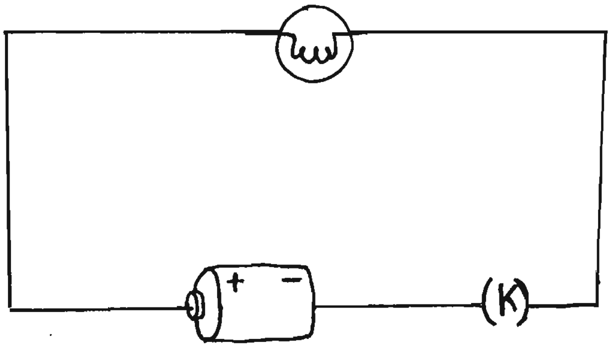

(২)

ক. স্থির বিদ্যুৎ কাকে বলে?

খ. ধাতু বিদ্যুৎ পরিবাহী হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. ১ নম্বর চিত্রের যন্ত্রের কার্যাবলি বর্ণনা কর।

ঘ. ২ নম্বর চিত্রে দুই ধরনের বিদ্যুতের উপস্থিতি লক্ষণীয়। ক্ষেত্র উল্লেখপূর্বক বিশ্লেষণ কর।

একাদশ অধ্যায়

পারিপার্শ্বিক পরিবর্তন ও বিভিন্ন ঘটনা

আমাদের চারপাশে প্রতি মুহূর্তে নানা রকম পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। এদের কোনো কোনোটি আমাদের জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় আবার কোনো কোনোটি হয়তো নানাবিধ ক্ষতির কারণও হতে পারে। প্রকৃতিতে ঘটা এ সকল নানা ঘটনায় বিভিন্ন পদার্থের ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন সাধিত হয়।

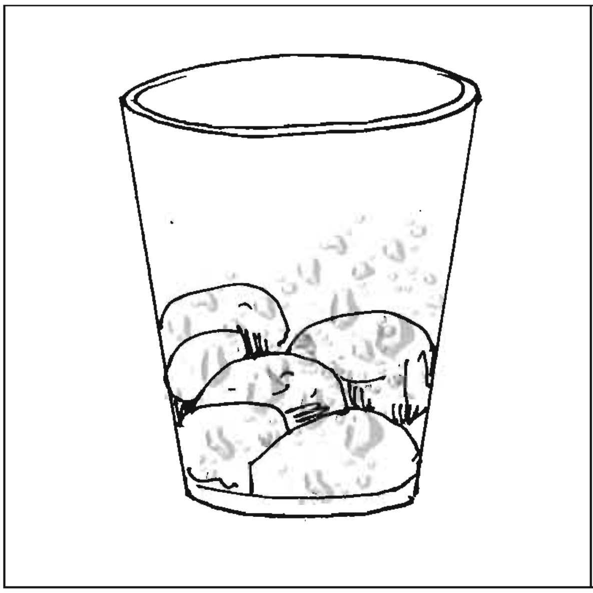

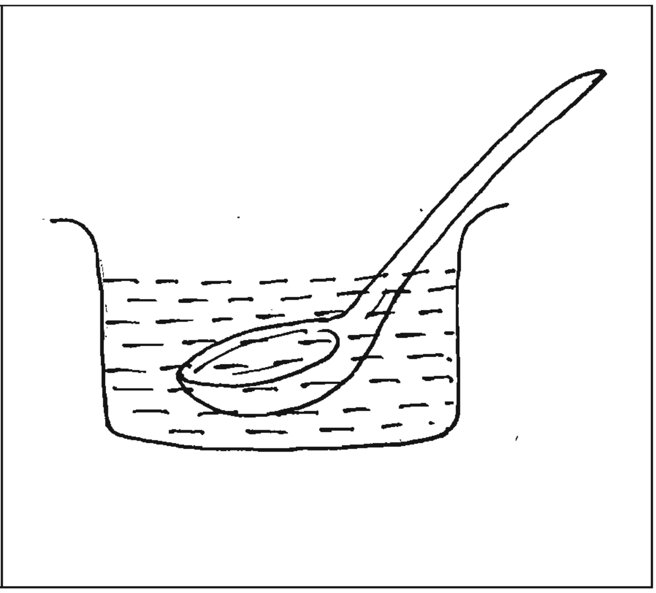

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- প্রকৃতিতে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনার ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ধাতু সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করব।
- রাসায়নিক ক্রিয়া এবং পরিবর্তনের কিছু ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখাতে পারব।
- পরীক্ষণ কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সচেতন থাকব এবং অন্যদের সচেতন করব।
- পরীক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে ব্যবহার করব।

পাঠ–১: গলন ও স্ফুটন

কাজ: একটি ছোট পাত্রে কিছু বরফের টুকরা রেখে কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। কি ঘটছে? বরফ ধীরে ধীরে গলে পানিতে পরিণত হচ্ছে। আচ্ছা বলো তো, পানি ও বরফ কি একই পদার্থ না ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ? পানি ও বরফ একই পদার্থ, এরা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ নয়। এদের অবস্থা শুধু ভিন্ন। যখন পানির আকারে আছে, এটি তরল অবস্থা আর যখন বরফ আকারে আছে, এটি হলো কঠিন অবস্থা।

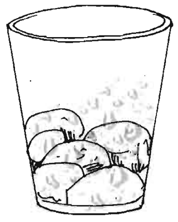

চিত্র-১১.১ : বরফসহ গ্লাস

বরফ গলে পানি হওয়ার এই পরিবর্তন অর্থাৎ যেখানে শুধু অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, তাকে ভৌত পরিবর্তন বলা হয়।

পানিতে তাপ দিলে কি হয়? পানির তাপমাত্রা বাড়তে থাকে এবং এক পর্যায়ে পানি ফুটতে থাকে। তাহলে পানির স্ফুটন কি ভৌত পরিবর্তন? হ্যা, অবশ্যই এটি একটি ভৌত পরিবর্তন। কারণ এর ফলে পানি কেবলমাত্র তরল অবস্থা থেকে বাষ্পে বা গ্যাসীয় অবস্থায় পরিণত হচ্ছে, এটি নতুন কোনো পদার্থে পরিণত হচ্ছে না।

আবার একটি বড় কাগজ কেটে যদি আমরা কয়েকটি ছোট ছোট টুকরায় পরিণত করি, তাহলে এই পরিবর্তন কি ভৌত পরিবর্তন বলব? হ্যাঁ, এটিকেও ভৌত পরিবর্তন বলব, কারণ এর ফলে কাগজের আকার শুধু ছোট হয়েছে, কিন্তু এটি একই পদার্থই রয়ে গেছে এবং এর ধর্মের কোনোই পরিবর্তন হয়নি।

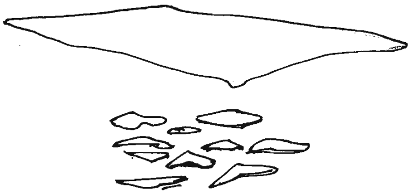

চিত্র-১১.২ : বড় কাগজ ও কাগজের টুকরা

তাহলে যে সকল ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ফলে সংশ্লিষ্ট পদার্থের অবস্থার বা আকার-আকৃতির পরিবর্তন ঘটে কিন্তু নতুন পদার্থের সৃষ্টি হয় না, তাদেরকে ভৌত পরিবর্তন বলা হয়।

পাঠ–২: ধাতুর ক্ষয়

লোহার তৈরি রড তোমরা সবাই চেন। লোহার রড, কিছুদিন বাইরে ফেলে রাখলে এর উপর মরিচা পড়ে ও রড ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে যায়। তোমরা কি জান মরিচা আসলে কি এবং কীভাবে এটি তৈরি হয়?

কাজ : একটি পাত্রের অর্ধেক পরিমাণ পানি নাও। পেরেকটি সাবধানে আস্তে করে পাত্রের পানিতে ডুবাও। পাত্রটি দু–তিন দিনের জন্য রেখে দাও। পেরেকটিতে কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, পেরেকের উপরিভাগে মরিচা পড়েছে।

লোহার এই যে পরিবর্তন হলো অর্থাৎ মরিচা পড়ল, এটি কি ধরনের পরিবর্তন? এটি কি ভৌত পরিবর্তন? এখানে লোহা বাতাসের অক্সিজেন ও পানির সাথে বিক্রিয়া করে পানিযুক্ত ফেরিক অক্সাইড তৈরি করে। এই পানিযুক্ত ফেরিক অক্সাইডই হলো মরিচা। তাহলে দেখা যাচ্ছে লোহা পরিবর্তিত হয়ে ভিন্ন পদার্থ ফেরিক অক্সাইডে পরিণত হয়েছে যার ধর্ম লোহার ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এই সকল পরিবর্তন যেখানে এক বা একাধিক পদার্থ পরিবর্তিত হয়ে ভিন্নধর্মী নতুন পদার্থে পরিণত হয় তাদেরকে রাসায়নিক পরিবর্তন বলে।

মরিচাতে একটু ঘষা লাগলেই এটি খসে পড়ে যায়। এভাবে মরিচা পড়ার ফলে লোহার ক্ষয় হয়।

লোহার মতো অন্যান্য ধাতব পদার্থও (যেমন এলুমিনিয়াম ও তামা) বাতাসে রেখে দিলে ক্ষয় হতে পারে। তবে কিছু কিছু ধাতব পদার্থ যেমন– সোনা, প্লাটিনাম এগুলো খোলা বাতাসে রাখলেও ক্ষয় হয় না। সে কারণে এরা গহনা বা কখনো কখনো মুদ্রা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

পাঠ–৩ : স্টেইনলেস স্টিল

আচ্ছা তোমরা কি জান স্টেইনলেস স্টিল কি এবং এতে মরিচা পড়ে কিনা?

লোহার সাথে কার্বন, নিকেল ও ক্রোমিয়াম মিশালে স্টেইনলেস স্টিল তৈরি হয়। এটি মূলত এক ধরনের মিশ্রণ। স্টেইনলেস স্টিল লোহার চেয়ে অনেক গুন মজবুত ও শক্ত হয়। আর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, এতে লোহার মতো মরিচাও পড়ে না। এবার পরীক্ষা করে তা দেখা যাক।

কাজ: একটি বিকারে দুই–তৃতীয়াংশ পানি নিয়ে তাতে স্টেইনলেস স্টিলের একটি চামচ ও একটি পেরেক বিকারের পানিতে ডুবাও ও কয়েকদিন রেখে দাও। চামচে কি মরিচা পড়েছে? না, পড়েনি, কারণ স্টেইনলেস স্টিলে লোহা থাকলেও এর ধর্ম বিশুদ্ধ লোহা থেকে আলাদা। এটি অক্সিজেন ও পানির সাথে বিক্রিয়া করে মরিচা তৈরি করতে পারে না। কিন্তু দেখ, পেরেকে মরিচা পড়েছে কারণ এটি লোহার তৈরি ।

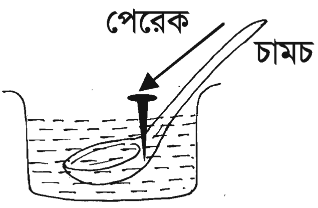

চিত্র-১১.৩

তোমরা বাড়িতে ধাতব পদার্থ দিয়ে তৈরি নানা রকম জিনিসপত্রের তালিকা প্রস্তুত কর এবং দেখ এদের মধ্যে কোনগুলো ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে আর কোনগুলো ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে না। কেন এমনটি হচ্ছে তাও চিন্তা কর।

ধাতব পদার্থসমূহ ক্রমাগত ক্ষয় হতে থাকলে এক পর্যায়ে তা ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়বে। কিন্তু যদি আমরা এ সকল ধাতব পদার্থ ব্যবহারে সচেতন হই এবং এদেরকে যথাপোযোক্তভাবে ব্যবহার করি, তাহলে কিন্তু এই ক্ষয় রোধ করা যেতে পারে। যেমন ধর লোহার তৈরি জিনিসপত্র যথা– হাতুড়ি, পেরেক ইত্যাদি পানি থেকে দূরে বা যথাসম্ভব শুকনো জায়গায় রাখতে পারি। আবার অনেক সময় এদেরকে তৈল বা গ্রিজে ভিজিয়ে রাখলেও মরিচা পড়া বা ক্ষয় হওয়া থেকে রক্ষা করা যায়।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, যে সকল ধাতব পদার্থ ক্ষয় হয় তাদের ক্ষয় কিভাবে রোধ করা যায়?

ধাতুর ক্ষয় রোধ করার কয়েকটি উপায় হলো গ্যালভানাইজিং, পেইন্টিং ও ইলেকট্রোপ্লেটিং। এখন আমরা এসব উপায় সম্পর্কে জেনে নেই।

গ্যালভানাইজিং : আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কাজে আমরা জিংক বা দস্তা ব্যবহার করে থাকি। এর মধ্যে অন্যতম হলো গ্যালভানাইজিং। লোহার তৈরি দ্রব্যসামগ্রীর উপর দস্তার পাতলা আস্তরণ দেওয়াকে গ্যালভানাইজেশন বলে। জিংক এর আবরণ লোহাকে বাতাসের অক্সিজেন ও পানি থেকে রক্ষা করে। ফলে মরিচা পড়তে পারে না। লোহার ক্ষয়ও হয় না। দস্তার পরিবর্তে টিন দিয়েও অনেক সময় আবরণ দিয়ে ধাতব পদার্থকে ক্ষয় হতে রক্ষা করা যায়।

পেইন্টিং : পেইন্টিং বা রং করেও ধাতব পদার্থসমূহের ক্ষয় রোধ করা যায়। বাসার রেফ্রিজারেটর, আলমারি, গাড়ি, স্টিলের আসবাবপত্র এ সবই রং করা হয় পেইন্ট দিয়ে, এদের ক্ষয় রোধ করা জন্য। এই পেইন্ট সময়ের সাথে সাথে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে যত দ্রুত সম্ভব আবার পেইন্টিং করে নেওয়া ভাল।

ইলেকট্রোপ্লেটিং: ইলেকট্রোপ্লেটিং হলো তড়িৎ বিশ্লেষণের সাহায্যে একটি ধাতুর উপর আরেকটি ধাতুর পাতলা আবরণ তৈরির প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় সাধারনত নিকেল, ক্রোমিয়াম, টিন, সিলভার ও সোনা দিয়ে আবরণ তৈরি করা হয়। এতে একদিকে যেমন ধাতুর ক্ষয় রোধ করা যায়, অন্যদিকে তেমনি আকর্ষণীয় ও চকচকে হয়। খাবারের কৌটা, সাইকেল এগুলোর ক্ষেত্রে লোহার উপর টিনের ইলেকট্রোপ্লেটিং করা হয়।

পাঠ–৪: দহন

কাজ : ১টি দিয়াশলাই কাঠি দিয়ে মোমবাতি জ্বালাও। ভালোভাবে লক্ষ্য কর কি ঘটছে? মোমবাতির একটু অংশ আগুনে পুড়ে যাচ্ছে এবং অপর অংশটি গলে মোমবাতির গা বেয়ে নিচের দিকে নামছে এবং জমে যাচ্ছে। যে অংশ পুড়ে যাচ্ছে, সেটি কি ধরনের পরিবর্তন? আবার যে অংশ গলে নীচের দিকে পড়ে জমে যাচ্ছে, সেটাই বা কি ধরনের পরিবর্তন?

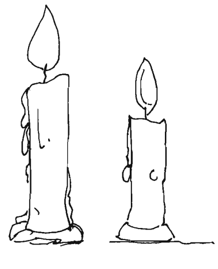

চিত্র-১১.৪ : মোমবাতির দহন

মোমের একটি অংশ গলে সলতের মধ্যদিয়ে গিয়ে আগুনে পুড়ে যাচ্ছে। সেখানে মোমবাতি বাতাসের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানিতে পরিণত হচ্ছে এবং সাথে সাথে আলো ও তাপশক্তি উৎপন্ন করছে। উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড বর্ণহীন এবং পানি বাষ্পীভূত হয়ে যায় বলে আমরা এদেরকে দেখতে পাই না। তাহলে মোমবাতির এই পরিবর্তন অবশ্যই রাসায়নিক পরিবর্তন। কারণ এর ফলে মোমবাতির মোম সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী নতুন পদার্থ কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানিতে পরিণত হচ্ছে।

মোমের এই রাসায়নিক পরিবর্তন যেখানে এটি বাতাসের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে তাপশক্তি উৎপন্ন করেছে, এটিকে বলা হয় দহন। অন্যদিকে যে অংশটি গলে নীচে পড়ে জমে যাচ্ছে, সেটি কিন্তু রাসায়নিক পরিবর্তন নয়, ভৌত পরিবর্তন, কারণ এখানে তাপে মোম গলে আবার আগের অবস্থায়ই ফিরে এসেছে এবং এতে এর ধর্মের কোনোই পরিবর্তন হয়নি।

আমরা বাসাবাড়িতে চুলায় প্রাকৃতিক গ্যাস পুড়িয়ে বা খড়ি দিয়ে যে রান্না করি, সেটিও কিন্তু এক ধরনের দহন প্রক্রিয়া। এখানে গ্যাস বা খড়ি বাতাসের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে প্রচুর তাপশক্তি উৎপন্ন করে, যা দিয়ে আমরা খাবার রান্না করি। একই ভাবে কয়লা বা কাঠ পোড়ানোও দহন।

তোমরা কি জান, আমরা যে নানা রকম কাজ করি তার জন্য এত শক্তি কোথা থেকে এবং কিভাবে পাই?

আমরা যে নানা রকম খাদ্য খাই, তা পরিপাকের পর খাদ্যসার দেহে শোষিত হয় এবং রক্তের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংশে পৌঁছয়। দেহকোষে এ খাবার ভেঙে প্রচুর তাপশক্তি উৎপন্ন হয়। এই তাপশক্তিকে কাজে লাগিয়েই আমরা নানা রকম কাজ করি। যদি তাপশক্তি উৎপন্ন না হতো, তাহলে আমরা শক্তিও পেতাম না, কোনো কাজও করতে পারতাম না। তাহলে স্পষ্ট যে, যে প্রক্রিয়ায় আমরা খাবার থেকে শক্তি পাই, সেটি এক ধরনের দহন প্রক্রিয়া।

আমরা যদি দীর্ঘ সময় খাবার না খাই, তাহলে কী ঘটে? আমরা শক্তিও পাই না কাজও করতে পারি না। কারণ খাবার না খেলে দেহকোষে দহন বন্ধ হয়ে যায়। ফলে তাপশক্তি উৎপাদনও থেমে যায় আর আমরাও কোনো শক্তি পাই না। সকল দহন প্রক্রিয়াই রাসায়নিক পরিবর্তন।

পাঠ ৫–৬ : সালোকসংশ্লেষণ, পানি চক্র, কার্বন চক্র ও অক্সিজেন চক্র

সালোকসংশ্লেষণ : তোমরা জান যে, সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে গাছপালা সূর্যের আলোর সাহায্যে নিজেদের খাবার তৈরি করে। কিভাবে এটি ঘটে তা কি তোমরা জান? এটি ভৌত না রাসায়নিক পরিবর্তন? সালোকসংশ্লেষণে গাছপালা আলোর সাহায্যে বাতাসে থাকা কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানির (জলীয় বাষ্প) মধ্যে বিক্রিয়া ঘটিয়ে গ্লুকোজ ও অক্সিজেন তৈরি করে। উৎপন্ন গ্লুকোজ গাছপালার বেড়ে উঠার কাজে লাগে আর অক্সিজেন আমাদের প্রশ্বাসে কাজে লাগে।

$$\text{কার্বন ডাইঅক্সাইড} + \text{পানি} \xrightarrow[\boxed{\text{ক্লোরোফিল}}]{\boxed{\text{আলো}}} \text{গ্লুকোজ} + \text{অক্সিজেন}$$

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, সালোকসংশ্লেষণে উৎপন্ন পদার্থ অর্থাৎ গ্লুকোজ ও অক্সিজেন, বিক্রিয়ক পদার্থ কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও ভিন্নধর্মী। সে কারণে এটি একটি রাসায়নিক পরিবর্তন, ভৌত পরিবর্তন নয়। যদি সালোকসংশ্লেষণ না ঘটত তাহলে কি হতো? আমরা প্রশ্বাসের জন্য পর্যাপ্ত

অক্সিজেন পেতাম না। তাহলে আমরা বলতে পারি সালোকসংশ্লেষণ এমন একটি রাসায়নিক পরিবর্তন, যা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য।

পানি চক্র : তোমরা জান, পানি নানা উৎস থেকে পাওয়া যায়। যেমন, আমরা বৃষ্টি থেকে আমাদের দেশে প্রচুর পানি পাই। বর্ষাকালে দেখ বন্যার পানিতে দেশের নানা জায়গা ডুবে যায়। আচ্ছা বলো তো, বন্যার পানি কোথা থেকে আসে? বর্ষা শেষে আবার তা কোথায় চলে যায়? পরের বছর আবার বর্ষাকালে কোথা থেকে বন্যার পানি আসে?

পৃথিবীতে পানি তার এক উৎস থেকে অন্য উৎসে চক্রাকারে ঘোরে। বৃষ্টি কীভাবে হয় তা তোমরা জান। সূর্যতাপ ভূপৃষ্ঠের অর্থাৎ পুকুর, খাল, বিল, নদী ও সমুদ্রের পানিকে জলীয়বাষ্পে পরিণত করে। জলীয়বাষ্প বায়ুমণ্ডলের উপরের দিকে উঠে ঠান্ডা হয়ে ক্ষুদ্র পানিকণায় পরিণত হয়। ক্ষুদ্র পানিকণা একত্র হয়ে আকাশে মেঘ হিসেবে ঘুরে বেড়ায়। মেঘের পানিকণাগুলো একত্রিত হয়ে আকারে বড় হয়ে বৃষ্টিরূপে মাটিতে পড়ে। মেঘের পানিকণাগুলো খুব বেশি ঠান্ডা হয়ে গেলে তা বরফে পরিণত হয় এবং শিলাবৃষ্টি হিসেবে পৃথিবীতে নেমে আসে। বৃষ্টির পানি গড়িয়ে গড়িয়ে নদীর পানির সাথে মেশে। নদীর পানি প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রের পানিতে মেশে। এভাবে ভূ-পৃষ্ঠের পানি থেকে জলীয়বাষ্প, জলীয়বাষ্প থেকে মেঘ, মেঘ থেকে বৃষ্টি হিসেবে পানি আবার ভূ-পৃষ্ঠে ফিরে আসে। বৃষ্টির পানি আবার গড়িয়ে গড়িয়ে নদী এবং সবশেষে সমুদ্রে ফিরে আসে। এভাবে পানির চক্রাকারে ঘুরে আসাকে পানি চক্র বলে। এখানে একটি বিষয় খেয়াল করা দরকার যে, বৃষ্টির পানি চুইয়ে চুইয়ে মাটির নিচে গিয়ে সঞ্চিত হয়। এ পানিকে আমরা ভূগর্ভস্থ পানি বলি। ভূগর্ভস্থ পানি আমরা পান করতে, দৈনন্দিন ও সেচকাজে ব্যবহার করার জন্য উত্তোলন করে থাকি।

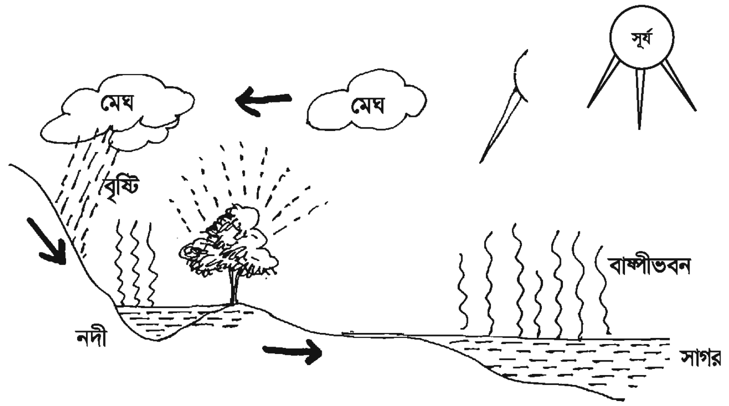

চিত্র-১১.৫ : পানি চক্র

আবার বায়ু প্রবাহের কারণে জলীয়বাষ্প মেঘরূপে উড়ে গিয়ে পর্বতের চূড়ায় পৌছায়। সেখানে মেঘের পানিকণা ঠান্ডায় বরফে পরিণত হয়। এই বরফ গ্রীষ্মকালে সূর্যের তাপে গলে পানি হয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসে। এভাবে ছোট পাহাড়ি নদীর উৎপত্তি হয়। এই পাহাড়ি নদী বৃষ্টির পানির সাথে মিলে সমতলে বড় নদীতে পরিণত হয়। এই নদীর পানি সবশেষে সমুদ্রে গিয়ে মেশে। পানি থেকে মেঘ, মেঘ থেকে পর্বতের চূড়ায় বরফ, বরফ গলে নদী-এভাবেও পানি চক্রাকারে ঘুরে আসে। চিত্রটি থেকে পানির চক্রাকারে ঘুরে আসাটা ভালোভাবে বুঝতে পারবে।

পানি চক্রে জড়িত অতি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পরিবর্তন হচ্ছে বাষ্পীভবন, ঘনীভবন ও কঠিনীভবন। এদের কোনটি কি ধরনের পরিবর্তন দেখা যাক।

বাষ্পীভবন : এ প্রক্রিয়ায় নদ-নদী, খাল-বিল ও সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সূর্যের তাপে পানি বাষ্পীভূত হয়ে জলীয়বাষ্পে পরিণত হয়ে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। তোমরা বলো তো বাষ্পীভবন কি ভৌত না রাসায়নিক পরিবর্তন? এটি অবশ্যই একটি ভৌত পরিবর্তন। কারণ এতে পানি শুধু তরল অবস্থা থেকে বাষ্পে পরিণত হয়েছে, ভিন্নধর্মী কোনো নতুন পদার্থ তৈরি হয়নি ।

ঘনীভবন: বাষ্পীভবনের ফলে সৃষ্ট জলীয়বাষ্প ক্রমাগত উপরে উঠতে থাকে, যেখানে তাপমাত্রা তুলনামূলকভাবে কম। ফলে এক পর্যায়ে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে পানির ছোট ছোট কণা বা মেঘে পরিণত হয়। জলীয়বাষ্প থেকে মেঘ তৈরির প্রক্রিয়াটিই হলো ঘনীভবন। এটিও একটি ভৌত পরিবর্তন এবং মূলত বাষ্পীভবনের বিপরীত। এই প্রক্রিয়ায় পানি কেবল মাত্র বাষ্প থেকে তরলে পরিণত হচ্ছে, এর ধর্মের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না।

কঠিনীভবন : পানিচক্রে মেঘের পানি কণা জমে বরফ পরিণত হয়ে পর্বতের চূড়ায় জমা হয় ও শিলা হিসেবে মাটিতে নেমে আসে। পানি বরফে পরিণত হওয়াটি কী ধরনের পরিবর্তন? এতে কী পানির ধর্মের পরিবর্তন হয়? পানির ধর্মের পরিবর্তন হয় না বলে এটি ভৌত পরিবর্তন।

কার্বন চক্র : কার্বন চক্রের মাধ্যমে আমরা মূলত দেখতে পাই কীভাবে কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রকৃতিতে এক মাধ্যম বা অবস্থা থেকে অন্য মাধ্যম বা অবস্থায় চক্রাকারে ঘুরতে থাকে । পাশের চিত্রে কার্বন চক্র দেখানো হলো:

তোমরা কি বুঝতে পারছ এখানে কী ধরনের প্রক্রিয়া বা পরিবর্তন জড়িত? এখানে জড়িত পরিবর্তনসমূহের মধ্যে একটি হলো সালোকসংশ্লেষণ। তোমরা আগেই জেনেছ যে, এই প্রক্রিয়ায় গাছপালা বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি থেকে সূর্যের আলোর সাহায্যে তাদের খাবার অর্থাৎ গ্লুকোজ তৈরি করে এবং আমাদের জন্য অক্সিজেন তৈরি করে। তোমাদের কি মনে আছে এটি কী ধরনের পরিবর্তন? এই প্রক্রিয়ার মধ্যেমে কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডল থেকে উদ্ভিদের শরীরে প্রবেশ করে। কার্বন চক্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো গাছপালা থেকে জীবাশ্ম জ্বালানিতে রূপান্তর। উদ্ভিদ বা গাছপালা মরে গেলে এদের দেহবাশেষ ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে ভেঙে যায় এবং এক পর্যায়ে জীবাশ্ম জ্বালানি হিসেবে ভূগর্ভে জমা হয়। আমাদের অতি ব্যবহৃত প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা কেরোসিন বা পেট্রোল-এসবই এই প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়। তবে মৃত গাছপালা ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে যখন ভাঙে, তখন এর একটি অংশ সরাসরি কার্বন ডাইঅক্সাইডে পরিণত হয়ে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। জীবাশ্ম জ্বালানি আমরা রান্না থেকে শুরু করে গাড়িতে, শিল্পকারখানায় দহন করে ভিন্ন ভিন্ন কাজে ব্যবহার করছি। এই ধরনের পরিবর্তনের ফলে

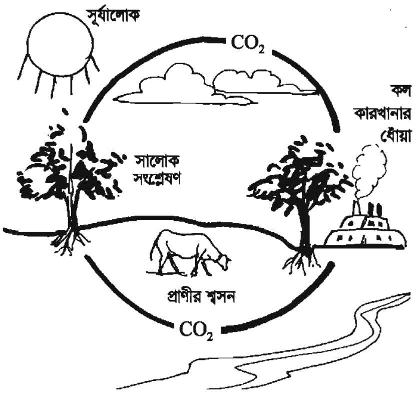

চিত্র-১১.৬ : কার্বন পানিচক্র

জীবাশ্ম জ্বালানি আবার কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানিতে পরিণত হয়ে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করছে। বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড আবার সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে গাছপালা দ্বারা শোষিত হচ্ছে।

দহন ছাড়া আর কোনো উপায়ে কার্বনডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করছে কি?

হ্যাঁ, মানুষের মতো অন্য প্রাণীরাও নিঃশ্বাসের সময় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ছেড়ে দিচ্ছে এবং তা বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করছে। গাছপালা ছাড়া আর কোন উপায়ে কি কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডল থেকে শোষিত হচ্ছে?

আচ্ছা গাছপালা কি কার্বনডাই অক্সাইড শোষণ করে শুধুই খাবার তৈরি করে? এরা কি কার্বন ডাইঅক্সাইড ছেড়ে দেয় না? হ্যাঁ, মানুষ বা অন্য প্রাণীর মতো গাছপালাও এদের নিঃশ্বাসের সময় কার্বনডাইঅক্সাইড ছেড়ে দেয়।

এখন তোমরা বলো তো গাছপালা বা প্রাণীদেহ থেকে যে জীবাশ্ম জ্বালানি তৈরি হয়, সেটি কি ধরনের পরিবর্তন?

এটি অবশ্যই রাসায়নিক পরিবর্তন, কারণ এই পরিবর্তনের ফলে উৎপন্ন পদার্থ অর্থাৎ জীবাশ্ম জ্বালানি গাছপালায় থাকা স্টার্চ, প্রোটিন ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী।

অক্সিজেন চক্র : পাশের চিত্রে অক্সিজেন চক্র দেখানো হলো। এই চক্রে কী কী প্রক্রিয়া জড়িত? ভালোভাবে খেয়াল কর। গাছপালা সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে অক্সিজেন ছেড়ে দেয় ও নিজেদের জন্য খাবার (যেমন গ্লুকোজ বা স্টার্চ) সঞ্চয় করে রাখে। আবার অন্য দিকে মানুষসহ অন্য প্রাণীরা গাছের ছেড়ে দেওয়া অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং গাছপালা বা অন্য উৎস থেকে গৃহীত খাদ্য ঐ অক্সিজেনের সাহায্যে দহন করে শক্তি উৎপন্ন করে ও কার্বন ডাইঅক্সাইড ছেড়ে দেয় যা আবার গাছপালা ব্যবহার করে নিজেদের খাদ্য তৈরির কাজে।

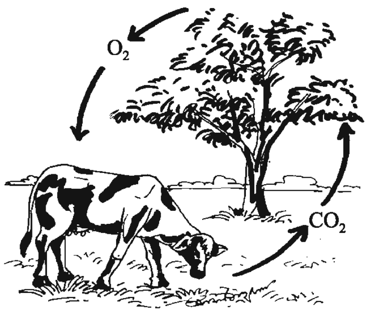

চিত্র- ১১.৭ : অক্সিজেন চক্র

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, সালোকসংশ্লেষণ, কার্বন চক্র, পানি চক্র ও অক্সিজেন চক্র প্রত্যক্ষ ও পরোভাবে আমাদের জীবনের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত।

পাঠ–৭, ৮:

কাজ : ম্যাগনেসিয়াম ও বায়ুর দহন পর্যবেক্ষণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ম্যাগনেসিয়াম রিবন, চিমটা, লাইটার স্পিরিট ল্যাম্প/ বুনসেন বার্নার।

পদ্ধতি: ম্যাগনেসিয়াম রিবনের একটি ছোট টুকরার (৮ সেন্টিমিটার)এক মাথা চিমটা দিয়ে ধর। চোখে নিরাপত্তা চশমা নড়ে নাও। রিবনের অন্য মাথাটি বুনসেন বার্নারের শিখার উপর ধর। লাইটার দিয়েও এটি করা যায়। খুব ভালোভাবে লক্ষ কর কী ঘটছে? ম্যাগনেসিয়াম রিবনটি আগুনের শিখার উপর ধরায়

কী দেখলে? রিবনে আগুন ধরে গেল এবং অত্যন্ত প্রজ্জ্বলিত শিখাসহ জ্বলতে লাগল। এর কারণ হলো ম্যাগনেসিয়াম বাতাসের অক্সিজেনে পুড়তে থাকে আর আমরা প্রজ্জ্বলিত শিখা দেখতে পাই। এভাবে যখন সমস্ত ম্যাগনেসিয়াম পুড়ে শেষ হয়ে যায়, তখন আপনা আপনি শিখা নিভে যায়। শেষে তোমরা ছাই–এর মতো কিছু দেখতে পাচ্ছ কি? এটি আসলে ম্যাগনেসিয়াম ও অক্সিজেন পুড়ে তৈরি হওয়া ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড।

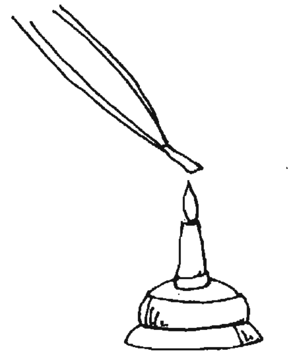

চিত্র-১১.৮ : ম্যাগনেসিয়াম ও বায়ুর দহন পর্যবেক্ষণ

কাজ : কার্বোনেট যৌগ ও এসিডের বিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ: চক, ১টি চামচ, পাতলা হাইড্রোক্লোরিক এসিড, কাঁচের ড্রপার ।

পদ্ধতি : চকটিকে গুঁড়া করে নাও। চকের গুঁড়া চামচে নাও। এবার কাঁচের ড্রপার দিয়ে পাতলা হাইড্রোক্লেরিক এসিড চামচে যোগ করতে থাক। কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছ ? গ্যাসের বুদবুদ উঠছে? হ্যাঁ, গ্যাসের বুদবুদ উঠছে এবং অনেকটা ফেনার মতো মনে হচ্ছে ।

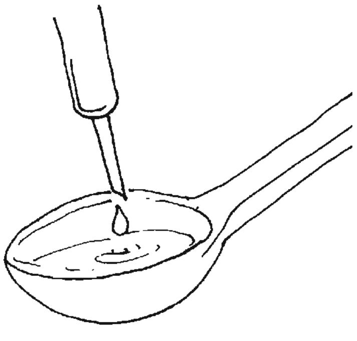

চিত্র-১১.৯: কার্বোনেট যৌগ ও এসিডের বিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ

এর কারণ কি? কারণ হলো, চক হচ্ছে মূলত ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ($CaCO_3$)। পাতলা হাইড্রোক্লোরিক এসিড যোগ করাতে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ও হাইড্রোক্লোরিক এসিডের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটে এবং ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ও কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়। এই কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের কারণেই আমরা বুদবুদ দেখি ও ফেনার মতো দেখায়। উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড চলে গেলে আমরা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের ও পানির পরিষ্কার দ্রবণ দেখতে পাই ।

এটি কী ধরনের পরির্বতন? ভৌত না রাসায়নিক? এটি রাসায়নিক পরিবর্তন, কারণ উৎপন্ন পদার্থ (ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি) ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড থেকে সম্পুর্ণ আলাদা এবং এদের ধর্মও পুরোপুরি ভিন্ন। চকের বদলে তোমরা ডিমের খোসাও ব্যবহার করতে পার। কারণ এতের প্রচুর ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থাকে ।

পাঠ–৯, ১০ :

কাজ : ধাতু ও এসিডের বিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ম্যাগনেসিয়াম রিবন, পাতলা হাইড্রোক্লোরিক এসিড, স্পিরিট ল্যাম্প ও টেস্ট টিউব।

পদ্ধতি: টেস্টটিউবের অর্ধেক পরিমাণ ভরে পাতলা হাইড্রোক্লোরিক এসিড নাও। ম্যাগনেসিয়াম রিবনের কয়েকটি ছোট ছোট টুকরা এসিডে ছেড়ে দাও। কোনো গ্যাসের বুদবুদ উঠছে কি? না উঠলে স্পিরিট ল্যাম্প জ্বালিয়ে টেস্ট টিউবের তলায় হালকা তাপ দাও। গ্যাসের বুদবুদ উঠছে কি? এটি ম্যাগনেসিয়াম ও হাইড্রোক্লোরিক এসিডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হাইড্রোজেন গ্যাসের বুদবুদ। এটি হাইড্রোজেন গ্যাস কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে পার। টেস্ট টিউবের মুখে একটি জ্বলন্ত দিয়াশলাই ধরে দেখ কি ঘটে? পপ পপ শব্দ করে জ্বলছে? হ্যাঁ, ঠিক তাই। এটি হাইড্রোজেন ছাড়া অন্য গ্যাস হলে এমন শব্দ হতো না। ধাতুর সাথে পাতলা হাইড্রোক্লোরিক এসিডের বিক্রিয়া কী ধরনের পরিবর্তন? অবশ্যই রাসায়নিক পরির্বতন। কারণ এতে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী নতুন পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে।

ম্যাগসিয়াম রিবন ছাড়াও তোমরা জিংক, এলুমিনিয়াম, কপার বা অন্য ধাতু দিয়েও এ পরীক্ষা করতে পার ।

শিলা গঠন প্রক্রিয়া

এর আগে তোমরা জেনেছ যে শিলা তিন ধরনের হয়, যথা আগ্নেয় শিলা, পাললিক শিলা ও রূপান্তরিত শিলা। শিলার গঠন প্রক্রিয়া নির্ভর করে এটি কী ধরনের শিলা তার উপর। প্রথমে আগ্নেয় শিলার কথাই ধরা যাক। তোমরা কি জান, আগ্নেয় শিলা কিভাবে গঠিত হয়েছে? হাজার হাজার বছর আগে পৃথিবীর তাপমাত্রা অনেক বেশি ছিল এবং ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে আজকের বাসযোগ্য পৃথিবী হয়েছে। পৃথিবী ঠাণ্ডা হওয়ার সময় ভূ–গর্ভের অভ্যন্তরে উত্তপ্ত ও গলিত শিলা (যা ম্যাগমা নামে পরিচিত) আটকে পড়ে। এই ম্যাগমা পরে ঠাণ্ডা হয়ে কঠিন শিলায় পরিণত হয়, যাকে আগ্নেয় শিলা বলে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আগ্নেয় শিলা মূলত উত্তপ্ত মিশ্রণ ঠাণ্ডা হওয়ার ফলে তৈরি হয়েছে, নতুন পদার্থ সৃষ্টির মাধ্যমে নয়। তাহলে আগ্নেয় শিলায় গঠন প্রক্রিয়া অবশ্যই একটি ভৌত পরির্বতন, ঠিক যেমনটি ঘটে জলীয়বাষ্প থেকে ঘনীভবনের মাধ্যমে পানি বা মেঘ তৈরির সময়।

চিত্র-১১.১০ : শিলা

এবার দেখা যাক পাললিক শিলা কীভাবে গঠিত হয়। জলবায়ুজনিত পরির্বতনের ফলে বাতাস, পানি, তুষার ও হিমবাহ সমূদ্রস্রোত, ঝড়, জলোচ্ছাস ইত্যাদির প্রভাবে আগ্নেয় শিলা ক্ষয়–প্রাপ্ত হয়। ফলে চুর্ণবির্চূন হয়ে ছোট ছোট কণায় পরিণত হয়। এই ছোট ছোট কণাগুলো

পানি বা বায়ু দ্বারা প্রবাহিত হয়ে নদ–নদীর মাধ্যমে সাগরে গিয়ে পড়ে এবং তলদেশে আস্তে আস্তে পলিরূপে জমা হয়। এই সময় এর সাথে জীবজন্তু বা গাছপালার দেহাবশেষও পলি স্তরের মাঝে আটকা পড়ে। পানির চাপ ও তাপে নানা রকম রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে জমাকৃত পলি ধীরে ধীরে কঠিন শিলায় পরিণত হয়, যাকে পাললিক শিলা বলে। যেহেতু পাললিক শিলার গঠনে নানাবিধ রাসায়নিক বিক্রিয়া জড়িত থাকে, তাই এদের গঠন প্রক্রিয়ায় রাসায়নিক পরির্বতন ঘটে।

এবার রূপান্তরিত শিলার গঠন প্রক্রিয়া দেখা নেয়া যাক। রূপান্তরিত শিলা তৈরি হয় আগ্নেয় বা পাললিক শিলা থেকে। তাপ, চাপ ও রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রভাবে আগ্নেয় বা পাললিক শিলা পরিবর্তিত হয়ে নতুন ধরনের যে শিলা তৈরি করে, তাকেই রূপান্তরিত শিলা বলে। যেমন বেলে পাথর (sandstone) একটি পাললিক শিলা এবং এটি রূপান্তরিত হয়ে কোয়ার্টজে (quartz) পরিণত হয় বলে কোয়ার্টজ একটি রূপান্তরিত শিলা। একই ভাবে চুনাপাথর থেকে মার্বেল এবং কয়লা থেকে গ্রাফাইট তৈরি হয় বলে মার্বেল ও গ্রাফাইটও রূপান্তরিত শিলা। রূপান্তরিত শিলার ধর্ম মূল শিলা থেকে আলাদা হওয়ায় এবং রূপান্তরের সময় রাসায়নিক বিক্রিয়া জড়িত বলে রূপান্তরিত শিলার গঠন এক ধরনের রাসায়নিক পরিবর্তন হিসেবে ধরা যায়।

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

ভৌত পরিবর্তনের ফলে সংশ্লিষ্ট পদার্থের অবস্থার বা আকার আকৃতির পরিবর্তন ঘটে কিন্তু নতুন পদার্থের সৃষ্টি হয় না ও পদার্থের ধর্মের কোনো পরিবর্তন হয় না।

- রাসায়নিক পরিবর্তনে এক বা একাধিক পদার্থ পরিবর্তিত হয়ে ভিন্নধর্মী নতুন পদার্থে পরিণত হয়।
- লোহার তৈরি দ্রব্যসামগ্রীর উপর দস্তার পাতলা আস্তরন দেয়াকে গ্যালভানাইজেশন বলে।
- ইলেকট্রোপ্লেটিং হলো তড়িৎ বিশ্লেষণের সাহায্যে একটি ধাতুর উপর আরেকটি ধাতুর পাতলা আবরণ তৈরির প্রক্রিয়া।
- দহনে কোনো পদার্থ বাতাসের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে তাপশক্তি উৎপন্ন করে।
- পানি চক্রে জড়িত অতি গুরুত্বপূর্ন কয়েকটি পরিবর্তন হচ্ছে বাষ্পীভবন, ঘনীভবন, বৃষ্টি, প্রস্বেদন ও ক্ষরণ।
- শিলা তিন ধরনের হয়, যথা আগ্নেয় শিলা, পাললিক শিলা ও রূপান্তরিত শিলা।
- আগ্নেয় শিলার গঠন প্রক্রিয়ায় ভৌত পরির্বতন এবং পাললিক শিলা ও রূপান্তরিত শিলার গঠনে রাসায়নিক পরিবর্তন জড়িত।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. স্ফুটন একটি ———————— পরিবর্তন।

২. চায়ে চিনি মিশানো একটি ———————— পরিবর্তন।

৩. কাগজ পুড়ানো একটি ———————— পরিবর্তন।

৪. ক্ষরণ প্রক্রিয়া ———————— চক্রের সাথে জড়িত।

৫. চুনাপাথর একটি ———————— শিলা।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন কাকে বলে? উদাহরণ দাও ।
২. দহন কি? উদাহরনসহ ব্যাখ্যা কর ।
৩. চুলায় খড়ি বা গ্যাসপুড়ালে কোন ধরনের পরিবর্তন হয়, ভৌত না রাসায়নিক? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও ।
৪. পানি চক্রের গুরুত্ব আলোচনা কর ।
৫. আগ্নেয় শিলা, পাললিক শিলা ও রূপান্তরিত শিলার বৈশিষ্ট্য কী কী?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি রাসায়নিক পরিবর্তন?

ক. গলন খ. বাস্পীভবন
গ. সালোকসংশ্লেষণ ঘ. প্রস্বেদন

২. P ও Q এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলো-

i. প্রাণী শ্বসনের সময় P ত্যাগ করে
ii. উদ্ভিদ ও প্রাণীর শ্বসনের প্রধান উপাদান Q
iii. সালোক সংশ্লেষনের প্রধান উপাদান P

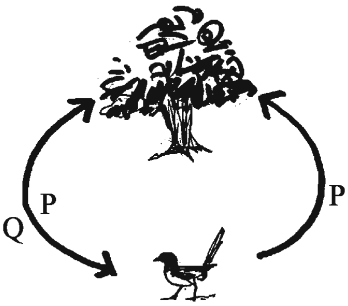

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

আনিস সাহেব একজন নির্মাণ ঠিকাদার। তিনি বিল্ডিংয়ের সৌন্দর্য বাড়াতে সাধারণত চুনাপাথরের রূপান্তরিত শিলা ব্যবহার করেন। তবে কখনও কখনও গ্রানাইট পাথরও ব্যবহার করেন, যা ম্যাগমা থেকে উৎপন্ন।

৩. উদ্দীপকে উলেরখিত রূপান্তরিত শিলাটিতে এসিড প্রয়োগ করলে কোন গ্যাসটি উৎপন্ন হবে?
ক. O_2 খ. CO_2 গ. N_2 ঘ. H_2

৪. উদ্দীপকে উল্লেখিত গ্রানাইট কোন ধরনের শিলা?
ক. আগ্নেয় খ. পাললিক গ. রূপান্তরিত ঘ. জীবাশ্ম

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.কার্বন ডাইঅক্সাইড + পানি $\xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{☼}$ $\boxed{A} + \boxed{B}$

ক. মরিচা কী ?
খ. ইলেকট্রোপ্লেটিং বলতে কী বুঝায়?
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত বিক্রিয়াতে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটে ব্যাখ্য কর ।
ঘ. উদ্দীপকের A ও B-এর মধ্যে কোন উপাদানটি পরিবেশে চক্রাকারে আবর্তিত হয় বিশ্লেষণ কর ।

২।

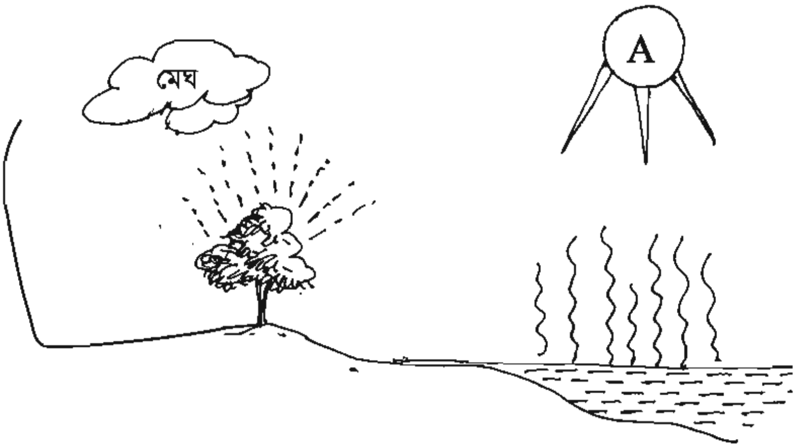

ক. উপরের চিত্রটি কীসের?
খ. পাললিক শিলা কীভাবে তৈরি হয়?
গ. চিত্রের উল্লিখিত প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর?
ঘ. চিত্রের প্রক্রিয়াটিতে A -এর ভূমিকা বিশ্লেষণ কর ।

দ্বাদশ অধ্যায়

সৌরজগত ও আমাদের পৃথিবী

আমাদের বাসভূমি পৃথিবী, অন্য সাতটি গ্রহ এবং আরও কিছু জ্যোতিস্ক সূর্যকে কেন্দ্র করে সব সময় ঘুরছে। সূর্য এবং একে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান সকল জ্যোতিস্ক ও ফাঁকা জায়গা নিয়ে আমাদের সৌরজগত গঠিত। সৌরজগতের বেশির ভাগ জায়গাই ফাঁকা। আমাদের এই পৃথিবী দু'ভাবে ঘুরছে। পৃথিবী তার নিজ অক্ষের উপর পাক খাচ্ছে আবার সূর্যকে কেন্দ্র করে এক বছরে একবার ঘুরে আসছে। পৃথিবীর এ ঘোরার ফলেই দিন–রাত হয়, ঋতু পরিবর্তিত হয়।

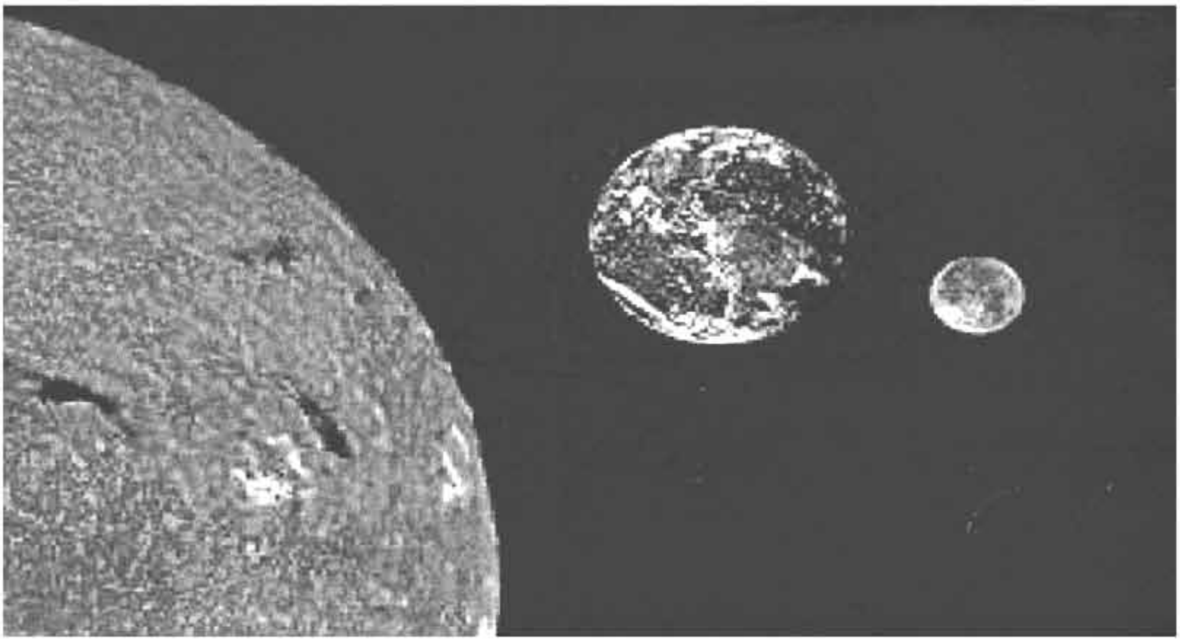

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- সৌরজগতের গঠন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সৌরজগতের সদস্যদের ভৌত বৈশিষ্ট্য তুলনা করতে পারব।
- সৌরজগতের গঠন কাঠামোর চিত্র অঙ্কন করতে পারব।
- পৃথিবী ঘূর্ণনের প্রভাব এবং এর ফলে সৃষ্ট ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জীবজগতে পৃথিবীর ঘূর্ণনের প্রভাব উপলব্ধি করতে পারব।

পাঠ–১ : সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘোরে

ষষ্ঠ শ্রেণিতে তোমরা পৃথিবী, সূর্য ও চন্দ্রের কিছুটা পরিচয় পেয়েছ। ভোরবেলায় সূর্যকে পূর্ব দিগন্তে উঠতে দেখা যায়। ধীরে ধীরে এটি আমাদের মাথার উপরের দিকে উঠে আসে। সন্ধায় দেখ সূর্য পশ্চিম দিগন্তে ডুবে যায়। রাত শেষে পরদিন ভোরে সূর্যকে আবার পূর্ব দিগন্তে উঠতে দেখ। পৃথিবী থেকে মনে হয় সূর্য পূর্ব থেকে পশ্চিমে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে। আগের দিনের মানুষ এটাই মনে করতেন। তবে বিজ্ঞানীরা এখন প্রমাণ করতে পেরেছেন যে আসলে সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘোরে না। বরং পৃথিবীই সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে।

সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে–এটা কেন আমাদের মনে হয়? তোমরা নিশ্চয়ই বাস, লঞ্চ বা রেলগাড়ীতে করে দূরে বেড়াতে গিয়েছ? তোমরা কি একটা বিষয় খেয়াল করেছ? এগুলো যখন খুব দ্রুত যায়, তখন পাশের গাছপালা গুলো পেছনের দিকে ছুটছে বলে মনে হয়। আসলে রেলগাড়ী, লঞ্চ বা বাস সামনের দিকে চলছে কিন্তু মনে হয় এটি দাঁড়িয়ে আছে। আর পাশের গাছপালা আসলে স্থির কিন্তু মনে হয় এগুলো পেছনের দিকে ছুটছে। পৃথিবী আর সূর্যের ব্যাপারটি তেমনি। পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে কিন্তু পৃথিবী থেকে আমাদের মনে হয় সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে।

মানুষ প্রাচীন কাল থেকেই সূর্য, চন্দ্র ও তাঁরা নিয়ে আগ্রহী ছিল। তবে সে সময় মহাকাশের এসব জ্যোতিস্ক পর্যবেক্ষণের যন্ত্রপাতি ছিল না। তাই খালি চোখে যেমনটি বোঝা যেত তেমনটাই তারা বিশ্বাস করতেন। তোমরা হয়তো জেনেছো যে, অ্যারিস্টটল দুই হাজার বছরেরও বেশি সময় আগে বড় বিজ্ঞানী ও দার্শনিক ছিলেন। তিনিও মনে করতেন পৃথিবীর চারপাশে সূর্য ঘোরে। এখন থেকে প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে বিখ্যাত গণিতবিদ ও জ্যোর্তিবিজ্ঞানী টলেমী জোরালোভাবে বলেন যে, পৃথিবীকে কেন্দ্র করেই সবকিছু ঘুরছে। তার এই মতবাদ দীর্ঘদিন মানুষ বিশ্বাস করেছে। কিছু কিছু জ্যোর্তিবিদ টলেমীর মতবাদে বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু তার এই মতবাদকে কেউ ভুল প্রমাণিত করতে পারেননি।

এরপর কোপারনিকাস (১৪৭৩–১৫৪৩) নামে একজন জ্যোর্তিবিদ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সর্ম্পূণ নতুন মতবাদ নিয়ে আসেন। তিনি পৃথিবীকেন্দ্রিক মডেলের বদলে সূর্যকেন্দ্রিক মডেলের প্রস্তাব করেন। তার মডেলের মূল কথা হলো পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে। তিনি আরও একটি নতুন কথা বলেন সেটি হলো, পৃথিবী তার নিজের অক্ষের উপর আবর্তন করছে। পরবর্তীতে বিজ্ঞানী গ্যালিলিও ও কেপলার, কোপারনিকাসের এই মতবাদের পক্ষে প্রমান হাজির করেন। বর্তমানে সূর্যকেন্দ্রিক এই মডেল প্রমানিত এবং বিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষ তা গ্রহন করেছে।

পাঠ ২–৪ : সৌরজগতের গঠন ও পরিচয়

তোমরা জেনেছ সূর্য একটি নক্ষত্র। সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবীসহ আরও সাতটি গ্রহ ও অন্যান্য জ্যোতিষ্ক ঘুরছে। সূর্য এবং একে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান সকল জ্যোতিষ্ক ও ফাঁকা জায়গা নিয়ে আমাদের সৌরজগত গঠিত। সৌরজগতের বেশির ভাগ জায়গাই ফাঁকা।

সূর্যকে কেন্দ্র করে আটটি গ্রহ বিভিন্ন দূরত্বে থেকে ঘুরছে। নিচে ঘূর্ণায়মান গ্রহগুলোর কক্ষপথ দেখানো হলো এবং সৌরজগতের সদস্যদের পরিচয় দেওয়া হলো।

সূর্য: আমাদের সৌরজগতের কেন্দ্রে রয়েছে সূর্য। সূর্য অন্যান্য নক্ষত্রের মতো জ্বলন্ত একটি গ্যাসপিন্ড। এই জ্বলন্ত গ্যাসপিন্ডে রয়েছে মূলত হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস। হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে হিলিয়াম পরমাণুতে পরিণত হয়। এ প্রক্রিয়ায় প্রচুর শক্তি উৎপন্ন হয়। এ শক্তি তাপ ও আলোকশক্তি হিসেবে সৌরজগতে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবেই সূর্যের কাছ থেকে আমরা তাপ ও আলো পেয়ে থাকি।

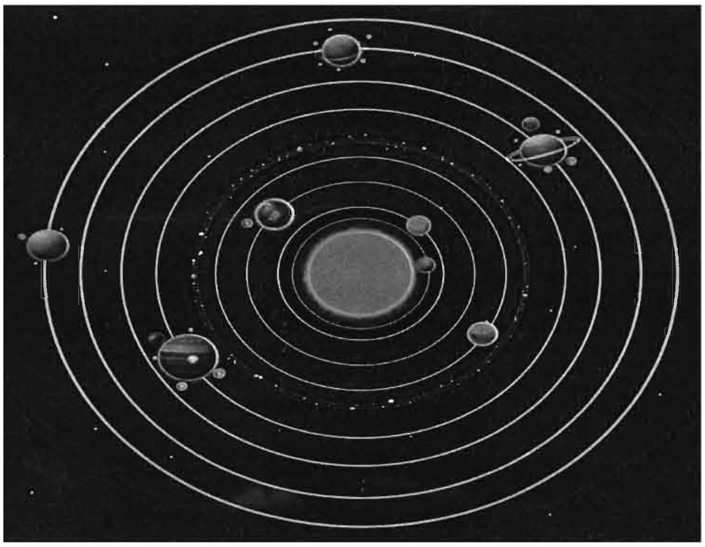

চিত্র-১২.১ : সৌরজগৎ

সূর্য মাঝারি আকারের একটি নক্ষত্র। তারপরও এটি পৃথিবীর তুলনায় লক্ষ লক্ষ গুণ বড়। সূর্য পৃথিবী থেকে প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। তাই পৃথিবী থেকে আমরা সূর্যকে এত ছোট দেখি।

গ্রহগুলোর পরিচয়: সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে আটটি গ্রহ। পৃথিবী এমন একটি গ্রহ। গ্রহসমুহ সাধারণত গোলাকৃতির। গ্রহগুলোতে বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থ রয়েছে। কিন্তু গ্রহগুলো নিজেরা শক্তি উৎপাদন করে না। তাই কোনো গ্রহ নিজে আলো বা তাপ নিঃসরণ করে না। পৃথিবী থেকে সূর্যের অন্যান্য গ্রহকে উজ্জ্বল দেখালেও এগুলো আসলে সূর্যের আলোতে আলোকিত। গ্রহগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় হলো:

বুধ: বুধ সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ। এতে কোনো বায়ুমন্ডল নেই।

শুক্র: পৃথিবী থেকে সন্ধ্যায় পশ্চিম আকাশে সন্ধ্যাতারা এবং ভোরবেলায় শুকতারা রূপে যে তারাটি দেখা যায়, সেটি কোনো নক্ষত্র নয়। এটি আসলে সূর্যের একটি গ্রহ, যার নাম শুক্র। সূর্যের আলো এ গ্রহের উপরে পড়ে। তাই আমরা একে আলোকিত দেখি।

পৃথিবী: তোমরা হয়তো জান যে, কেবল পৃথিবীতেই জীবনের জন্য উপযোগী উপকরণ ও পরিবেশ রয়েছে। পৃথিবী সূর্য থেকে দূরত্বের দিক দিয়ে তৃতীয় গ্রহ।

মঙ্গল: মঙ্গলকে কখনো কখনো লাল গ্রহ বলা হয় কারণ এর পৃষ্ঠ লাল রঙের। এর পৃষ্ঠ ধুলিময় এবং খুবই পাতলা বায়ুমন্ডল রয়েছে। মঙ্গলের মাটির নিচে পানি থাকার সম্ভাবনা আছে বলে বিজ্ঞানীরা এখন মনে করেন।

বৃহস্পতি : বৃহস্পতি সূর্যের সবচেয়ে বড় গ্রহ। এটিতে শুধু গ্যাসই রয়েছে, কোনো কঠিন পৃষ্ঠ নেই।

শনি: শনি গ্রহটিও কেবল গ্যাস দিয়ে তৈরি। এটিকে ঘিরে কতগুলো রিং বা আংটা রয়েছে।

ইউরেনাস: ইউরেনাস গ্যাস ও বরফ দিয়ে গঠিত।

নেপচুন : নেপচুনও অনেকটা ইউরেনাসের মতো একটি গ্রহ।

আগে প্লুটো নামক একটি জ্যোতিস্ককে গ্রহ বলা হতো। কিন্তু ২০০৯ সালে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত নেন যে, এটি একটি ক্ষুদ্র অসম্পূর্ণ গ্রহ।

উপগ্রহ:

তোমরা জেনেছ সৌরজগতের গ্রহগুলো সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে। তেমনি গ্রহগুলোকে কেন্দ্র করে ঘুরছে ছোট ছোট উপগ্রহ। পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ চাঁদ। এটি পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। উপগ্রহগুলো আকারে গ্রহের চেয়ে অনেক ছোট হয়। নিজেরা তাপ বা আলো উৎপন্ন করতে পারে না। এরা তাই সূর্যের আলো দ্বারা আলোকিত হয়। সূর্যের আলো চাঁদের পৃষ্ঠে পড়ে প্রতিফলিত হয় বলে আমরা চাঁদকে আলোকিত দেখি।

চাঁদ ২৭ দিন ৮ ঘন্টায় একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। চাঁদ প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের আগ্রহের বস্তু। তোমরা দেখ যে চাঁদ এক রাতে হয়তো একেবারেই দেখা যায় নাদ যাকে আমরা অমাবস্যা বলি। তার পরের রাতে সরু এক ফালি চাঁদ পশ্চিম আকাশে অল্প সময়ের জন্য দেখা যায়। এই সরু এক ফালি চাঁদ প্রতি রাতে বড় হতে থাকে। দুই সপ্তাহ পর চাঁদকে একটি থালার মতো দেখা যায়। একে আমরা পূর্ণিমা বলি। পূর্ণিমার পরের রাত থেকে চাঁদটি আবার ছোট হতে থাকে। এভাবে ছোট হতে হতে আবার দুই সপ্তাহ পর চাঁদকে কোন এক রাতে এক বারের জন্যও দেখা যায়না। এভাবে ২৯ বা ৩০ দিন পর পর আমরা অমাবস্যা ও পূর্ণিমা হতে দেখি। কেন এরকম হয়? এ প্রশ্নের উত্তর তোমরা উপরের শ্রেণিতে জানবে।

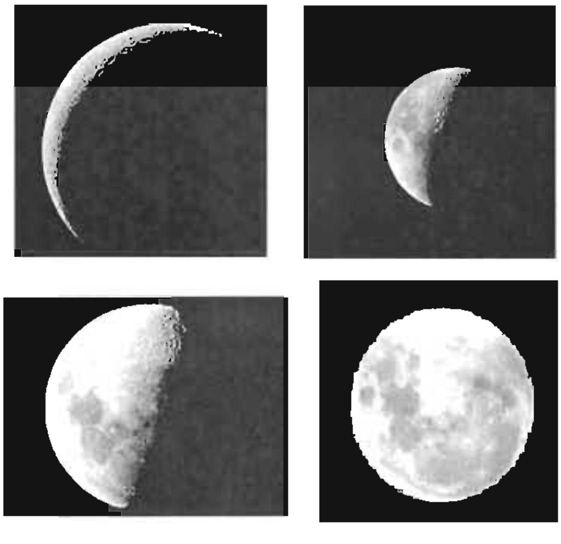

চিত্র-১২.২ : নতুন চাঁদ ও পূর্ণিমার চাঁদ

চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ হলেও পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে ২৫০০ এর বেশি মানুষ প্রেরিত উপগ্রহ। এদেরকে কৃত্রিম উপগ্রহ বলা হয়। এ কৃত্রিম উপগ্রহগুলো বেতার ও টেলিযোগাযোগ, আবহাওয়া এবং অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করা হয়। পৃথিবীর মতো অন্যান্য গ্রহেরও প্রাকৃতিক উপগ্রহ রয়েছে।

সৌরজগতে অন্যান্য জ্যোতিস্ক

আমাদের সৌরজগতে সূর্য, গ্রহ ও উপগ্রহ ছাড়াও রয়েছে অন্যান্য জ্যোতিষ্ক। এরা হলো– ধুমকেতু, উল্কা ও গ্রহাণু। সূর্যকে কেন্দ্র করে এরা ঘুরছে। গ্রহের চেয়ে আকারে বেশ ছোট কঠিন শিলাময় বা ধাতব বস্তু– যাদের নাম গ্রহাণু। এরা ক্ষুদ্র গ্রহের মতো। ধুমকেতুসমুহও আমাদের সৌরজগতের অংশ। এরা কঠিন (গ্যাস, বরফ ও ধূলিকণা) পদার্থ দিয়ে তৈরি। তবে তাপ পেলে কিছু অংশ সহজেই গ্যাসে পরিণত হতে পারে। যখন ধুমকেতুসমুহ সূর্যের কাছাকাছি যায় তখন সূর্যের তাপে গ্যাসীয় ও কঠিন পদার্থ নির্গত হয়ে আকাশে ছড়িয়ে যায়। তখন এটি ঝাটার মত দর্শনীয় লেজে পরিণত হয়। পৃথিবী থেকে এদেরকে কখনো কখনো দেখা যায়। কোনো কোনো ধুমকেতু অনেক বছর পর পর পৃথিবীর আকাশে দেখা যায়। যেমন, হ্যালির ধুমকেতু গড়ে ৭৫ বছর পর পর পৃথিবী থেকে দেখা যায়। এটিকে ১৯১১ সালে এবং ১৯৮৬ সালে দেখা গেছে। একে আবার ২০৬২ সালে দেখা যাওয়ার কথা।

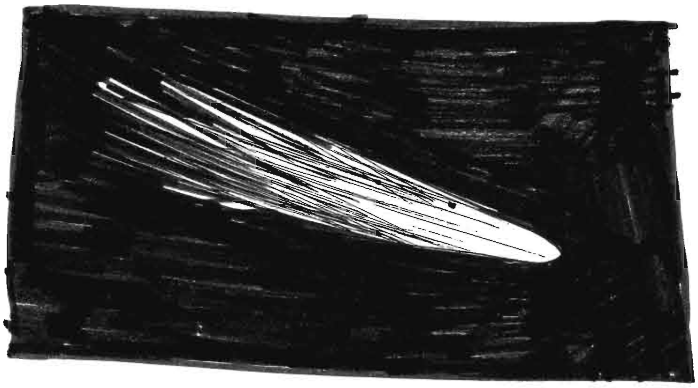

চিত্র-১২.৩ : ধুমকেতুর ছবি

তোমরা কি কখনো রাতের বেলায় হঠাৎ আকাশে আগুনের গোলক ছুটে যেতে দেখেছ? এরা উল্কাপিন্ড। সূর্যের চারপাশে ঘূর্ণায়মান জ্যোতিস্ক সমুহের মধ্যে সবচেয়ে ছোট হলো উল্কাপিন্ড। এই ক্ষুদ্র কঠিন পিন্ড পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে পৌঁছালে বায়ুর সংস্পর্শে এসে পুড়ে যায়। এ জন্য এদেরকে অগ্নিগোলকের মতো ছুটে বা পড়ে যেতে দেখা যায়। কখনো কখনো বড় উল্কাপিন্ড আধপোড়া অবস্থায় পৃথিবীপৃষ্ঠে পড়ে বড় গর্তের সৃষ্টি করে।

পাঠ–৫: আমাদের বাসভূমি পৃথিবী

আমরা পৃথিবীতে বাস করি। আমাদের এই পৃথিবীর আকার কেমন? আমরা চারদিকে তাকালে কি এর আকার বুঝতে পারি? একে কি গোলাকার চাকতি বা থালার মতো মনে হয়? আপাতদৃষ্টিতে পৃথিবীকে একটি থালার মতো মনে হয়। মনে হয় আমরা, আমাদের ঘরবাড়ি ঐ থালা বা চাকতির উপরে আছি। আর আকাশ এই থালাকে ঢেকে আছে। কিন্তু পৃথিবী থালা বা চাকতির মতো নয়। এটি গোলাকার, তবে পুরোপুরি গোলাকার নয়। পৃথিবী কমলালেবুর মতো উত্তর– দক্ষিণ দিকে কিছুটা চাপা।

গোলকাকার পৃথিবী পৃষ্ঠের চার ভাগের তিন ভাগ পানি আর একভাগ মাটি দিয়ে আবৃত। আর এই গোলকাকার পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে গ্যাসীয় বায়ুমণ্ডল। তোমরা নিশ্চয়ই ভূগোলক বা গ্লোব দেখেছো? আমরা ভূগোলকের মতো একটি গোলকের পৃষ্ঠে অবস্থান করছি। প্রশ্ন হলো, আমরা তাহলে পৃথিবী থেকে দুরে ছিটকে বা পড়ে যাই না কেন ?

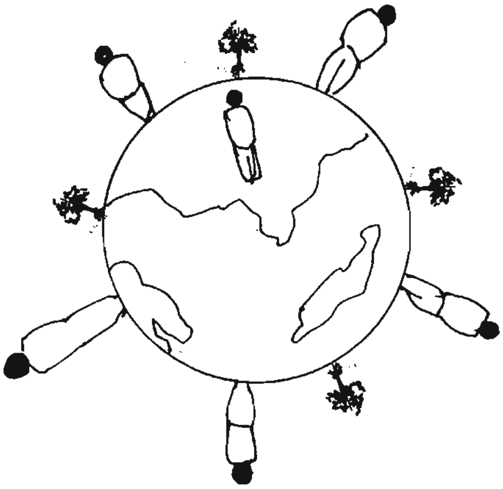

চিত্র-১২.৪ : পৃথিবী পৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে মানুষের অবস্থান

এর কারণ অভিকর্ষ বল। পৃথিবী তার পৃষ্ঠের সবকিছুকে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে টেনে ধরে এই বলের সাহায্যে। এর ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠে অবস্থানকারী কোনো কিছুই পৃষ্ঠ থেকে ছিটকে পড়ে না।

পাঠ–৬, ৭ : পৃথিবীর নিজ অক্ষে আবর্তন এবং সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণন

তোমরা দেখ সকালে সূর্য পূর্ব দিকে উঠে। সন্ধ্যা বেলায় পশ্চিম দিগন্তে ডুবে যায়। পরদিন সকালে তোমরা দেখ যে সূর্য আবার পূর্বদিক থেকে উঠছে। এ থেকে মনে হয় সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে ঘুরছে। আগের দিনে মানুষরা তাই ধারণা করতো যে পৃথিবী স্থির এবং সূর্য পৃথিবীরকে কেন্দ্র করে ঘোরে। প্রকৃতপক্ষে, পৃথিবীই সূর্যের চারদিকে ঘোরে এবং পৃথিবীর নিজ অক্ষের উপরও আবর্তন করে বা পাক খায়। তোমরা নিশ্চয়ই লাটিম নিয়ে খেলেছো? লাটিম কীভাবে ঘোরে? লাটিম তার সরু আল–এর উপর দাড়িয়ে নিজে নিজে পাক খায় বা আবর্তন করে। একই সাথে মাটির উপর বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার পথে এক স্থান থেকে অন্য স্থান হয়ে ঘুরে আসে।

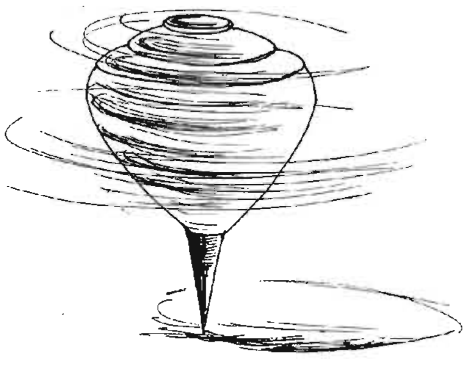

চিত্র-১২.৫ : লাটিমের দুই ধরনের ঘূর্ণন/গতি

এভাবে লাটিমটির দুই ধরনের গতি রয়েছে। একটি হলো নিজ অক্ষের উপর আবর্তন। আরেকটি হলো মাটির উপর দিয়ে ঘুরে আসা। লাটিমের মতো পৃথিবীরও দুই ধরনের ঘূর্ণন রয়েছে। একটি হলো পৃথিবীর নিজ অক্ষের উপর কেন্দ্র করে ২৪ ঘণ্টায় একবার পশ্চিম থেকে পূর্বে আবর্তন করে। এটিকে বলা হয় পৃথিবীর আহ্নিক গতি। দ্বিতীয়টি হলো পৃথিবী প্রায় ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা সময়ে একবার সূর্যের চারপাশে ঘুরে আসে। একে পৃথিবীর বার্ষিক গতি বলা হয়। পৃথিবীর আহ্নিক গতির অর্থাৎ নিজ অক্ষে আবর্তনের কারণে দিন–রাত হয়। দিন–রাত কীভাবে হয় তা নিচের পরীক্ষাটির মাধ্যমে ভালভাবে বোঝা যায়।

পরীক্ষণ : পৃথিবীর আহ্নিক গতির পরীক্ষা : দিন–রাত কীভাবে হয়?

উপকরণ : একটি ভুগোলক, একটি মোমবাতি অথবা কুপিবাতি অথবা চার্জ লাইট।

পরীক্ষণ প্রণালী: প্রথমে ভূগোলক ভালোভাবে লক্ষ কর। এর মাঝ বরাবর একটি শলাকা এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলে গেছে। এটিকে পৃথিবীর অক্ষরেখা হিসেবে কল্পনা কর যাকে কেন্দ্র করে পৃথিবী আবর্তন করে ।

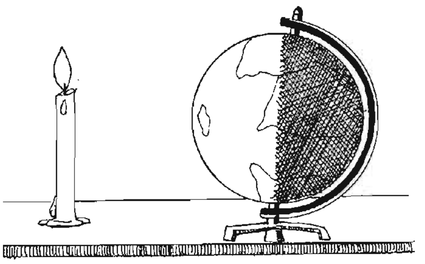

চিত্র-১২.৬ : পৃথিবীর আহ্নিক গতির পরীক্ষা

একটি টেবিল বা সমতল মেঝের উপর বাতিটি জ্বালিয়ে রাখ। এবার একটু দূরে ভূগোলকটিকে রাখ। কক্ষটির আলো নিভিয়ে বা দরজা জানালা বন্ধ করে ঘরটি অন্ধকার কর। বাতিটিকে সূর্য এবং ভূগোলকটিকে পৃথিবী হিসেবে বিবেচনা কর। এবার ভূগোলকটির দিকে তাকাও। ভূগোলকটির সবদিক কি সমান আলোকিত? না কোন দিক আলোকিত আর তার উল্টো দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন? দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই যে ভূগোলকটির অর্ধেক অংশ আলোকিত আর অন্য অর্ধেক অন্ধকারাচ্ছন্ন। কোন অর্ধেক আলোকিত? যে অর্ধেক বাতিটির দিকে আছে। আমরা আলোকিত অংশকে দিন আর অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশটিকে রাত মনে করতে পারি। এবার ভূগোলকটি আস্তে আস্তে ঘোরাও এবং লক্ষ করে দেখ কী হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে অন্ধকার অংশ আস্তে আস্তে আলোকিত হচ্ছে এবং আলোকিত অংশ ধীরে ধীরে অন্ধকার হচ্ছে । কিন্তু সবসময়ই ভূগোলকটির অর্ধেক অংশ আলো পাচ্ছে এবং বাকি অর্ধেক অংশ আলো পাচ্ছে না । এভাবে পৃথিবীর অর্ধেকাংশে দিন এবং বাকি অর্ধেক রাত চলতে থাকে । ভূগোলকটির একটি নির্দিষ্ট স্থান বাতিটির সামনে রেখে ধীরে ধীরে একদিকে ঘোরাতে থাকলে ঐ আলোকিত অংশ (দিন) ধীরে ধীরে অন্ধকার হতে হতে একসময় পুরোপুরি অন্ধকার (রাত) হয়ে যাবে। একই দিকে আরও ঘোরাতে থাকলে আবার ঐ নির্দিষ্ট স্থানটি আলোকিত হতে শুরু করে এবং একসময় পুরোপুরি আলোকিত হয়ে যায় । অর্থাৎ ঐ স্থানে আবার দিন ফিরে আসে।

এই পরীক্ষাটির মতো পৃথিবী তার নিজ অক্ষে আবর্তন করে ফলে আমরা দিন, তারপর রাত, আবার দিন, আবার রাত, আবার দিন এই রকম পরিবর্তন হতে দেখি । অন্যকথায়, দিন–রাত–দিন–রাত–দিন এই পরিবর্তন আমরা দেখি কারণ পৃথিবী তার নিজ অক্ষে আবর্তন করে বলে।

পাঠ–৮, ৯ : সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর ঘূর্ণন– পৃথিবীর বার্ষিক গতি

ইতোমধ্যে তোমরা পৃথিবীর আহ্নিক গতি বা নিজ অক্ষের উপর আবর্তন সম্পর্কে জেনেছে। পৃথিবীর অন্য গতিটি হচ্ছে বার্ষিক গতি। পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে প্রায় ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা সময়ে একবার ঘুরে আসে। এই সময়কে এক সৌর বছর বা এক বছর বলা হয় । পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফলে দিন–রাত ছোট বা বড় হয় এবং ঋতুর পরিবর্তন হয়।

তোমরা কী বছরের সবসময় একই রকমের আবহাওয়া দেখতে পাও? জানুয়ারি মাসে বা পৌষ–মাঘ মাসে শীত না গরম থাকে? আষাঢ় বা ভাদ্র মাসে আবহাওয়া কি পৌষ মাসের মতোই, না ভিন্ন? আমরা দেখি বাংলাদেশে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম আবহাওয়া থাকে । পৌষ বা মাঘ মাসে বেশ শীত পড়ে আবার বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে বেশ গরম পড়ে। কেন, তা ভাব তো? এইসব প্রশ্নের উত্তর জানা যাবে পৃথিবী সূর্যের চারপাশে কীভাবে ঘোরে তা জানলে।

পৃথিবী সূর্যের চারপাশে কিছুটা হেলে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। তবে পৃথিবী বছরের বিভিন্ন সময়ে তার হেলানো অবস্থান পরিবর্তন করে। তাই পৃথিবীর একটা নির্দিষ্ট অংশ একটি নির্দিষ্ট সময় সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে । পৃথিবীর একটি নির্দিষ্ট অংশ যখন সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে, তখন সেই অংশটি বেশিক্ষণ ধরে এবং খাড়াভাবে সূর্যের তাপ পায়। পৃথিবীর সেই অংশে তখন গ্রীষ্মকাল। তোমরা হয়তো জান যে, পৃথিবীর বিষুব রেখার দুই পার্শ্বকে দুটি গোলার্ধে ভাগ করা হয়। উত্তর অংশকে উত্তর গোলার্ধ এবং দক্ষিণ অংশকে দক্ষিণ গোলার্ধ ধরা হয়। আমরা উত্তর গোলার্ধে বাস করি। ২১ জুন তারিখে বাংলাদেশ সূর্যের কিছুটা কাছে চলে আসে। তাই এসময়ে আমরা সূর্যকে আমাদের মাথার উপর দেখতে পাই। এই সময়ে আমরা সবচেয়ে লম্বা দিন ও ছোট রাত দেখতে পাই। খাড়াভাবে এবং লম্বা সময় সূর্যের তাপ পাওয়ার কারণে এই সময়টিতে এবং এর কাছাকাছি সময়ে বাংলাদেশে বেশ গরম পড়ে। তবে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এই সময়ে বাংলাদেশে আষাঢ়–শ্রাবণ মাসে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বলে আমরা এই সময়টিকে বর্ষাকাল বলে থাকি ।

২১ জুন পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্য থেকে দূরে অবস্থান করে। তাই দক্ষিণ গোলার্ধে তখন রাত বড় হয়, দিন ছোট হয় এবং ওখানে সূর্যের তাপ তির্যক বা হেলানোভাবে পড়ে। ফলে দক্ষিণ গোলার্ধ এ সময় সূর্যের তাপ কম পায়। ওখানে তখন শীতকাল। যেমন অস্ট্রেলিয়ায় জুন, জুলাই ও আগস্ট এই তিন মাস শীতকাল।

পৃথিবী ২১ জুনের পরে তার হেলানো অবস্থান পরিবর্তন করতে থাকে। বাংলাদেশসহ উত্তর গোলার্ধ কিছুটা দূরে সরে যেতে থাকে, একই সাথে দক্ষিণ গোলার্ধ কিছুটা সূর্যের দিকে এগোতে থাকে। এইভাবে সেপ্টেম্বরের ২৩ তারিখে পৃথিবীর বিষুব অঞ্চল সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে এবং উত্তর ও দক্ষিণ মেরু ঐ সময়ে সূর্য থেকে সমান দূরত্বে থাকে । সেপ্টেম্বর ২৩ তারিখে তাই পৃথিবীর উভয় গোলার্ধে দিন–রাত সমান হয়। বিষুবীয় অঞ্চলে তখন সূর্য মাথার উপরে অবস্থান করে খাড়াভাবে কিরণ দেয়, তখন বিষুবীয় অঞ্চলে বেশ গরম পড়ে। বাংলাদেশে তখন দিন–রাত সমান বলে তখন শীতও নয় আবার খুব গরমও নয়। দক্ষিণ গোলার্ধেও তখন শীত চলে গিয়ে গ্রীষ্মকাল আসতে থাকে, অর্থাৎ সেখানে তখন বসন্ত।

২২ ডিসেম্বর দক্ষিণ গোলার্ধের একটি অংশ সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে। আর তখন বাংলাদেশ সূর্য থেকে দূরে অবস্থান করে। তাই তখন বাংলাদেশে দিন ছোট হয় এবং রাত বড় হয়। সূর্যকে দেখ দক্ষিণ দিকে হেলে কিরণ দিতে। কম সময় এবং তির্যকভাবে কিরণ পায় বলে বাংলাদেশে তখন শীত পড়ে। পক্ষান্তরে, দক্ষিণ গোলার্ধের অস্ট্রেলিয়ায় তখন দিন বড় এবং রাত ছোট হয়। সূর্য তখন দক্ষিণ গোলার্ধে খাড়া ভাবে কিরণ দেয়। তাই দক্ষিণ গোলার্ধে তখন গ্রীষ্মকাল।

আবার পৃথিবী ২১ মার্চ সূর্যের দিকে মুখ করে হেলে থাকে। তখন আবার পৃথিবীর সকল স্থানে দিনরাত সমান হয়। এজন্য এই সময়ে আমাদের দেশেও দিনরাত সমান হয়। এই সময়ে শীতও বেশি থাকে না আবার গরমও বেশি পড়ে না। এই সময়ে আমাদের দেশে বসন্ত কাল। ২১ মার্চের পরে পৃথিবী আবার ঘুরতে ঘুরতে ২১ জুন তারিখে আগের বছরের অবস্থানে ফিরে আসে। এভাবে সূর্যের দিকে পৃথিবীর অবস্থানের তারতম্যের কারণে দিনরাত ছোট বা বড় হয় এবং এর ফলস্বরূপ ঋতু পরিবর্তিত হয়।

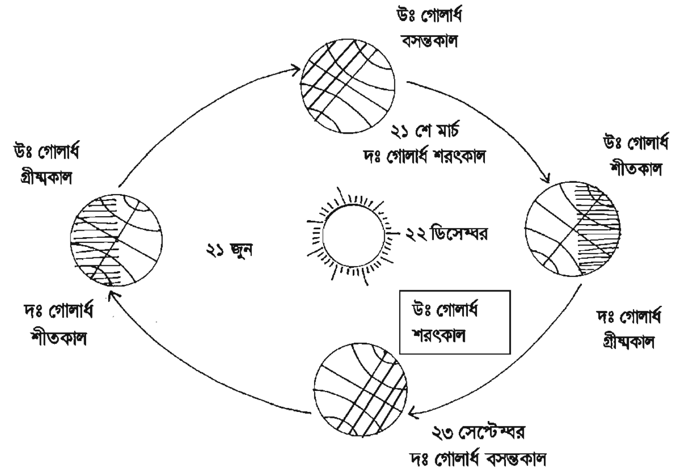
উঃ গোলার্ধ
বসন্তকাল
২১ শে মার্চ
দঃ গোলার্ধ শরৎকাল
উঃ গোলার্ধ
গ্রীষ্মকাল
উঃ গোলার্ধ
শীতকাল
২১ জুন
২২ ডিসেম্বর
দঃ গোলার্ধ
শীতকাল
উঃ গোলার্ধ
শরৎকাল
দঃ গোলার্ধ
গ্রীষ্মকাল
২৩ সেপ্টেম্বর
দঃ গোলার্ধ বসন্তকাল

চিত্র: ১২.৭: সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর ঘূর্ণন

পৃথিবী যদি সূর্যের চারদিকে না ঘুরতো তাহলে কী হতো ভাবো তো? পৃথিবী সূর্যের চারদিকে না ঘুরলে পৃথিবীর কোন একটি জায়গায় সবসময় একটি ঋতুই থাকতো। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে সারা বছর হয়তো গরম থাকতো। কোনো শীত আসতো না। উল্টোটাও হতে পারত। অর্থাৎ সবসময় শীত থাকতো। বাংলাদেশে বিভিন্ন ঋতু আছে বলে বিভিন্ন ফসল ফলে। একটি ঋতু থাকলে এক রকম ফসলই হতো। আমাদের জীবন ধারণ কষ্টকর হয়ে যেত।

রাশিয়া বা অন্যান্য শীতপ্রধান দেশে ঋতু পরিবর্তন না হলে মানুষ বাঁচতেই পারতো না। সেখানে বছরের বেশির ভাগ সময় বরফ ঢাকা থাকে। সেসময় ফসল ফলে না। অল্প সময় গ্রীষ্মকাল এলে বরফ গলে যায়। মানুষ তখন ফসল ফলায়। গ্রীষ্মকাল না এলে মানুষ ফসল ফলাতে পারতো না।

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে।
- সূর্য এবং একে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান সকল জ্যোতিস্ক ও ফাঁকা জায়গা নিয়ে আমাদের সৌরজগত গঠিত। সৌরজগতের বেশির ভাগ জায়গাই ফাঁকা।
- সূর্য অন্যান্য নক্ষত্রের মতো জ্বলন্ত একটি গ্যাসপিণ্ড। এই জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ডে রয়েছে মূলত হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস। হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণু পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হয়ে হিলিয়াম পরমাণুতে পরিণত হয়। এ প্রক্রিয়ায় প্রচুর তাপ ও আলোকশক্তি উৎপন্ন হয়ে সৌরজগতে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবেই সূর্যের কাছ থেকে আমরা তাপ ও আলো পেয়ে থাকি।
- গ্রহগুলোকে কেন্দ্র করে ঘুরছে ছোট ছোট উপগ্রহ। পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ চাঁদ। উপগ্রহগুলো আকারে গ্রহের চেয়ে অনেক ছোট হয়। এরা নিজেরা তাপ বা আলো উৎপন্ন করতে পারে না। এগুলো সূর্যের আলো দ্বারা আলোকিত হয়। সূর্যের আলো চাঁদের পৃষ্ঠে পড়ে প্রতিফলিত হয় বলে আমরা চাঁদকে আলোকিত দেখি।
- আমাদের সৌরজগতে সূর্য, গ্রহ ও উপগ্রহ ছাড়াও রয়েছে অন্যান্য জ্যোতিষ্ক। এরা হলো, ধুমকেতু, উল্কা ও গ্রহাণু। সূর্যকে কেন্দ্র করে এরা ঘুরছে।
- পৃথিবী থালা বা চাকতির মতো নয়। এটি গোলকাকার তবে পুরোপুরি গোলকাকার নয়। পৃথিবী কমলালেবুর মতো উত্তর–দক্ষিণ দিকে কিছুটা চাপা। আমরা পৃথিবীর পৃষ্ঠে অবস্থান করছি।
- পৃথিবীর দুই ধরনের ঘূর্ণন রয়েছে। একটি হলো পৃথিবীর নিজ অক্ষের উপর কেন্দ্র করে ২৪ ঘণ্টায় একবার পশ্চিম থেকে পূর্বে আবর্তন করে। এটিকে বলা হয় পৃথিবীর আহ্নিক গতি। দ্বিতীয়টি হলো পৃথিবী প্রায় ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টা সময়ে একবার সূর্যের চারপাশে ঘুরে আসে। একে পৃথিবীর বার্ষিক গতি বলা হয়।
- পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্য দিনরাত হয়। পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফলে দিন রাত ছোট বা বড় হয় এবং ঋতুর পরিবর্তন হয়।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. সূর্য মাঝারি আকারের একটি ——————।

২. সূর্যকে কেন্দ্র করে —————— গ্রহ ঘুরছে।

৩. চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র —————— উপগ্রহ।

৪. আমরা পৃথিবীর ——————অবস্থান করি।

৫. ---------বলের প্রভাবে আমরা পৃথিবী থেকে ছিটকে পড়ে যাই না।

সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. কেন আগে মানুষ মনে করত যে, সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘোরে?

২. কোন কোন বিজ্ঞানী পৃথিবীকেন্দ্রিক মডেলের কথা বলেছেন?

৩. সূর্যসহ অন্যান্য নক্ষত্র কীভাবে তাপ ও আলো উৎপন্ন করে চলেছে তা, ব্যাখ্যা কর।

৪. ধুমকেতু কী? এদের লেজ কীভাবে সৃষ্টি হয়? একটি পরিচিত ধুমকেতুর উদাহরণ দাও।

৫. একটি উপমা ব্যবহার করে পৃথিবীর দুই ধরনের গতি ব্যাখ্যা কর।

৬. দিন–রাত কীভাবে হয় তা একটি পরীক্ষার মাধ্যমে দেখাও।

৭. মানুষের জীবনে ঋতু পরিবর্তনের প্রভাব আলোচনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন গ্রহটি বরফ ও গ্যাস দ্বারা গঠিত?

ক. বৃহস্পতি খ. মঙ্গল
গ. শনি ঘ. ইউরেনাস

২. সূর্যের ক্ষেত্রে যে কথাটি প্রযোজ্য তা হলো, এটি–

i. একটি নক্ষত্র
ii. একটি জলন্ত গ্যাস পিণ্ড
iii. সকল গ্রহ ও নক্ষত্রকে আলো দেয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

নিচের সারণী থেকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

গ্রহ	সূর্য থেকে দূরত্ব (কি. মি.)	সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণের সময়
শুক্র	১০.৮০	২২৫ দিন
পৃথিবী	১৪.৯৬	৩৬৫ দিন
বৃহস্পতি	৭৭.৮৫	প্রায় ১২ বছর
শনি	১৪২.৭০	২৯ $\frac{১}{২}$ বছর
ইউরেনাস	১৮৭.১	–
নেপচুন	৪৪৯.৮	১৬৫ বছর

৩. সারণিতে উল্লেখ করা হয়নি কিন্তু সূর্য থেকে প্রায় ২২.৮ কোটি কি.মি দূরে অবস্থিত গ্রহটির অবস্থান কোথায়?

ক. পৃথিবী এবং শুক্রের মধ্যখানে
খ. বৃহস্পতি এবং শনির মধ্যখানে
গ. শনি এবং নেপচুনের মধ্যখানে
ঘ. পৃথিবী ও বৃহস্পতির মধ্যখানে

৪. ইউরেনাস সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে প্রায় কতো বছর সময় লাগবে–

ক. ১০ বছর
খ. ২৯ বছর
গ. ৮০ বছর
ঘ. ১৭০ দিন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

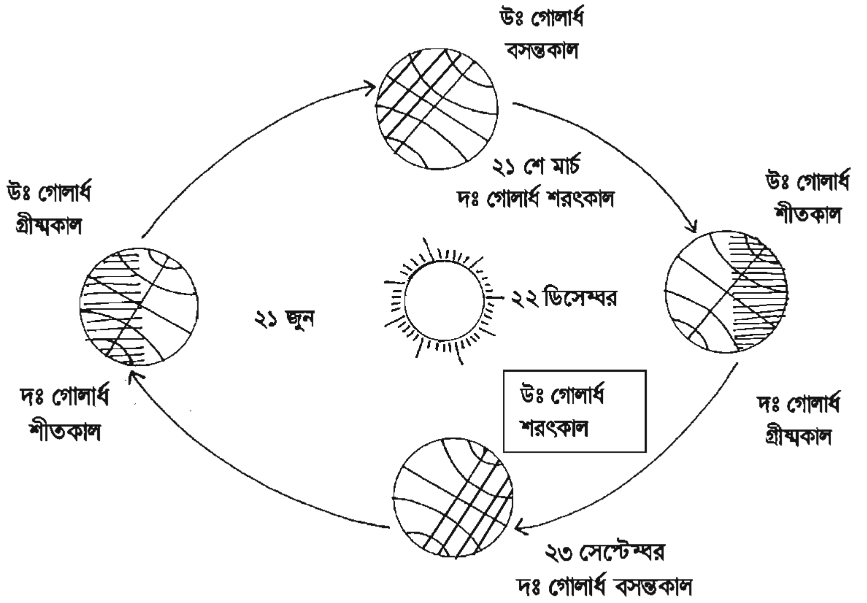
উঃ গোলার্ধ
বসন্তকাল
২১ শে মার্চ
দঃ গোলার্ধ শরৎকাল
উঃ গোলার্ধ
শীতকাল
উঃ গোলার্ধ
গ্রীষ্মকাল
২১ জুন
২২ ডিসেম্বর
দঃ গোলার্ধ
শীতকাল
উঃ গোলার্ধ
শরৎকাল
দঃ গোলার্ধ
গ্রীষ্মকাল
২৩ সেপ্টেম্বর
দঃ গোলার্ধ বসন্তকাল

ক. আহ্নিক গতি কী?

খ. জুনের মাঝামাঝি থেকে জুলাইয়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় কেন?

গ. দক্ষিণ গোলার্ধে সবচেয়ে ছোট রাত ও সবচেয়ে বড় দিন কখন হয় চিত্র, থেকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উত্তর গোলার্ধে ৩০ শে ডিসেম্বর দিন ও রাতের দৈর্ঘ্য কেমন হবে – যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।

২.

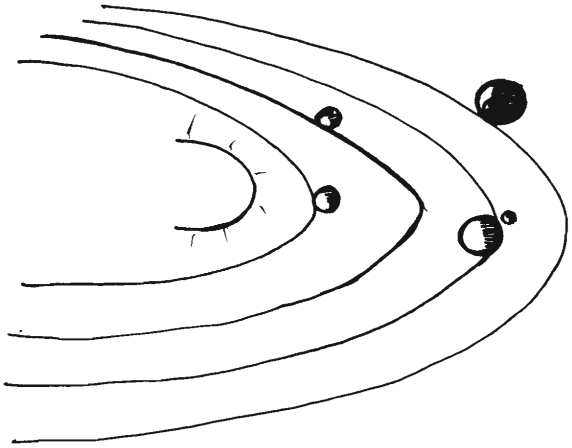

ক. চাঁদ কতদিনে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে?

খ. প্লুটোকে এখন আর সৌরজগতের সদস্য ধরা হয় না কেন?

গ. রাতের বেলায় ৩ এবং ৪ নম্বর গ্রহের মধ্যে কোনটি অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তৃতীয় গ্রহের সাথে অনেক মিল থাকা স্বত্ত্বেও ৪র্থ গ্রহটি জীবজগতের বসবাসের উপযোগী নয়– যুক্তি সহ ব্যাখ্যা কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং দূষণ

আমাদের চারপাশের সব জড় ও জীবকে নিয়ে গড়ে উঠেছে প্রাকৃতিক পরিবেশ। তোমরা জান বিভিন্ন জড় ও জীবের মধ্যে রয়েছে সম্পর্ক। আবার জীব ও পরিবেশের মধ্যেও রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক, যার ফলে আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে বিচিত্র সব কর্মকাণ্ড। পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করে, যার জন্য পরিবেশে সে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড চালায়। যেকোনো একটি পরিবেশে মানুষ যখন এ ধরনের কর্মকাণ্ড চালায়, তখন সেখানকার উপাদানসমূহের উপর বিভিন্ন প্রভাব পড়ে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- পরিবেশ দূষণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবেশের উপাদানসমূহের দূষণের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবেশের উপাদানের উপর দূষণের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবেশ সংরক্ষণে সমাজে সচেতনতা সৃষ্টিতে উদ্যোগী হব।
- পরিবেশ দূষণ এবং এর প্রভাব পোস্টারে উপস্থাপন করতে পারব।

পাঠ – ১: পরিবেশ দূষণ

সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে আমাদের চারপাশের পরিবেশ পরিবর্তিত হচ্ছে। মানুষ তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করছে। প্রাকৃতিক অথবা মানুষের বিভিন্ন কর্মকান্ড এই উভয় কারণেই পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের পরিবর্তন ঘটতে পারে এবং এতে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। ফলে মানুষ ও উদ্ভিদসহ অন্যান্য প্রাণীর জীবন ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এরকম অবস্থাকে আমরা বলি পরিবেশ দূষণ।

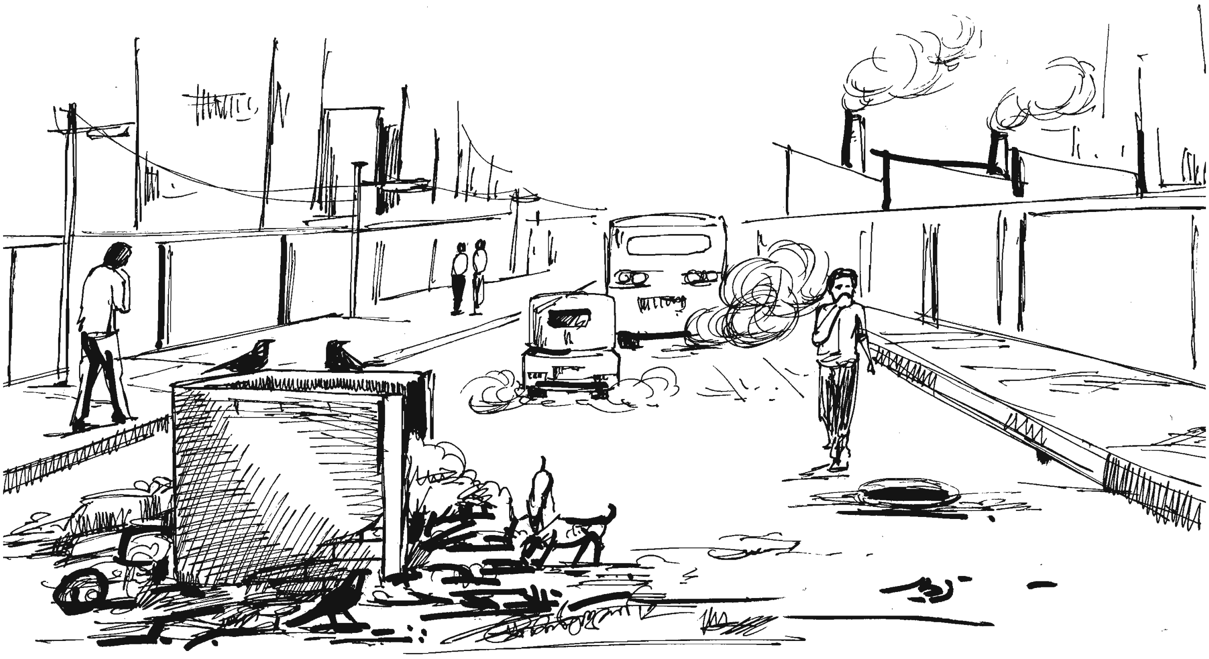

চিত্র-১৩.১ : দূষিত পরিবেশ

কাজ: পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে জানা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ: নোট খাতা ও কলম।

পদ্ধতি: তোমার এলাকা ও স্কুলের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ কর। পরিবেশে কোনো প্রকার দূষণ ঘটেছে কিনা তা লক্ষ কর এবং সনাক্ত কর। যে সকল দূষণ তুমি সনাক্ত করেছ, সে সম্পর্কে শ্রেণিতে আলোচনা কর।

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব থেকে শুরু করে সকল প্রকার জীব ও মানুষের বিচরণ পৃথিবীর এই পরিবেশে। পরিবেশের কোনো অংশই আজ দূষণমুক্ত নয়। মানুষ শুধু তার নিজের পরিবেশকেই দূষিত করছে না, সকল জীব ও তার পরিবেশও এই দূষণের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। পরিবেশ দূষণের ফলে মানুষসহ সকল উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন ধারণে বিঘ্ন ঘটেছে। দূষণ কেন ঘটছে? কিছু ক্ষতিকারক উপাদান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে

ব্যবহারের ফলে আমাদের পরিবেশ দূষিত করছে, যাকে আমরা দূষক (Pollutant) বলি। বিভিন্ন কারখানা, তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রের চিমনি এবং যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া, জমিতে ব্যবহৃত কীটনাশক, রাসায়নিক সার, বিভিন্ন আবর্জনা, পলিথিন, প্লাস্টিক ইত্যাদি হলো দূষকের উদাহরণ। এ সকল দূষক বিভিন্নভাবে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানকে দূষিত করছে।

পাঠ – ২ : পরিবেশের উপাদানসমূহের দূষণের কারণ

পরিবেশ প্রধাণত দুটো উপাদান নিয়ে গঠিত। জীব এবং জড় উপাদান। তোমরা জান সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী নিয়ে পরিবেশের জীব উপাদান গঠিত আবার জড় উপাদানের মধ্যে রয়েছে মাটি, পানি, বায়ুসহ পৃথিবীর অন্যান্য সকল জড়বস্তু। দূষণের ফলে পরিবেশের সকল জীব ও জড় উপাদান ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যার ফলে মানুষসহ সকল জীব পরিবেশে হুমকির সম্মুখীন হয়। এখন প্রশ্ন হলো, পরিবেশ দূষিত হওয়ার কারণ কী?

কাজ: পরিবেশের উপাদানসমূহের দূষণ সম্পর্কে জানা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ: নোট খাতা, পোস্টার কাগজ ও মার্কার।

পদ্ধতি: শিক্ষকের সহায়তায় দল গঠন কর। পূর্ববর্তী পাঠে তোমরা যে সকল দূষণ সনাক্ত করেছ, সেগুলোর কারণ কী, তা দলে পর্যবেক্ষণ কর। পরিবেশের এ সকল উপাদান দূষিত হওয়ার উৎসসমূহ খুঁজে বের কর। দূষণের কারণ এবং উৎসসমূহ পোস্টার কাগজে লিখে শ্রেণিতে প্রদর্শন কর। প্রত্যেক দলের কাজ ঘুরে ঘুরে দেখ এবং শ্রেণি আলোচনায় অংশগ্রহণ কর।

পৃথিবীতে জনসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে বাড়তি মানুষের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে অতিরিক্ত খাদ্য, বাসস্থান, যানবাহন ইত্যাদি। চাষের জমি বাড়াতে ও বাসস্থান তৈরি করতে মানুষ বনজঙ্গল কেটে ফেলছে। ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। তাছাড়া এরোসোল ও রেফ্রিজারেটর থেকে নির্গত CFC (ক্লোরোফ্লোরো কার্বন) ওজোন স্তরকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। বাড়তি মানুষের জন্য খাদ্য ও বাসস্থান ছাড়াও প্রয়োজন নানা রকম পণ্যসমাগ্রী। ফলে তারা গড়ে তুলছে বিভিন্ন শিল্পকারখানা। এসব শিল্পকারখানার রাসায়নিক বর্জ্য দূষিত করছে পরিবেশ। এভাবেই পৃথিবীর পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। পরবর্তী পাঠগুলোতে তোমরা পরিবেশের প্রধান তিনটি উপাদান মাটি, পানি ও বায়ুদূষণ সম্পর্কে জানবে।

পাঠ–৩, ৪ : মাটি দূষণ

আমাদের জীবন ধারণের জন্য মাটি অত্যাবশ্যক। মাটিতে বিভিন্ন ফসল ফলে, যা আমরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি। শুধু খাদ্যই নয়, জীবন ধারণের সবকিছুই যেমন– বাসস্থান, বস্ত্র, ঔষধ ইত্যাদির জন্য আমরা যে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল তাও মাটিতে জন্মায়। এ মাটিকেও আমরা বিভিন্নভাবে দূষিত করছি, যার ফলে মাটির উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে।

কাজ : মাটি দূষণ ও মাটি দূষণের উৎস সম্পর্কে জানা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : নোট খাতা, পোস্টার কাগজ ও মার্কার।

পদ্ধতি: তোমার এলাকার বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন কর। এসব স্থানে কীভাবে মাটি দূষিত হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ কর। মাটি দূষণের উৎসগুলো কী কী তা পর্যবেক্ষণ করে খাতায় লিখ। তোমার এলাকার মাটি দূষণ রোধে সবাইকে সচেতন করতে হলে কী কী করা দরকার তা পোস্টার কাগজে লিখে শ্রেণিতে প্রদর্শন কর এবং আলোচনায় অংশ নাও।

মাটি দূষণের কারণ ও উৎস

মাটিতে আমরা যে সকল আবর্জনা ও বর্জ্য পদার্থ ফেলি, এগুলোকে পচতে ব্যাকটেরিয়া সাহায্য করে। যার ফলে এগুলো মাটির সঙ্গে সহজে মিশে যায়। এছাড়াও আজকাল আমরা এমন সব দ্রব্যাদি ব্যবহার করছি যেগুলো মাটিতে পচে না। যেমন কাঁচ, পলিথিন, প্লাস্টিক ইত্যাদি। যা উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এসব জিনিষ ছাড়াও মাটিকে আমরা বিভিন্নভাবে দূষিত করছি। এসবের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন আবর্জনাসহ কৃষিকাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার, কীটনাশকের ব্যবহার, শিল্পকারখানার বর্জ্য ইত্যাদি।

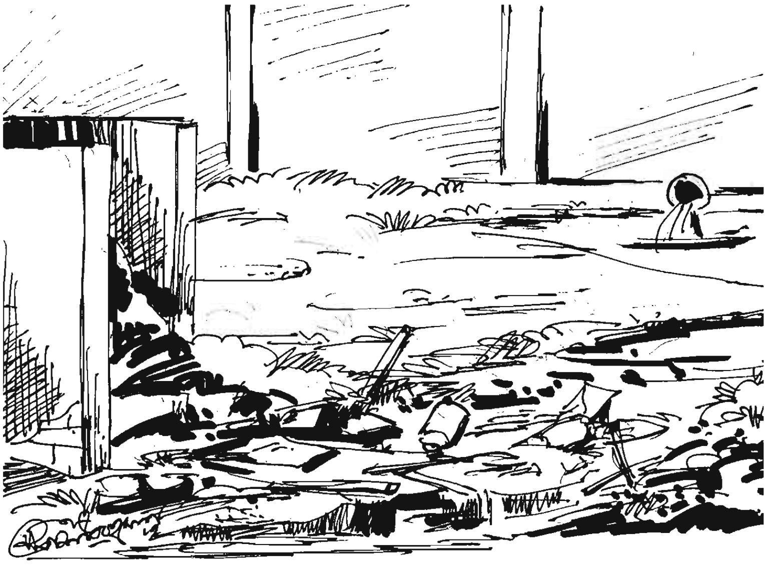

চিত্র- ১৩.২ : মাটি দূষণ

পাঠ – ৫, ৬ : পানি দূষণ

বর্তমানে পৃথিবীতে সুপেয় পানির অভাব দেখা দিয়েছে। পানি ছাড়া জীবন চলে না। পানি দূষণ আমাদের জন্য একটি বড় চিন্তার বিষয়। পানি নানাভাবে দূষিত হচ্ছে। মানুষই পানি দূষণের জন্য দায়ী। এ সমস্যা শুধু আমাদের দেশে নয়, সারা বিশ্বেই এটা এখন অত্যন্ত প্রকট।

কাজ : পানি দূষণ এবং পানি দূষণের কারণ এবং উৎস সম্পর্কে জানা।

পদ্ধতি : তোমার এলাকায় বা এলাকার নিকটে বা গ্রামের বাড়িতে যদি কোনো জলাশয়, পুকুর বা নদী থাকে তা পরিদর্শন কর। লক্ষ্য করে দেখ এখানকার পানি কীভাবে দূষিত হচ্ছে। যদি তোমার এলাকা বা গ্রামের বাড়িতে এ ধরনের জলাশয় বা পুকুর অথবা নদী কিছুই না থাকে, তবে সহপাঠিদের সাথে আলোচনা করে জেনে নাও কীভাবে তাদের এলাকার পানি দূষিত হয়, নোট খাতায় লিখে রাখ। পানি দূষণের উৎস ও কারণ জেনে শ্রেণীতে আলোচনায় অংশ নাও।

পানি দূষণের কারণ এবং উৎস

বিভিন্নভাবে পানি দূষিত হতে পারে। এ কারণগুলোর মধ্যে মানুষের কর্মকাণ্ডই পানি দূষণের অন্যতম কারণ। নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে পয়ঃনিষ্কাশন ও শিল্প বর্জ্য অনেক বেড়ে গিয়েছে। ফলে পানি দূষিত হচ্ছে। এছাড়াও কৃষিজ উৎপাদন বাড়ানোর জন্য জমিতে ও জলাশয়ে বিভিন্ন কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হচ্ছে। এগুলোও বিভিন্ন ভাবে জলাশয় থেকে নদী এবং নদী থেকে সাগরে পড়ছে। এছাড়া এগুলো মাটির নিচের পানির সঙ্গে মিশেও পানিকে দূষিত করছে। তোমরা লক্ষ করে থাকবে অনেকে পুকুরের পানিতে বাঁশ, বেত, পাট ইত্যাদি ভিজিয়ে রাখে। গরু, মহিষ, ছাগল গোসল করায়। অনেকে বিভিন্ন জলাশয়ের উপর কাঁচা পায়খানা তৈরি করে, যা পানিকে দূষিত করে।

এছাড়াও বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণেও পানি দূষিত হয়ে থাকে। যেমন– তোমরা বন্যার কথা শুনেছ। বন্যার ফলে মানুষ ও গৃহপালিত পশু পাখির মলমূত্র পানিতে মিশে এবং পানি দূষিত হয়। খাদ্যর উচ্ছিষ্ট, ময়লা আবর্জনা, জীব–জন্তুর মৃতদেহ, গৃহস্থালীর ব্যবহার্য নানাধরণের পচনশীল বস্তু যেখানে সেখানে ফেলা হয়। এগুলো পচে বিভিন্ন জীবাণুর সৃষ্টি হয়। এসব বর্জ্য বৃষ্টির পানির সাথে মিশে পুকুর, নদী ও জলাশয়ের পানিতে গিয়ে মিশে।

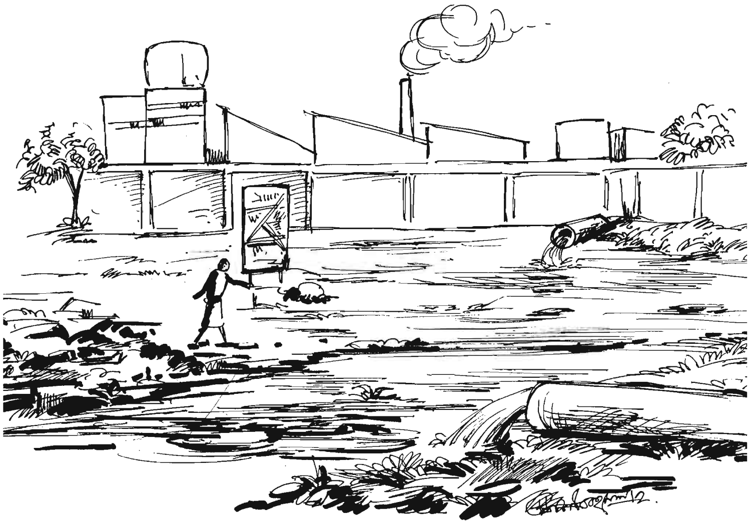

চিত্র-১৩.৩ : পানি দূষন

পাঠ –৭, ৮ : বায়ু দূষণ

আমাদের পৃথিবীর চারপাশে রয়েছে বায়ুমণ্ডল। এই বায়ুর মধ্যেই মানুষসহ অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদ বেঁচে আছে। মানুষের সৃষ্ট বিভিন্ন কারণে বায়ুর কোনো কোনো উপাদানের পরিমান বেড়ে বা কমে যাচ্ছে, যা পরিবেশ ও আমাদের জন্য ক্ষতিকর। বায়ুর এ ধরনের পরিবর্তন বায়ু দুষণ নামে পরিচিত। আজ পৃথিবীর চারপাশের বায়ুমণ্ডল বিভিন্নভাবে দূষিত হচ্ছে।

কাজ: বায়ু দূষণ এবং এর উৎস সম্পর্কে জানা।

পদ্ধতি: তোমার এলাকার বায়ুদূষণের উৎস ও কারণগুলো পর্যবেক্ষণ কর। এগুলোর মধ্যে মানুষ সৃষ্ট ও প্রাকৃতিক কারণ গুলো পৃথকভাবে পোস্টার কাগজে লিখ। এটি শ্রেণিতে প্রদর্শন কর এবং আলোচনা কর।

বায়ু দূষণের কারণ এবং উৎস

মানুষের দ্বারা এবং প্রাকৃতিকভাবে বায়ু দূষিত হতে পারে। পরিবেশবিজ্ঞানীরা বায়ু দূষণের জন্য কতগুলো কারণ চিহ্নিত করেছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে যানবাহন ও শিল্পকারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া। এছাড়াও আমাদের দেশে ইটের ভাটায় যখন ইট তৈরি করা হয়, তখন সেখান থেকে কালো ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়, যা বায়ু দূষণ ঘটায়। বায়ু দূষণের আরও কারণের মধ্যে রয়েছে ত্রুটিপূর্ণ মোটরগাড়ী, রেলগাড়ী, বাস, টেম্পো ইত্যাদির ইঞ্জিন থেকে বেরিয়ে আসা ধোঁয়া। এসকল ধোঁয়ার সাথে নির্গত হয় কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন কণা এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড। এগুলো পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। বায়ু দূষণের জন্য শুধু যে যানবাহন ও শিল্পকারখানাই দায়ী তা কিন্তু নয়। সিগারেটের ধোঁয়া, এসবেষ্টস, নিমার্ণ কাজের ধুলিকণা, বিভিন্ন ধরনের আবর্জনা ইত্যাদিও বায়ু দূষণ ঘটায়। বায়ু দূষণের আরও একটি অন্যতম কারণ হলো

নির্বিচারে বন-জঙ্গল কেটে ফেলা। এর ফলে বায়ুতে উদ্ভিদ কর্তৃক গৃহীত কার্বন ডাইঅক্সাইড এর পরিমান বেড়ে যায়।

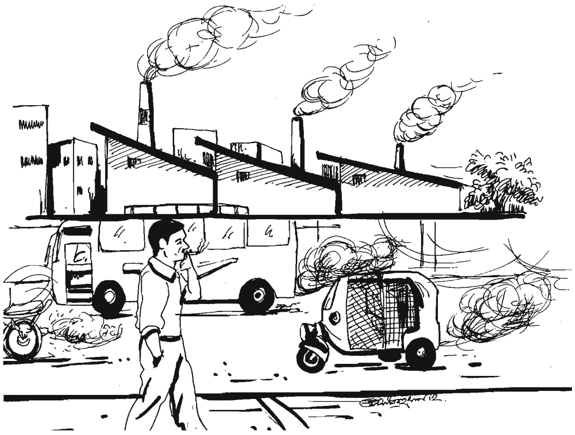

চিত্র- ১৩.৪: বায়ু দূষণ

পাঠ – ৯ : দূষণের প্রভাব

তোমরা মাটি, পানি ও বায়ু দূষণ কীভাবে ঘটে তা জেনেছ। তোমরা কী জান এসব দূষণের ফলে পরিবেশের উপর কোন ধরনের প্রভাব পড়ে?

কাজ : বিভিন্ন দূষণের প্রভাব সম্পর্কে জানা।

পদ্ধতি : শিক্ষকের সহায়তায় দল গঠন কর। দলগুলো তোমাদের বিদ্যালয় এবং এলাকার আশেপাশের পরিবেশ পরিদর্শন করবে। দেখ এলাকার পরিবেশে কোন কোন ধরনের দূষণ ঘটছে। এসব দূষণের ফলে মানুষসহ অন্যান্য জীবের উপর কোন ধরনের প্রভাব পড়ছে তা দলে আলোচনা করে নোট খাতায় লিখ। শ্রেণিতে দল থেকে সংগৃহীত তথ্য উপস্থাপন কর এবং শ্রেণিতে আলোচনায় অংশগ্রহণ কর।

মাটি দূষণের প্রভাব

তোমরা জেনেছ, মাটি দূষণের অন্যতম কারণ হচ্ছে মাটিতে বর্জ্যের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। মাটি দূষণের জন্য দায়ী বিভিন্ন কঠিন ও রাসায়নিক বর্জ্য। এসব বর্জ্য যেখানে–সেখানে ফেলার কারণে পরিবেশ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। মাটিতে ফেলে দেওয়া কাচ, এলুমিনিয়াম, পলিথিন ইত্যাদি মাটিতে সহজে মেশে না। ফলে মাটি তার উর্বরতা হারায়। তোমরা জেনে অবাক হবে অ্যালুমিনিয়াম মাটির সাথে মিশতে সময় লাগে একশ বছর। কাচের লাগে দুশ বছর এবং পলিথিনের লাগে প্রায় সাড়ে চারশ' বছর। তাই এগুলো আমাদের নর্দমা, জলাশয়কে ভরাট করে এবং জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে এগুলো পুকুর, নদী, সাগর এসব স্থানেও স্থানান্তরিত হয়। এর ফলে সকল এসব পরিবেশে জীবের বেঁচে থাকার জন্য এগুলো হুমকির কারণ হয়। কৃষি জমিতে যে কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয় তা যেমন মাটির সকল জীবের জন্য ক্ষতিকর তেমনি এসব রাসায়নিক দ্রব্য উদ্ভিদের মাধ্যমে খাদ্যের সাথে মিশে ক্যান্সারের মতো ভয়াবহ রোগের সৃষ্টি করছে।

পানি দূষণের প্রভাব

আমরা বিভিন্নভাবে পানি দূষিত করছি তা তোমরা জেনেছো। এ দূষিত পানি পান করলে আমাশয়, ডায়রিয়া, কলেরা, জন্ডিস, টাইফয়েড ইত্যাদি রোগ হয়। পানি দূষিত হলে সে পানিতে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীও বাঁচতে পারে না। ফলে পানির পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়।

বায়ু দূষণের প্রভাব

তোমরা জেনেছ, বিভিন্নভাবে বায়ু দূষিত হয়। বায়ু দূষিত হলে সে বায়ুতে বিভিন্ন গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। যা মানুষের জন্য ক্ষতিকর। বায়ুতে কার্বন মনোক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গেলে মানুষের শ্বাসকষ্টজনিত রোগ থেকে শুরু করে ক্যান্সার এর মতো মারাত্মক রোগ হতে পারে। এছাড়াও শিল্পকারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া বায়ুতে মিশে গিয়ে এসিড বৃষ্টির সৃষ্টি হতে পারে। এই এসিড বৃষ্টি শুধু মানুষের ক্ষতিই করে না, জলজ প্রাণীরাও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এর ফলে বনভূমিও ধ্বংস হয়।

এসব ছাড়াও বায়ু দূষণের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা আগের থেকে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি যদি অব্যাহত থাকে, তবে সমুদ্রপৃষ্ঠের গড় উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে পৃথিবীর সমুদ্র উপকূলবর্তী নিচু স্থলভূমি পানিতে ডুবে যাবে। আবার কোনো কোনো অঞ্চল খরার কবলে পড়বে। ফলে স্থানীয় জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটবে। এতে শুধু মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হবে না, অসংখ্য উদ্ভিদ ও প্রাণী পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যাবে। পরিনতিতে সার্বিক ভাবে পৃথিবী ঝঁকির মুখে পড়বে।

পাঠ – ১০ : দূষণ প্রতিরোধ ও পরিবেশ সংরক্ষণ

বিভিন্নভাবে পরিবেশের মাটি, পানি ও বায়ু দুষন এর কারণ আমরা জানলাম। মাটি, পানি ও বায়ু আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য। কিন্তু মানুষের কারণেই বর্তমানে এ পরিবেশ ধীরে ধীরে বাসের অযোগ্য হয়ে পড়ছে। পরিবেশকে সুস্থ ও স্বাভাবিক না রাখতে পারলে পৃথিবীর সকল জীবের অস্তিতত্বই হুমকীর সম্মুখীন হবে। পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখার একমাত্র উপায় হলো পরিবেশ সম্পর্কে সকলের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি এবং দূষণ প্রতিরোধ ।

কাজ : দূষণ প্রতিরোধ ও পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতনতা সৃষ্টির উপায় সম্পর্কে জানা।
পদ্ধতি : শিক্ষকের সহায়তায় দল গঠন কর। পরিবেশ দূষণ থেকে নিজে ও সকলকে বিরত রাখতে কী কী করা যায়, তা দলে আলোচনা করে নোট খাতায় লিখ। পরিবেশ দূষণ রোধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে শ্লোগান তৈরি কর। স্কুলে প্রদর্শনের ব্যবস্থা কর।

মাটি, পানি, বায়ু ছাড়া পরিবেশে জীবের অস্তিত্বের কথা ভাবাই যায় না। আমাদের সকলের উচিত পরিবেশের এ উপাদানগুলোকে দূষণমুক্ত ও যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা। বর্তমানে জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণে পরিবেশের এসকল উপাদানের ব্যবহার অনেক বেশি হচ্ছে। ফলে প্রতিনিয়ত বিভিন্নভাবে

পরিবেশের দূষণ ঘটছে। পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে ও সংরক্ষণ করতে হলে আমাদের সবাইকে নিচের বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

- সুস্থ পরিবেশের জন্য মাটি, পানি ও বায়ু দূষণ যাতে না ঘটে, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।
- বাড়িঘর, স্কুল ও রাস্তার পাশে গাছপালা লাগাতে হবে।
- খোলা জায়গায় যেখানে–সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করা বন্ধ করতে হবে।
- শিল্পকারখানা থেকে ধোঁয়া বের হয়ে যেন দূষণ না ঘটে, সেজন্য ধোঁয়া বায়ুতে ছড়িয়ে পড়ার আগেই আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে একে দূষণমুক্ত করতে হবে।
- প্লাস্টিক, পলিথিন ইত্যাদির ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। এসবের পরিবর্তে পাটজাত দ্রব্যের ব্যবহার করা যেতে পারে।
- কীটনাশক, রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমাতে হবে। এগুলোর পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহার করতে হবে এবং প্রাকৃতিক উপায়ে পোকা মাকড় দমন করতে হবে।
- ঘর–বাড়ির ময়লা–আবর্জনা ও খাদ্যদ্রব্যের উচ্ছিষ্ট যেখানে–সেখানে না ফেলে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে মাটির গর্তে ফেলে মাটিচাপা দিতে হবে।
- জনগণকে দূষণের ক্ষতিকারক দিক এবং পরিবেশ সংরক্ষণের উপায় সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।
- বন সংরক্ষণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, এগুলো বিভিন্ন জীবের আবাসস্থল। এছাড়া গাছপালা আমাদের পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে সাহায্য করে।

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে যখন কোনো পরিবর্তন ঘটে তখন পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। ফলে মানুষসহ অন্যান্য জীবের জন্য প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়, যাকে আমরা বলি পরিবেশ দূষণ।
- প্রাকৃতিক এবং মানুষের বিভিন্ন কর্মকান্ড উভয় কারণেই পরিবেশ দূষণ ঘটে। তবে বিভিন্ন দূষণের জন্য মানুষই প্রধানত দায়ী।
- পরিবেশের মাটি, পানি ও বায়ু দূষণের ফলে শুধু মানুষই বিপন্ন হবে না, অসংখ্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।
- দূষণ রোধ এবং পরিবেশ সংরক্ষণের উপায় সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হলো পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার অন্যতম উপায়।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. চাষের জমি বাড়াতে ও বাসস্থান তৈরি করতে মানুষ —————— কেটে ফেলছে।

২. শিল্পকারখানার —————— পানি দূষণের জন্য দায়ী।

৩. বিভিন্ন আবর্জনাকে পচতে সাহায্য করে —————— ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. দূষণ কীভাবে ঘটে তার একটি উদাহরণ দাও।

২. দূষণ রোধ সম্পর্কে তোমার এলাকার সবাইকে সচেতন করতে হলে তুমি কী কী করতে পার?

৩. তোমার বাড়ির পরিবেশ সংরক্ষণে তোমার করণীয় কী?

৪. তোমার বিদ্যালয়ে পরিবেম সংরক্ষণে তুমি কীভাবে ভূমিকা রাখতে পার?

৫. পানি দুষণের দুটো প্রভাব উল্লেখ কর।

৬. বায়ু দূষণ কেন মানুষের জন্য ক্ষতিকর?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি থেকে শহরের বাসাবাড়িতে পানি সরবরাহ করা হয়?

ক. নলকূপ খ. পুকুর

গ. নদী ঘ. বিল

২. মাটি দূষণের কারণ হলো–

i. পলিথিন ও কীটনাশক
ii. আবর্জনা ও মৃতজীবদেহ
iii. রাসায়নিক সার ও কাঁচ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

দৃশ্যটি লক্ষ্য কর এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

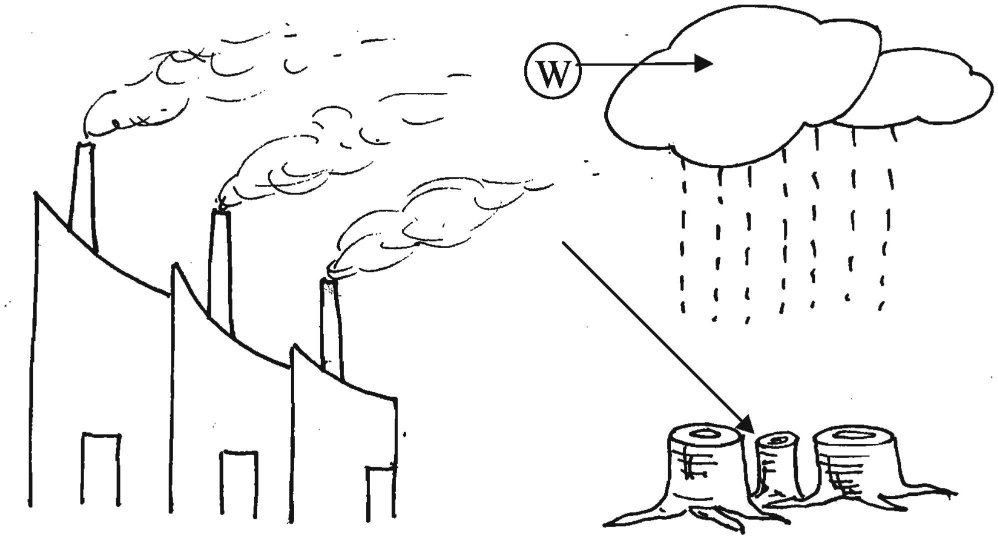

চিত্র : কারখানার ধোঁয়া ও বৃক্ষ নিধন

৩. দৃশ্যকল্পের W চিহ্নিত অংশে অনুপস্থিত কোনটি?

ক. কার্বন ডাইঅক্সাইড খ. অক্সিজেন

গ. ক্লোরোফ্লোরো কার্বন ঘ. কার্বন মনোঅক্সাইড

৪. চিত্রে প্রদর্শিত ঘটনাটি পৃথিবীতে সংঘটিত হলে–

i. ওজোন স্তর নষ্ট হবে

ii. অম্লবৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে

iii. গ্রিনহাউজ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

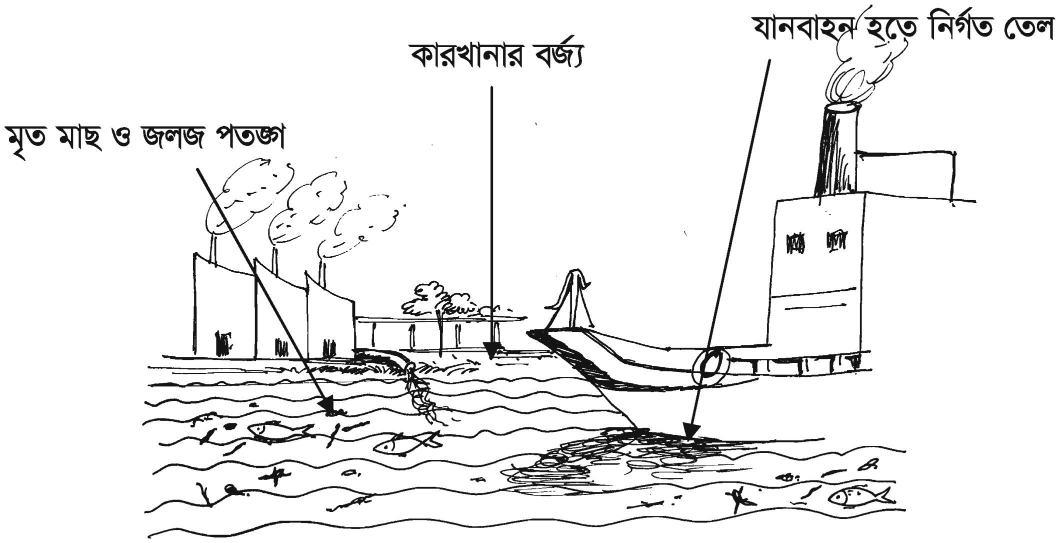
যানবাহন হতে নির্গত তেল
কারখানার বর্জ্য
মৃত মাছ ও জলজ পতঙ্গ

চিত্র : নদী

ক. এসিড বৃষ্টি কী?

খ. প্লাস্টিক মাটির জন্য ক্ষতিকর কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের প্রাণীগুলো কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে কারণসহ ব্যাখ্য কর।

ঘ. কী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে উদ্দীপকের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পাবে?

২.

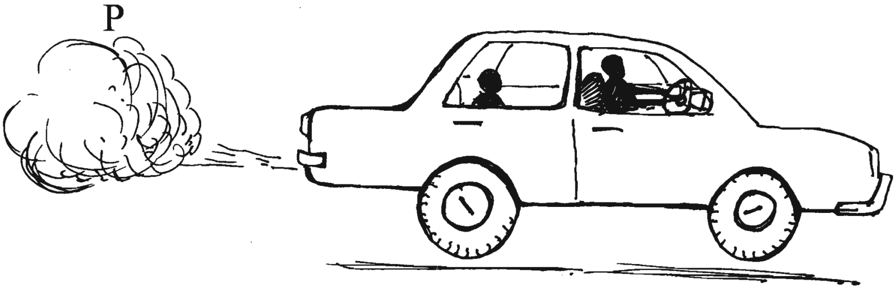

চিত্র : গাড়ি

ক. দূষণ কী?

খ. পানি দূষণ কেন ক্ষতিকর?

গ. পরিবেশের উপর ‘P’ কী ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করবে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে আমাদের করণীয় কী তা যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।

চর্তুদশ অধ্যায়

জলবায়ু পরিবর্তন

পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে বায়ুমণ্ডল। কোনো স্থানের বায়ুমণ্ডলের স্বল্প সময়ের তাপমাত্রা, চাপ, বায়ুপ্রবাহ, আর্দ্রতা ইত্যাদি অবস্থাগুলো হলো আবহাওয়া। আর কোনো স্থানের অনেক বছরের সামগ্রিক আবহাওয়া হলো জলবায়ু। আবহাওয়া ও জলবায়ু আমাদের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। স্বাভাবিক আবহাওয়া ও জলবায়ুতে আমরা স্বাভাবিক জীবনযাপন করি। কিন্তু বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

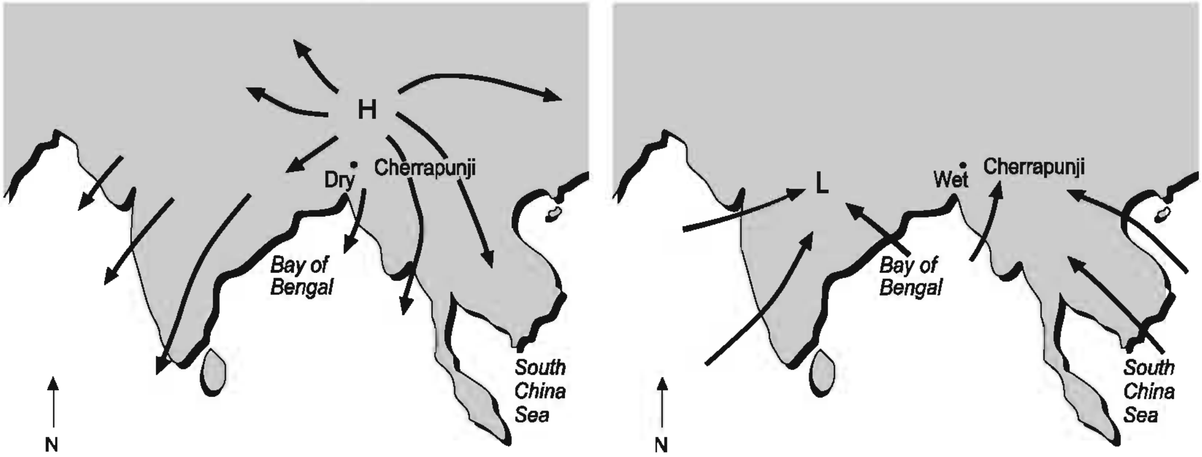
H
Dry
Cherrapunji
Bay of Bengal
South China Sea
N
L
Wet
Cherrapunji
Bay of Bengal
South China Sea
N

(a) Winter Monsoon

(b) Summer Monsoon

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর বর্ণনা করতে পারব।
- পরিবেশে পানি চক্র, অক্সিজেন চক্র ও কার্বন চক্রের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আবহাওয়া ও জলবায়ু ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ ১ ও ২ : পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল

তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে জেনেছ, সৃষ্টির প্রথমদিকে পৃথিবী খুব গরম ছিল। তারপর ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়েছে। এ সময় হালকা পদার্থ অর্থাৎ বায়বীয় পদার্থ সবচেয়ে বাইরের দিকের অংশ তৈরী করে।

যে বায়বীয় অংশটি পৃথিবীর পৃষ্ঠকে ঘিরে রেখেছে সেটিই বায়ুমণ্ডল। তোমরা জান যে, বায়ুমণ্ডল মূলত নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন দিয়ে তৈরি। এছাড়াও জলীয়বাষ্প, ধূলিকণা, আর্গন, কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং আরও কিছু গ্যাস বায়ুমণ্ডলে রয়েছে। পৃথিবী সকল কিছুকে তার নিজের দিকে টানে। সেই টানের ফলে বায়ুমণ্ডলের গ্যাসগুলো পৃথিবীর পৃষ্ঠের কাছাকাছি থাকে। তাই ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি বায়ুমণ্ডল ঘন হয়ে থাকে। ভূপৃষ্ঠ থেকে তোমরা যত উপরের দিকে যাবে, বায়ুমণ্ডলকে তত হালকা বা পাতলা পাবে। তাই তোমরা যদি পর্বতের চূড়ায় উঠতে চাও, তবে শ্বাস নেওয়ার জন্য অক্সিজেন সাথে নিয়ে যেতে হবে। বায়ুমণ্ডল ভূপৃষ্ঠ থেকে কয়েকশ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। বায়ুমণ্ডলকে অনেকগুলো স্তরে ভাগ করা হয়। প্রথম চারটি স্তর হলো ট্রপোস্ফিয়ার বা ট্রপোমণ্ডল, স্ট্রাটোমণ্ডল, মেসোমণ্ডল ও তাপমণ্ডল।

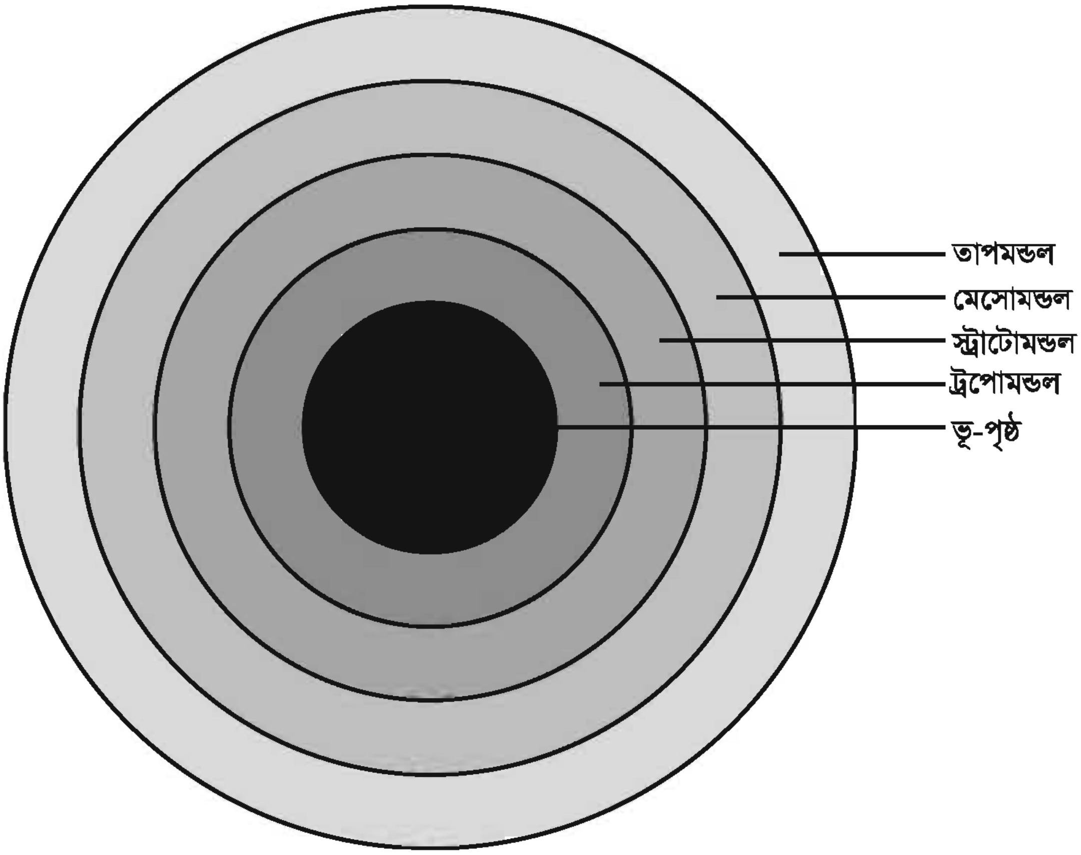

চিত্র-১৪.১: বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর

ট্রপোমণ্ডল: ভূপৃষ্ঠ থেকে এগার কিলোমিটার পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলকে বলা হয় ট্রপোমণ্ডল। এই স্তরে বায়ুর বেশির ভাগ প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ যেমন অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলীয় বাষ্প থাকে। এই স্তরে মানুষ ও অন্যান্য জীবের জীবনকে প্রভাবিত করে এমন সব ঘটনা ঘটে। যেমন এই স্তরে মেঘ, বৃষ্টি, বায়ু প্রবাহ, ঝড়, কুয়াশা এসব হয়। তাই ট্রপোমণ্ডল বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর।

স্ট্রাটোমণ্ডল: ট্রপোমণ্ডলের ঠিক উপরেই শুরু হয়েছে স্ট্রাটোমণ্ডল। এই স্তর ট্রপোমণ্ডল থেকে শুরু করে প্রায় ৩৯ কিলোমিটার বিস্তৃত। এই স্তরে রয়েছে ওজোন নামের একটি গ্যাস। এই গ্যাস সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মি থেকে আমাদের রক্ষা করে। এই স্তর এবং এর উপরের দিকে বায়ুমণ্ডলের অন্যান্য গ্যাস খুব কম পরিমাণে আছে।

মেসোমণ্ডল: স্ট্রাটোমণ্ডল শেষ হয়ে এই স্তর শুরু। এই স্তরের উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে বায়ুর তাপমাত্রা কমতে থাকে।

তাপমণ্ডল: এই স্তর প্রায় বায়ুশুন্য। এই স্তরে বায়ুর তাপমাত্রা দ্রুত বাড়ে, তাই এর নাম তাপমণ্ডল। এই স্তরে বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে।

পাঠ ৩: পরিবেশে পানি চক্র

একাদশ অধ্যায়ে তোমরা পানি চক্রের সমন্ধে জেনেছ। পানি চক্র পরিবেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধরো সমুদ্রসহ ভূপৃষ্ঠের পানি যদি বাষ্প না হয়ে ভূপৃষ্ঠেই থেকে যেত, তাহলে কী হতো? নিশ্চয়ই বৃষ্টি হতো না! নদীতে পানি থাকতো না। আমরা কী তাহলে ফসল ফলাতে পারতাম? বৃষ্টির পানিও পেতাম না, নদীর পানি থেকে সেচ দিতে পারতাম না। বৃষ্টি না হলে ভূগর্ভেও পানি থাকতো না। আবার পর্বতের চূড়ায় বা মেরু অঞ্চলে বরফ জমা না থেকে গলে গেলে কী হতো। সমুদ্রে পানির পরিমাণ বেড়ে যেত। তাতে সমুদ্রের কাছাকাছি নিচু এলাকা যেমন বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল সমুদ্রের পানিতে ডুবে যেত।

পানি চক্রের মাধ্যমে পরিবেশে পানির চাহিদা ও জোগানের মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় থাকে। তোমরা লক্ষ করেছ যে, পানি চক্রের উপর সূর্যতাপের একটি বড় প্রভাব রয়েছে। কখনো পানি চক্রে ব্যাঘাত ঘটলে মানুষ ও অন্যান্য জীবের সমস্যা হয়ে থাকে। যেমন অতি বৃষ্টি হলে বৃষ্টির পানি দ্রুত সরে যেতে না পারলে বন্যা হয়। আমাদের দেশে বন্যা প্রায় প্রতিবছরই দেখা যায়। আবার পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে গেলে পানি চক্রে ব্যাঘাত ঘটে। এসম্পর্কে আমরা এ অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে জানব।

পাঠ ৪: পরিবেশে কার্বন ও অক্সিজেনের ভারসাম্য

তোমরা জানো যে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের পরিমাণে একটা ভারসাম্য বজায় থাকে। পরিবেশে বিশেষ করে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভারসাম্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ দুটি গ্যাসই জীবনের জন্য অতি আবশ্যক। বায়ুমণ্ডলে এ দু'টি গ্যাসের ভারসাম্য বোঝার জন্য কার্বন চক্র বোঝা দরকার।

সকল জীবদেহ গঠনে কার্বন দরকার হয়। এ কার্বন আসে বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে। পানি ও বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন ও গ্লুকোজ তৈরি করে। এই গ্লুকোজ উদ্ভিদদেহ তৈরি করে। প্রাণী উদ্ভিদ থেকে খাদ্য গ্রহণ করার মাধ্যমে কার্বন গ্রহণ করে।

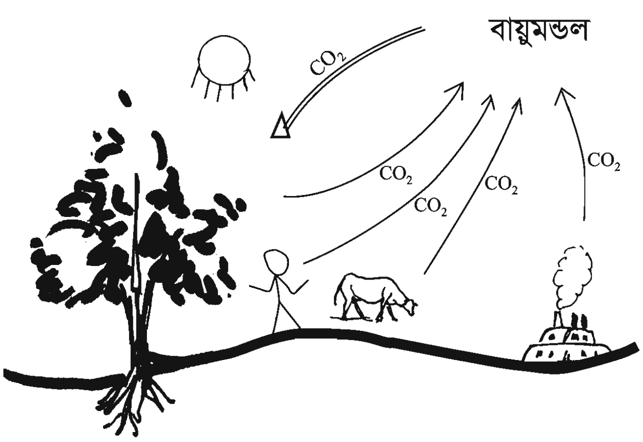

চিত্র-১৪.২ : কার্বন ও অক্সিজেনের ভারসাম্য

উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহের কার্বন তিন ভাবে বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে। প্রথমত, উদ্ভিদ ও প্রাণি শ্বসন প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ ভেঙে শক্তি উৎপাদন করার সময় বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেয়। দ্বিতীয়ত, উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহকে পোড়ালে তাতে কার্বনডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়ে বায়ুমণ্ডলে মেশে। তৃতীয়ত, উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহ মাটিতে পচবার সময় ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুতে ছেড়ে দেয়।

তাহলে দেখা গেল, বায়ুমণ্ডল থেকে উদ্ভিদ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে গ্লুকোজ তৈরির মাধ্যমে উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে কার্বন সঞ্চয় করে। উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহের কার্বন তিন ভাবে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড হিসেবে ফিরে আসে। এভাবে পরিবেশে কার্বনের অর্থাৎ কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভারসাম্য বজায় থাকে। পরিবেশে এ ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার ফলে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে। এ সম্পর্কে এ অধ্যায়েই আমরা জানব।

পাঠ ৫: আবহাওয়া ও জলবায়ু

আগামীকাল দুপুরের পর ঢাকার আশেপাশের এলাকায় উত্তর–পশ্চিম দিক থেকে দমকা হাওয়া বয়ে যেতে পারে। দিনের বেশির ভাগ সময় আকাশ থাকবে মেঘমুক্ত, তবে বিকেলের দিকে উত্তর–পূর্ব কোণে কালো মেঘ জমতে পারে। আজ ঢাকার বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল ৬০ শতাংশ। আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল কুষ্টিয়ায় ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল সিলেটে ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

তোমরা কি রেডিও বা টেলিভিশনে খবরের শেষে এরকম খবর শুনতে পাও? এটি কিসের খবর? আমরা কী জানতে পাই এ ধরনের খবর থেকে? আগামীকাল ঝড় বা বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে কিনা? আমরা কি জানতে পারি কাল কেমন গরম বা শীত থাকবে? হ্যাঁ, সাধারণত খবরের শেষ দিকে থাকে বৃষ্টি বা ঝড় হতে পারে কি না, তাপমাত্রা কেমন থাকবে। কোথায় কতটুকু বৃষ্টি হয়েছে বা দিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কত ছিল। এ সবই আবহাওয়ার খবর। আবহাওয়ার খবর থেকে কি বোঝা যায় আবহাওয়া কী?

আবহাওয়া

আবহাওয়া বলতে স্বল্প সময়ের জন্য কোনো নির্দিষ্ট স্থানের বায়ুমণ্ডলের অবস্থাকে বোঝায়। বায়ুর তাপমাত্রা, চাপ, বায়ু কোন দিক থেকে কত জোরে বয়, বায়ুর আর্দ্রতা বা বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ, মেঘ, কুয়াশা ও বৃষ্টিপাত–এই অবস্থাগুলো মিলে আবহাওয়া।

যেমন কোনো দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস – এ থেকে বোঝা যায় সেদিনের আবহাওয়া বেশ গরম ছিল। আবার কোনো দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস– এ থেকে বোঝা যাবে সেদিন বেশ ঠান্ডা ছিল। আবার আকাশ ছিল মেঘলা অথবা দিনটি কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল–এরকম অবস্থাও স্বল্প সময়ের আবহাওয়া নির্দেশ করে।

জলবায়ু

আমরা বলে থাকি আজ সকালে আবহাওয়া ঠান্ডা ছিল কিন্তু দুপরে আবহাওয়া বেশ গরম। অল্প সময়ে আবহাওয়া বদলে যেতে পারে। পক্ষান্তরে, জলবায়ু সহসা বদলায় না। জলবায়ু হলো কোনো স্থানের অনেক বছরের আবহাওয়ার একটি সামগ্রিক বা গড় ফল। যেমন আমরা বলে থাকি বাংলাদেশের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র–এ থেকে বোঝা যায় বাংলাদেশে বেশ গরম পড়ে এবং বায়ু ভেজা বা আর্দ্র থাকে। আবার রাশিয়ার জলবায়ু শীতপ্রধান; এ কথা বলতে আমরা বুঝি যে রাশিয়ায় সাধারণতঃ খুব শীত পড়ে।

আবহাওয়া ও জলবায়ুর পার্থক্য

আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান মূলত একই। বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা, বায়ুচাপ, বায়ুপ্রবাহ, আর্দ্রতা (জলীয় বাষ্পের আপেক্ষিক পরিমাণ), বৃষ্টিপাত এগুলো আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান। উপাদানসমূহ একই হলে আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য কী? ইতোমধ্যে আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে সম্পর্কের কথা জেনেছ। জলবায়ু মূলত কোনো স্থানের আবহাওয়ার দীর্ঘ দিনের গড় অবস্থা বা ফল। সবই দেখা যাক আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য কী?

১। কোনো স্থানের বায়ুমণ্ডলের স্বল্পকালীন অবস্থাই আবহাওয়া। আর কোনো স্থানের অনেক বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থাই জলবায়ু।

২। কোনো স্থানের আবহাওয়া অল্প সময়ের মধ্যে পরিবর্তিত হতে পারে। কিন্তু কোনো স্থানের জলবায়ু সহসা পরিবর্তন হয় না। পরিবর্তন হলে সেটা হতে অনেক বছর লেগে যায়।

৩। কাছাকাছি অঞ্চলের আবহাওয়া একই সময়ে ভিন্ন হতে পারে। যেমন কোনো নির্দিষ্ট দিনে ফরিদপুরে বৃষ্টি হতে পারে কিন্তু বরিশালে বৃষ্টি নাও হতে পারে। কিন্তু কাছাকাছি অঞ্চলের জলবায়ু সাধারণত একই রকম। যেমন, বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু একই রকম।

পাঠ–৬, ৭ : আবহাওয়ার পরিবর্তন

কোনো একদিন সকালে হয়তো ঘুম থেকে উঠে দেখলে যে বাইরে উজ্জ্বল রোদ, তবে ততটা গরম লাগছে না। বেলা বাড়ার সাথে সাথে গরম বাড়তে লাগল, গায়ে ঘাম হতে শুরু করল। আকাশে ধীরে ধীরে মেঘ জমতে শুরু করলো এবং এক সময় কালো মেঘে সূর্যটি ঢেকে গেল। একটু পরে মুসলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। বৃষ্টি শেষে আকাশ আবার পরিষ্কার হলো এবং গরমটা কমে এলো। একটু চিন্তা কর তো এক দিনেই আবহাওয়া কতটা পরিবর্তন হলো। আবহাওয়া পরিবর্তন অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। কেন এভাবে আবহাওয়া পরিবর্তন হয়?

আবহাওয়া পরির্বতনের মূল ভূমিকা আসলে সূর্যতাপের। আমরা এখন দেখব সূর্যতাপ আবহাওয়ার উপাদানসমূহ পরিবর্তনে কীভাবে ভূমিকা রাখে।

সূর্যতাপের উপর তাপমাত্রার নির্ভরতা : সূর্য থেকে আগত আলোকরশ্মির সাথে তাপও পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়। সূর্যতাপ যখন পৃথিবীপৃষ্ঠে পড়ে তখন পৃথিবীপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়। পৃথিবীপৃষ্ঠের সাথে মিশে থাকা বায়ুমণ্ডলের নিচের স্তরও (ট্রপোস্ফেয়ার) এতে উত্তপ্ত হয়। ফলে দিনের বেলায় সাধারণত আমরা বেশি গরম অনুভব করি। রাতে যখন সূর্য অস্ত যায়, তখনো পৃথিবীপৃষ্ঠ ও বায়ুমণ্ডলের নিচের স্তর গরম থাকে। কারণ দিনের বেলায় পৃথিবীপৃষ্ঠ যে তাপ পায় তা রাতের বেলায় সবটুকু চলে যেতে পারে না। পৃথিবীপৃষ্ঠ যে তাপ বিকিরণ করে তা বায়ুমণ্ডলের জলীয়বাষ্প, কার্বন ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি সেই তাপ শোষণ করে ধরে রাখে। তাই রাতের বেলা আমরা গরম অনুভব করি। গ্রীষ্মকালে সূর্য আমাদের মাথার উপর থেকে খাড়াভাবে ও বেশি সময় ধরে কিরণ দেয়, তাই আমরা বেশি গরম অনুভব করি। পক্ষান্তরে, শীতকালে সূর্য অনেকটা দূর থেকে তির্যকভাবে এবং কম সময় ধরে কিরণ দেয়, তাই আমরা শীত কালে কম গরম অনুভব করি।

তাপমাত্রার উপর বায়ুচাপ ও বায়ুপ্রবাহের নির্ভরতা : বায়ুচাপের পার্থক্যের কারণে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। আমরা যেমন দেখি পানির উচ্চতা যেখানে বেশি সেখান থেকে পানি কম উচ্চতার দিকে যায়। বায়ু উচ্চচাপের এলাকা থেকে নিম্নচাপের এলাকার দিকে প্রবাহিত হয়। তাপমাত্রার পরিবর্তনের ফলে বায়ুচাপের পরিবর্তন হয়।

কোনো জায়গার তাপমাত্রা বেশি হলে সেখানকার বায়ু উত্তপ্ত হয়ে উপরের দিকে উঠে যায়। ফলে ঐ স্থানে বায়ু পাতলা বা ফাঁকা হয়ে যায়। অর্থাৎ বায়ুচাপ কমে যায়। এরকম অবস্থাকে বলে নিম্নচাপ। তখন আশেপাশে যেখানে বায়ুচাপ বেশি, সেখান থেকে বায়ু এসে ফাঁকা স্থান পূরণ করে। এভাবে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। যে স্থানে তাপমাত্রা কম সেখানে বায়ু ঘন থাকে। ফলে বায়ুচাপ বেশি থাকে। বায়ুচাপ বেশি থাকাকে উচ্চচাপ বলা হয়।

আমাদের দেশে আমরা দেখি, শীতকালে বায়ু উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে উল্টোটা দেখি। কেন বায়ু একেক সময় একেক দিক থেকে প্রবাহিত হয়? শীতকালে সূর্য বাংলাদেশের দক্ষিণে খাড়াভাবে কিরণ দেয়। তাই সেখানে বায়ুচাপ কম থাকে। অন্যদিকে বাংলাদেশের উত্তরে বেশ

শীত এবং বায়ুচাপ বেশি। তাই শীতকালে বাংলাদেশের উত্তর দিক থেকে বায়ু দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়। এই বায়ু স্থলভাগ থেকে আসে বলে এতে জলীয়বাষ্প কম থাকে। এজন্য শীতকালে বায়ু শুষ্ক থাকে এবং বৃষ্টি কম হয়।

আবার গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে সূর্য বাংলাদেশের উপর খাড়াভাবে কিরণ দেয়। তাই তখন বাংলাদেশে তখন বেশ গরম এবং বায়ুচাপ কম থাকে। বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে তখন কম গরম, তাই বায়ুচাপ বেশি। তখন বায়ু বঙ্গোপসাগর এলাকা থেকে বাংলাদেশের দিকে প্রবাহিত হয়। দক্ষিণ দিক থেকে এই বায়ু বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয়বাষ্প নিয়ে আসে। এই জলীয়বাষ্প ঠান্ডা হয়ে বৃষ্টি হয়। এজন্য গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে বায়ু আর্দ্র থাকে এবং প্রচুর বৃষ্টি হয়।

পাঠ ৮, ৯, ১০ : জলবায়ুর পরিবর্তন

ইতোমধ্যেই জেনেছ যে, জলবায়ু হলো কোনো স্থানের বহুদিনের আবহাওয়ার গড় বা সামগ্রিক অবস্থা। বাংলাদেশের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। তোমরা জান যে, বাংলাদেশে বেশ গরম পড়ে ও তেমন শীত পড়ে না। শীতকাল বেশ ছোট, সাধারণত পৌষ ও মাঘ এই দুই মাস শীত পড়ে। তারপর শীত কমে গিয়ে ধীরে ধীরে আবহাওয়া উষ্ণ হতে থাকে। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস বেশ গরম পড়ে। এই দুই মাসকে আমরা গ্রীষ্মকাল বলি। বৈশাখ মাসে প্রতিবছরই কালবৈশাখী দেখা যায়। ও আষাঢ়ের শুরু থেকে বৃষ্টি শুরু হয় অর্থাৎ বর্ষাকাল শুরু হয়। শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে বেশ গরম ও বৃষ্টি পড়ে। তারপর আবার আবহাওয়া ঠান্ডা হতে থাকে এবং পৌষ মাসে শীত ফিরে আসে। এটাই বাংলাদেশের জলবায়ুর স্বাভাবিক রূপ। এরকম আবহাওয়া তোমার বাবা–মা যখন ছোট ছিলেন তখনও দেখা যেত। বিশ বা ত্রিশ বছর ধরে বাংলাদেশের সামগ্রিক আবহাওয়া অর্থাৎ জলবায়ু একই রকম।

কোনো স্থানের জলবায়ু সহসা পরিবর্তন হয় না। তবে বিজ্ঞানীরা পরিমাপ করে দেখতে পেয়েছেন যে, পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়ছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা এভাবে বেড়ে যাওয়াকে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন (Global warming) বলে। পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে পর্বতের চূড়ার ও মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাচ্ছে। তাপমাত্রা বেড়ে সমুদ্রের পানি প্রসারিত হচ্ছে। ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে। এভাবে তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে পানির উচ্চতা বাড়তে থাকবে। ফলস্বরূপ, বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলসহ বিশ্বের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে যাবে। এছাড়া তাপমাত্রা বেড়ে গেলে বিরূপ আবহাওয়া যেমন খরা, অতিবৃষ্টি এবং প্রাকৃতিক দূর্যোগ বেশি বেশি ঘটতে দেখা যাবে।

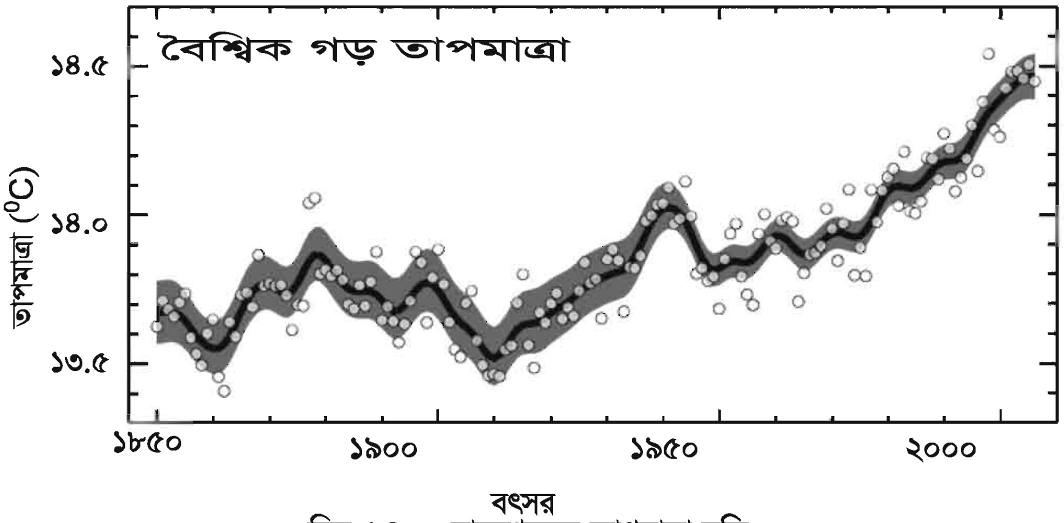

চিত্র-১৪.৩: বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণ

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের মূল কারণ বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি। এ অধ্যায়েই তোমরা জেনেছ যে, কার্বন ও অক্সিজেন চক্রাকারে ফিরে আসে বলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের ভারসাম্য বজায় থাকে। কিন্তু ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে শিল্পোন্নত দেশগুলোতে কলকারখানা ও যানবাহনে কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস পোড়ানো হচ্ছে। এসব জ্বালানি পোড়ানো থেকে উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড কোনোভাবে ব্যয় বা শোষিত হচ্ছে না। বরং মানুষ বাড়ার ফলে এবং অন্যান্য কারণে গাছপালা কমে যাচ্ছে। ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে যাচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে গেলে কেন তাপমাত্রা বাড়ছে?

কাজ : গ্রীন হাউজ প্রভাব

প্রয়োজনীয় উপকরণ: দুটি সমান মাপের পানির গ্লাস, মাপচোঙ, পানি, একটি পরিষ্কার স্বচ্ছ প্লাস্টিকের ব্যাগ ও দুটি থার্মোমিটার।

পদ্ধতি:

১. দুটি গ্লাসে মাপচোঙ দিয়ে মেপে সমান পরিমাণ পানি নাও।

২. প্রতিটি গ্লাসে একটি করে থার্মোমিটার রাখ। থার্মোমিটারে দেখ পানির তাপমাত্রা কত। তোমাদের খাতায় লিখে নাও।

৩. একটি গ্লাস প্লাস্টিকের ব্যাগের ভিতর রেখে ব্যাগের মুখটি আটকে দাও।

৪. দুটি গ্লাস এবার রোদে রেখে দাও। অনুমান কর তো কোনটির পানি বেশি গরম হবে? তোমাদের উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

৫. এক ঘণ্টা পরে থার্মোমিটারে দেখ গ্লাস দুটির তাপমাত্রা কত। কোনটির তাপমাত্রা বেশি বেড়েছে? তোমাদের অনুমানের সাথে মিলেছে কি? না মিললে তার কারণ ব্যাখ্যা কর।

দেখা যাবে, যে গ্লাসটি প্লাস্টিকের ব্যাগের ভিতর ছিল তার তাপমাত্রা বেশি বেড়েছে। কেন তা বলতে পার? সূর্যের তাপ দুটি গ্লাসের পানির উপর সমানভাবে পড়ছে। যে গ্লাসটি প্লাস্টিকের ব্যাগের ভিতরে আছে সেটিতে তাপ প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু প্লাস্টিকের ব্যাগ ভেদ করে ভিতরের তাপ পুরোপুরি বের হতে পারে না। ফলে প্লাস্টিকের ব্যাগের ভিতরে পানি তাড়াতাড়ি গরম হয় অর্থাৎ তাপমাত্রা দ্রুত বাড়ে।

শীতপ্রধান দেশে তীব্র শীতে গাছপালা টিকে থাকতে পারে না। তীব্র শীতে শাক–সবজি ফলানোর জন্য কাচের ঘর তৈরী করা হয়, যাকে গ্রীন হাউজ বলা হয়। শীতকালে অল্পসময় যখন রোদ থাকে, তখন রোদের তাপ কাচ ভেদ করে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে এবং ঘরের বায়ু, গাছ ও মাটিকে উত্তপ্ত করে। ঘরের উত্তাপ স্বাভাবিকভাবে বিকিরিত হয়ে বাইরে চলে যেতে চায়। কিন্তু তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় তা কাচ ভেদ করে বাইরে যেতে পারে না। ফলে কাচের ঘর রাতের বেলায়ও গরম থাকে এবং ভিতরের শাক–সবজি বেঁচে থাকে। কাচের ঘরের ভিতরে এভাবে তাপ থেকে যাওয়ার বিষয়টিকে গ্রীন হাউজ প্রভাব বলে।

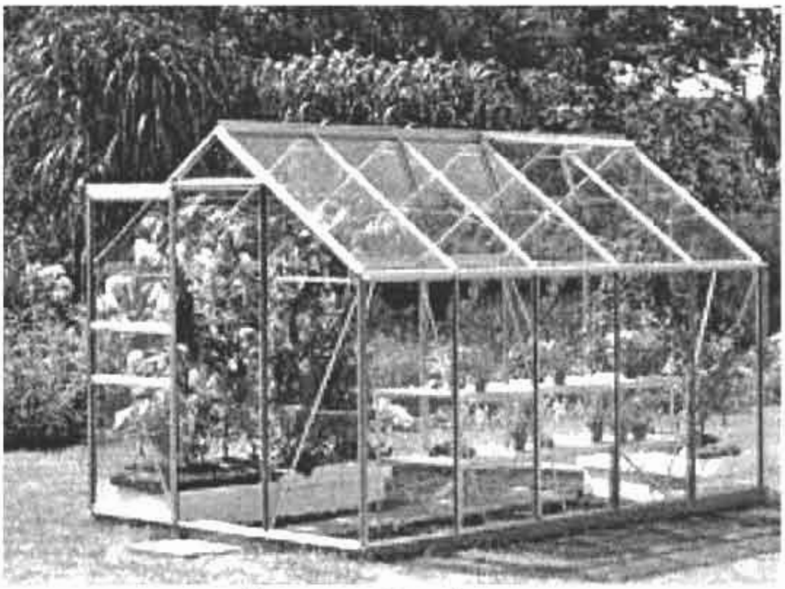

চিত্র-১৪.৪: গ্রিন হাউজ

পৃথিবীটাকে একটি গ্রীনহাউজের মতো ধরা যায়। পৃথিবীর চারদিক ঘিরে আছে বায়ুমণ্ডল। এ বায়ুমণ্ডলে আছে কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন আর জলীয়বাষ্প যেগুলো গ্রীনহাউজের মতো কাজ করে। এরা সূর্যের তাপ পৃথিবীতে আসতে কোনো বাঁধা দেয় না, ফলে সূর্যের তাপে পৃথিবী উত্তপ্ত হয়। কিন্তু এরা উত্তপ্ত পৃথিবী থেকে তাপকে বিকিরিত হয়ে চলে যেতে বাধা দেয়। ফলে পৃথিবী রাতের বেলায়ও গরম থাকতে পারে। এসব গ্যাসকে গ্রীন হাউস গ্যাস বলে। কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন আর জলীয়বাষ্প বায়ুমণ্ডলে

রয়েছে– এটি মানব সভ্যতার জন্য আশীর্বাদ। কারণ এসব গ্যাস না থাকলে পৃথিবী থেকে তাপ বিকিরিত হয়ে মহাশূন্যে চলে যেত আর পৃথিবী ভীষণ ঠান্ডা হয়ে পড়ত। এখন প্রশ্ন হলো আশীর্বাদ আবার কীভাবে সমস্যা হলো? সমস্যা হলো বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই–অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেশি থাকায় এরা বেশি বেশি তাপ ধরে রাখতে পারছে। তাই পৃথিবীর তাপমাত্রা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। এভাবে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য মূল কারণ বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমান বেড়ে যাওয়া।

জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন রোধে কী করণীয়?

জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণ জানলে তোমরা। উপরের আলোচনা থেকে আমরা নিচের প্রবাহ চিত্রটি আঁকতে পারি।

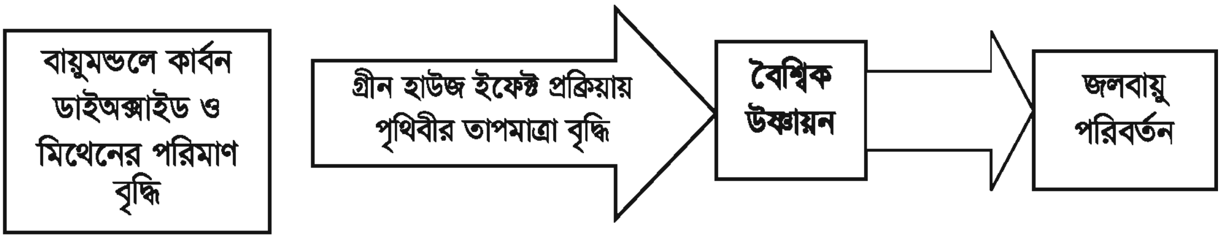
বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও মিথেনের পরিমাণ বৃদ্ধি
গ্রীন হাউজ ইফেক্ট প্রক্রিয়ায় পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি
বৈশ্বিক উষ্ণায়ন
জলবায়ু পরিবর্তন

উপরের প্রবাহ চিত্র থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন আর বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণ বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও মিথেন গ্যাসের পরিমান বৃদ্ধি। তাহলে কীভাবে আমরা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন আর জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করতে পারি? সহজ উত্তর হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড ও মিথেন গ্যাসের নিঃসরণ কমিয়ে। অথবা কোনভাবে এদেরকে বায়ুমণ্ডল থেকে সরিয়ে নেওয়া। মিথেন গ্যাসকে বায়ুমণ্ডল থেকে সরানো যায় না। এর উৎপাদন বা নিঃসরণও বন্ধ করা কঠিন। কারণ এটি উৎপাদিত হয় কৃষিকাজ থেকে। বর্তমানে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন মোকাবেলায় প্রধান সুপারিশ হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণ কমানো। কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস পোড়ানো কমিয়ে তার বদলে নবায়নযোগ্য জ্বালানি (যেমন– সৌরশক্তি, বায়ুপ্রবাহ থেকে বিদ্যুৎ ইত্যাদি) ব্যবহার করলে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস নিঃসরণ কমে। বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইড কমানোর জন্য আরেকটি উপায়ের কথা বলা হয়। তা হলো বেশি করে গাছ লাগানো। কারণ গাছ কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে খাদ্য তৈরি করে। ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড কমে আসে।

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- বায়ুমন্ডল ভূ–পৃষ্ঠ থেকে কয়েকশ কিলোমিটার পযন্তবিস্তৃত। বায়ুমণ্ডলকে অনেকগুলো স্তরে ভাগ করা হয়। প্রথম চারটি স্তর হলো ট্রপোস্ফিয়ার বা ট্রপোমণ্ডল, স্ট্রাটোমণ্ডল, মেসোমণ্ডল ও তাপমণ্ডল।

- ভূপৃষ্ঠ থেকে এগার কিলোমিটার পর্যন্তবায়ুমণ্ডলকে বলা হয় ট্রপোস্ফিয়ার। এই স্তরে বায়ুর বেশির ভাগ প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ যেমন অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকে। এই স্তরে মানুষ ও অন্যান্য জীবের জীবনকে প্রভাবিত করে এমন সব ঘটনা ঘটে। যেমন এই স্তরে মেঘ, বৃষ্টি, বায়ু প্রবাহ, ঝড়, কুয়াশা এসব হয়। তাই ট্রপোমন্ডল বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর।
- স্ট্রাটোমণ্ডলে রয়েছে ওজোন নামের একটি গ্যাস। এই গ্যাস সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মি থেকে আমাদের রক্ষা করে।
- ভূ-পৃষ্ঠের পানি থেকে জলীয়বাষ্প, জলীয়বাষ্প থেকে মেঘ, মেঘ থেকে বৃষ্টি হিসেবে পানি আবার ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে। বৃষ্টির পানি আবার গড়িয়ে গড়িয়ে নদী এবং সবশেষে সমুদ্রে ফিরে আসে। এভাবে পানির চক্রাকারে ঘুরে আসাকে পানি চক্র বলে। পানি চক্রের মাধ্যমে পরিবেশে পানির চাহিদা ও যোগানের মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় থাকে।
- জীব বায়ুমণ্ডল থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে শ্বসনের কাজ চালায়। শ্বসন প্রক্রিয়া শেষে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে। আবার উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে খাদ্য তৈরী করে এবং অক্সিজেন ছেড়ে দেয়। এভাবে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের পরিমানে একটা ভারসাম্য বজায় থাকে। পরিবেশে বিশেষ করে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভারসাম্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ দুটি গ্যাসই জীবনের জন্য অতি আবশ্যক।
- কোনো স্থানের বায়ুমণ্ডলের স্বল্প সময়ের তাপমাত্রা, চাপ, বায়ুপ্রবাহ, আর্দ্রতা এ অবস্থাগুলো হলো আবহাওয়া। আর কোনো স্থানের অনেক বছরের সামগ্রিক আবহাওয়া হলো জলবায়ু।
- আবহাওয়া পরির্বিতনের মূল ভূমিকা আসলে সূর্যতাপের। তাপমাত্রার পরিবর্তনের ফলে বায়ু চাপের পরিবর্তন হয়।
- কোনো স্থানের জলবায়ু সহসা পরিবর্তন হয় না। তবে বিজ্ঞানীরা পরিমাপ করে দেখতে পেয়েছেন যে, পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়ছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা এভাবে বেড়ে যাওয়াকে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন (Global warming) বলে। পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে পর্বতের চুড়ার ও মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাচ্ছে। তাপমাত্রা বেড়ে সমুদ্রের পানি প্রসারিত হচ্ছে। ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে। এভাবে তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বাড়তে থাকবে। ফলস্বরূপ, বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলসহ বিশ্বের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে যাবে। এছাড়া তাপমাত্রা বেড়ে গেলে বিরূপ আবহাওয়া যেমন খরা, অতিবৃষ্টি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেশি বেশি ঘটতে দেখা যাবে।
- বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে জলবায়ু পরিবর্তিত হচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের মূল কারণ বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি। তাই কার্বন ডাইঅক্সাইডের নিঃসরণ কমানোই জলবায়ু পরিবর্তন রোধের মূল উপায়।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১। ভূপৃষ্ঠ থেকে এগার কিলোমিটার পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলকে বলে ---------

২। -------নামের একটি গ্যাস সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে আমাদের রক্ষা করে।

৩। কোনো স্থানের দীর্ঘদিনের আবহাওয়ার গড় ফলকে বলে ---------।

৪। আবহাওয়া পরিবর্তনের মূল ভূমিকা হলো --------------।

৫। তাপমাত্রা বাড়লে সমুদ্রের পানি -----------হয়।

সংক্ষেপে উত্তর দাও

১। বায়ুমণ্ডলের নিচের স্তরে অর্থাৎ পৃথিবীর কাছাকাছি বায়ুমণ্ডলে বায়ুর ঘনত্ব বেশি থাকে কেন তা ব্যাখ্যা কর।

২। ট্রপোমণ্ডল কেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ?

৩। চিত্রসহ পানিচক্র ব্যাখ্যা কর।

৪। কীভাবে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভারসাম্য বজায় থাকে?

৫। গ্রীনহাউজ প্রভাব কী? বৈশ্বিক উষ্ণায়নকে কীভাবে এর সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরটি প্রায় বায়ু শূন্য?

ক. ট্রপোমণ্ডল
খ. স্ট্রাটোমণ্ডল
গ. মেসোমণ্ডল
ঘ. তাপমণ্ডল

২. আবহাওয়া ও জলবায়ুর ক্ষেত্রে–

i. একই দেশের বিভিন্ন স্থানে একই দিনে আবহাওয়া ভিন্ন হতে পারে
ii. বাংলাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গের জলবায়ু প্রায় একই
iii. আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান ভিন্ন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. i ও ii
ঘ. ii ও iii

উদ্দীপকটি লক্ষ্য কর এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

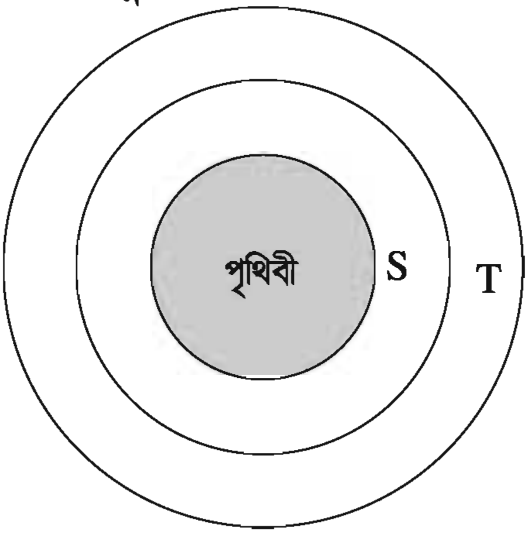

৩. উদ্দীপকের T স্তরে থাকে –

i. অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন
ii.কার্বন ডাইঅক্সাইড ও ধূলিকণা
iii. জলীয়বাষ্প ও ওজোন গ্যাস

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. S স্থানে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে ঐ স্থানের–

i. বায়ুর চাপ বাড়বে
ii.বায়ু হালকা হবে
iii.বায়ুর চাপ কমবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ.i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

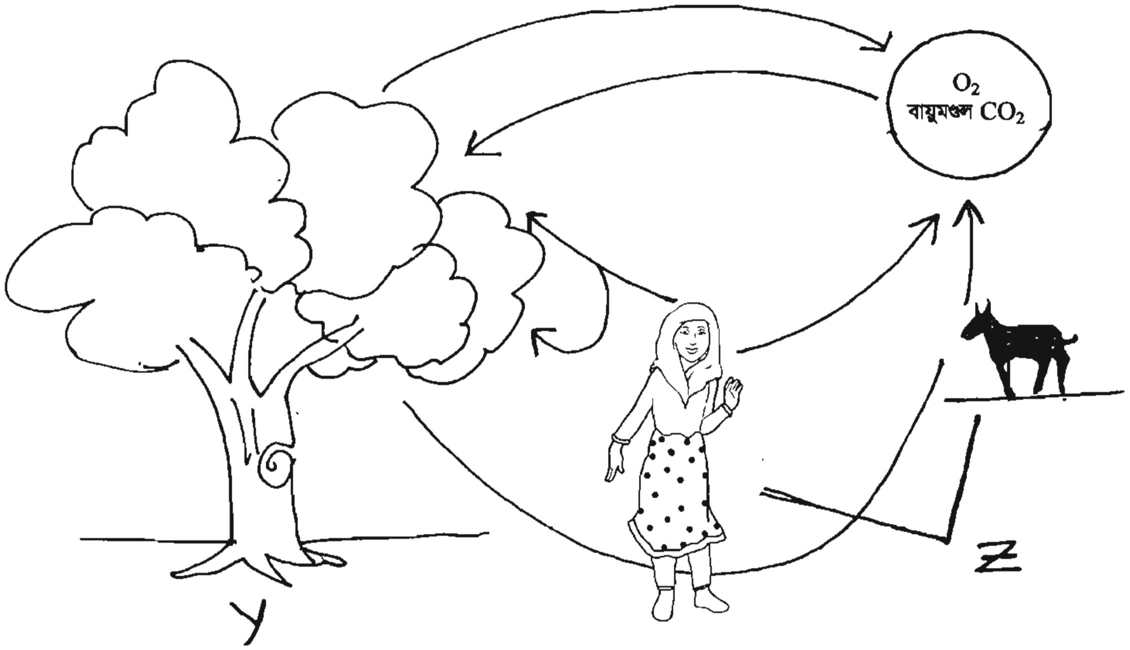

চিত্র

ক. ভূগর্ভস্থ পানি কী?

খ. স্ট্রাটোমণ্ডল কেন জীব জগতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ? বর্ণনা কর।

গ. Y ও Z কিভাবে পরিবেশে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও অক্সিজেনের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যাখ্য কর।

ঘ. Z থেকে নির্গত গ্যাসটির পরিমাণ অধিক বেড়ে গেলে পরিবেশে কী বিপর্যয় ঘটবে তা যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

২. নিচের গ্রাফে ঢাকার কোনো এক বছরের (জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর) সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দেখানো হলো।

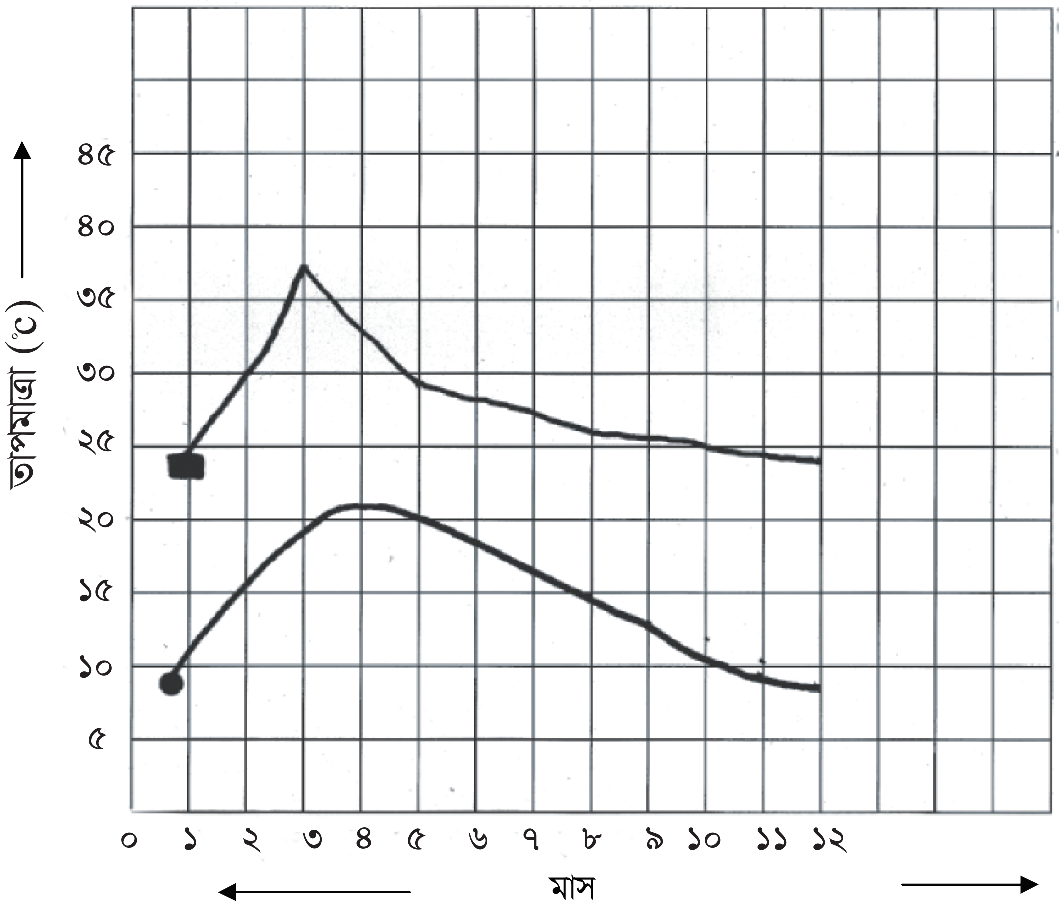

■ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা

● সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা

ক. আবহাওয়ার প্রধান উপাদান কী?

খ. মার্চ মাসে বাংলাদেশে আবহাওয়া আরামদায়ক থাকে কেন?

গ. লেখ চিত্রে কোন মাসে ঢাকায় বায়ুর চাপ বেশি ছিল ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ঢাকায় কোন মাসে ঝড় হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি ছিল লেখ চিত্রের আলোকে কারণসহ বিশ্লেষণ কর।

সমাপ্ত

২০১৯
শিক্ষাবর্ষ
দাখিল
৭ম-বিজ্ঞান

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন কর
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিনয়ীকে সবাই পছন্দ করে

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য